ভারতের আদিবাসী

সুবোধ ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

এই গ্রন্থে নিবদ্ধ প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অনেকগুলিই সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কতকগুলি প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসনকে প্রসঙ্গক্রমে 'বর্তমান' ঘটনা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ ঐ প্রবন্ধ লেখার সময় ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্তমান ছিলেন। অন্যান্য প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসনকে প্রসঙ্গক্রমে 'অতীত' ঘটনা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন অতীত হয়ে গেছেন। সুতরাং ব্রিটিশ সম্পর্কে উল্লেখগুলির মধ্যে 'বর্তমান' ও 'অতীত' দুই ক্রিয়াপদের ব্যবহার এই গ্রন্থে স্বভাবতঃ পাওয়া যাবে।

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, কারণ আনন্দবাজার গ্রন্থাগারের বহু পুস্তক ও রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ লাভ ক'রে বস্তুতঃ এই গ্রন্থরচনায় সাহায্য লাভ করেছি।

আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংকলনে ডক্টর জি. এস. ঘুর্য়ে'র রচিত পুস্তকাবলী থেকে বহুল পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করেছি, সেই কারণে তাঁর প্রতিও এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

লেখক

[গ্রন্থে বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের ভৌগোলিক নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই নামবাচক শব্দগুলির উচ্চারণের রূপ বাস্তবক্ষেত্রে সর্বত্র একই রকমের নয়। সুতরাং, গ্রন্থে উল্লিখিত নামবাচক শব্দগুলির অনেক শব্দের স্থানীয় উচ্চারণ সম্ভবতঃ ভিন্ন রকমের। তা' ছাড়া, ইংরাজীতে লিখিত বিবরণী থেকে, ইংরাজী (রোম্যান) হরপে লিখিত নামবাচক শব্দগুলি দেখে তার প্রকৃত স্থানীয় উচ্চারণ অনুমান করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। সেই হেতু, এই গ্রন্থে নামবাচক শব্দগুলির কিছু শব্দ হয়তো স্থানীয় উচ্চারণসঙ্গত শব্দের অনুরূপ হয়নি]

পৃষ্ঠা	ভুলশব্দ	শুদ্ধশব্দ
৩৮	"ভুই পন্থ"	ভুঁইফুঁট
৩৮	"কেশ ভগত"	নেমা ভগত
২২৭ (ফুটনোট)	"B & O Reserved Society"	"B & O Research Society"
৩০৭	"জাঠ"	জাট
৩০৮	"জাঠ"	জাট

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিরসা ভগবান

[শিল্পী ধীরেন বল কর্ত্তৃক
পুরাতন চিত্র হইতে অঙ্কিত]

ভারতের আদিবাসী

আদিবাসী কথাটি নতুন। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্কে ভারতের কতগুলি শ্রেণী ও সমাজের নতুন নামকরণ হয়েছে। সাধারণত যাঁদের আদিম অধিবাসী (Aborigines) বলা হতো, আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় তাঁদেরই আদিবাসী বলা হয়েছে। ভারতের নদীবিধৌত শস্যশ্যামল উর্বর অঞ্চলে আদিবাসীদের দেখা যায় না। গিরিবহুল আরণ্য অঞ্চলের নিভৃত ক্রোড়ে আদিবাসীরা আশ্রয় নিয়েছে। আধুনিক ভারতের বড় বড় ট্রাঙ্করোডে, ট্রেনে, মোটরে বা স্টীমারে এঁদের আপনি সহযাত্রী হিসাবে পাবেন না। আপনি আধুনিক ভারতীয়, আপনি আর্য সংস্কৃতির মানুষ, আপনার জীবনচর্যার পথ একমাত্র আপনারই নিজস্ব। আদিবাসীরা আজও এই পথ থেকে দূরে সরে রয়েছে।

কৃষ্ণ মহাদেশ আফ্রিকার বেদনা ভারতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে :

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোম্‌টার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

আফ্রিকার কালো ছেলের হৃদয়ের সত্যিকারের পরিচয় তারা পেতে পারে নি, তাদের দৃষ্টি উপেক্ষায় আবিল হয়ে ছিল। সভ্য ভারতবর্ষও তার গিরিকুমার ও অরণ্যদুলাল কালো ছেলেকে ঠিক আপন বলে চিনতে পারে নি, ভারতের আদিবাসীকে 'কালি প্রজা' আখ্যা দিয়ে সভ্য ভারতবর্ষ অবহেলা করেছে। ভারতের আড়াই কোটি কালি প্রজার বেদনা কোন ভারতীয় কবির কাব্যময় সান্ত্বনার স্পর্শ এখনো লাভ করে নি।

ভারতবর্ষ বহু বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ভূমি, বহু বিভিন্ন নরগোষ্ঠী, বহু শক হূণ দল এখানে এক দেহে লীন হয়েছে। একথা সত্য। কিন্তু আংশিকভাবে সত্য। আমরা বোধ হয় একটা শ্রুতিমধুর থিয়োরী হিসাবে এই আংশিক সত্যটাকে বড় বেশী জোর গলায় প্রচার করেছি। কারণ, চোখের সামনেই এই থিয়োরীর বিরুদ্ধে সাক্ষী রয়েছে, ভারতের আড়াই কোটি আদিবাসী। হাজার হাজার বছর ধরে আর্য-ভারত এবং আদি-ভারত একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থেকেও একসঙ্গে মিশতে পারে নি। না হয়েছে শোণিত-সমন্বয়, না হয়েছে সংস্কৃতির সমন্বয়। অবশ্য, বিরাট হিন্দুসমাজের সুবিস্তৃত জাতের সিঁড়িতে কয়েকটি ধাপে কোন কোন গোষ্ঠীর আদিবাসী নিজের আগ্রহে এসে ঠাঁই গ্রহণ ক'রে হিন্দু হয়েছে। হিন্দুসমাজে এরা অনাহূত অতিথি। আধুনিক সভ্য ভারতীয়ের টাটানগরে বিংশ শতাব্দীর ইস্পাত-সভ্যতা তপ্ত জ্যোতির গর্বে জ্বল জ্বল করছে, কিন্তু তারই চার পাশে সিংহভূমির শালের বনে আজও আদিবাসী বিরহোর পাথরের কুঠার কাঁধে নিয়ে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কুটীর নির্মাণের পদ্ধতি পর্যন্ত জানে না। ইস্পাত সভ্যতার পাশেই মূর্তিমান প্রস্তর সভ্যতা।

ভারতবর্ষের জীবনে বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সংঘটন হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা ঐতিহাসিক প্রমাণের সাক্ষাৎ আমরা পাই না, যাতে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ভারতের আদিবাসীকে আর্য ভারতবর্ষ আপন ক'রে নেবার চেষ্টা করেছে। বীর পার্থ আদিবাসী-দুহিতা উলুপীকে এবং মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর হিড়িম্বাকে সাময়িকভাবে সহচরীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেন নি। ইন্দ্রপ্রস্থে বা হস্তিনাপুরের আর্যগরিমায় ফিরে এসে তাঁরা নির্বাসিত জীবনের সুখ-সহচরীকে ভুলে গিয়েছিলেন। আর্য-ভারত যে আভিজাত্যের গর্বে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আজও সেই ব্যবধান দূর হয় নি। আর্যয়ানার মধ্যে একরকম জাতিগত ঔদ্ধত্য আছে। আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসী বুদ্ধির দিক দিয়ে উদারনীতিক হলেও এই বনিয়াদী জাতি-গর্ব (Race-pride) তার রুচিকে

অজ্ঞাতসারে গ্রাস করে আছে। উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষ নতুন সাহিত্য শিল্প ও সমাজ-সংস্কারের ভারতবর্ষ। কিন্তু এর মধ্যেও বিশেষভাবে একটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজকে আপন সমাজ বলে মনে করতে পেরেছেন, আধুনিক ভারতীয় তাঁর সাহিত্যের দর্পণে এমন প্রমাণ প্রতিফলিত করতে পারেন নি। ভারতে এত সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন হয়ে গেল, কিন্তু আদিবাসী সমাজকে নিয়ে নয়। এ বিষয়ে যে কিছু কিছু করণীয় দায়িত্ব আছে, তা মাত্র সম্প্রতি রাজনৈতিক উদারতাবাদের জন্য কিছু কিছু দেখা দিয়েছে।

"কাককৃষ্ণ হ্রস্বাঙ্গ হ্রস্ববাহু মহাহনু, হ্রস্বপাণি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্ধজ"—ভাগবত পুরাণ ভারতের আদিম অধিবাসীকে সব দিক দিয়ে হ্রস্ব করে ছেড়েছেন। বলা বাহুল্য এ ধরণের উক্তি সেই প্রাচীনকালের আর্য ভারতীয়ের জাতি-গর্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গাত্রবর্ণের গর্ব অথবা শোণিতের ঔদ্ধত্য পৃথিবীর সভ্যতাকে বহুভাবে বিড়ম্বিত করেছে। নিগ্রোর প্রতি ইয়াঙ্কির মনোভাব, প্রবাসী ভারতীয়ের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় দো-আঁসলা বুয়র ও ইংরাজের মনোভাব আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের মন থেকে জাতি-গর্বের প্রাচীন বিষ এখনো দূরীভূত হয় নি। মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষকে প্রবল করবার একটা বড় উপায় এই জাতি-গর্ববাদ। হিটলার তাঁর স্বজাতিকে জাতি-গর্বে দীক্ষা দেবার জন্য আর্যামিকে কূটনীতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন আর্যের কাছে প্রতিপক্ষ মাত্রই যেমন 'দস্যু' ছিল, হিটলারের কাছে প্রতিপক্ষ মাত্রই 'ইহুদী'। ভারতীয় শাস্ত্রকারেরাও 'শ্বপচাধম' বলে যে একটা গালাগালি তৈরী করেছিলেন, সেটাও বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তাঁদের মনের গভীরে জাতিগর্ববাদের একটা ভয়ানক সংস্কার ছিল।

ভারতের আদিবাসী সমাজকেও চলতি কথায় পাহাড়িয়া বুনো জংলী ইত্যাদি আখ্যা আজও দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের আদিবাসীদেরও যে একটা সংস্কৃতি আছে, সে সম্বন্ধে কোন সশ্রদ্ধ ধারণা সাধারণত আধুনিক ভারতীয়েরা পোষণ করেন না, কারণ সে সম্বন্ধে কোন খোঁজও তাঁরা রাখেন না। কিন্তু খোঁজ নিলে

দেখা যাবে যে, ঠিক আধুনিক ভারতীয়ের মতই আদিবাসী সমাজের মধ্যেও সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন ও পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কোথাও অনড় প্রাচীন ব্যবস্থা ও বিধানের মধ্যে এরা অচল হয়ে আছে, কোথাও নিজস্ব সংস্কৃতির ঐশ্বর্যকে হারিয়ে এরা আগের তুলনায় দীন হয়ে পড়েছে এবং কোথাও বা আধুনিক যুগের রীতিনীতির সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে একটা পরিবর্তনকে বরণ করে নেবার চেষ্টা চলেছে।

আর্য আগমনের বহু পূর্বে এরাই ভারতের প্রস্তর-সভ্যতার প্রথমবেদিকা রচনা করেছিল। কিন্তু আদিবাসী বলতে কি বোঝায়? আর্যেরা বহিরাগত, কিন্তু আদিবাসীরা কি ভারতেই উদ্ভূত? না, ঠিক এভাবে বললে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হবে। নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন, আদিবাসীরাও বহিরাগত। আর্য আগমনের বহু পূর্বেই ভারতে এঁরা এসেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিকেরাও এই তত্ত্ব সমর্থন করেন। সুতরাং ভারতের একেবারে খাঁটি ভূমিজ (Autochthones) সন্তান যে কে, তা বলা দুষ্কর।

অতি দূর অতীতে ভারতভূমি কি একেবারেই নরহীন ছিল? সবই বাইরে থেকে এসেছে? বিজ্ঞানী গবেষকমহল বলেন, হ্যাঁ আদিবাসী নামে আখ্যাত মুণ্ডারি জাতিও ভারতের বাইরে থেকে এসেছে। অতিদূর অতীতে অন্যান্য ভূখণ্ডের মত ভারতের মাটিতেও হয়তো এক শ্রেণীর দ্বিপদ বৃক্ষচর প্রাণী নিতান্ত জন্তুদশা থেকে কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে নরদশা লাভ করেছিল। কিন্তু তার কোন বিশিষ্ট নিদর্শন আজ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, যুগব্যাপী এক একটি বিরাট বংশপ্লাবনের ইতিহাসে সেই যথার্থ আদি ভারতীয়ের শোণিত একেবারে ধারা হারিয়ে ফেলেছে; সুতরাং আদিবাসী বলতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বরং বোঝায় বনিয়াদী অধিবাসী।

আর্যেরা ভারতে পরে এলেও তাঁরাই ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চসিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা ও নর্মদা, কাবেরীর উপত্যকা আর্য অভিযাত্রীর কাছে ছেড়ে দিয়ে

আদিবাসী দুর্গম গিরিকন্দরে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সুপ্রাচীন কালে আর্য ও অনার্যের রাজনৈতিক সজ্ঘর্ষের পরিচয় পুরাণকারের লেখায় অবশ্যই কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সমন্বয়ের বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। রাজা রামচন্দ্রের কাহিনী থেকে নজীর তুলে অনেকে বলতে পারেন যে, সেই বিখ্যাত আর্য রাজা গুহক চণ্ডালকেও মিতা করেছিলেন এবং হনুমানকেও একনিষ্ঠ সহায়ক বন্ধুরূপে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, এক আর্য রাজা রাবণশাসিত এক অনার্য রাষ্ট্রশক্তিকে দমন করবার জন্যে হনুমান গুহক প্রভৃতি কয়েকটি অনার্য দলপতিকে মাত্র যুদ্ধবন্ধুরূপে (Ally) গ্রহণ করেছিলেন। সেটা রাজনৈতিক সৌহার্দ্যমাত্র ছিল, সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য নয়। আর্যেরা সে দিনের অনার্যকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের মত সমান স্তরে টেনে তুলবার জন্যে মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না, বরং এ বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট মনোবলের অভাব ও উদারতার কার্পণ্য ছিল। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত একলব্যের কাহিনীর মধ্যে মর্মান্তিক ট্রাজেডিরূপে কীর্তিত হয়ে রয়েছে। ধনুর্বিদ আচার্য দ্রোণ একলব্যকে বিদ্যা দান করতে রাজী হন নি। তবু একলব্য নিজের নিষ্ঠার জোরে এবং মনে মনে দ্রোণকেই গুরু বলে মেনে নিয়ে দ্রোণশিষ্য অর্জুনের চেয়ে দক্ষতর ধানুকী হয়ে ওঠে। আর্য দ্রোণ তাঁর আর্য-শিষ্য অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অটুট রাখার জন্যে অনার্য একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আদায় করে নিলেন। আর্য কূটনীতির জঘন্যতম দৃষ্টান্ত! এক কথায় বলতে পারা যায়, আচার্য দ্রোণ কৌশলে একলব্যকে চিরতরে পঙ্গু করে দিলেন।

একলব্যের বেদনা আজও আড়াই কোটী আদিবাসীর চিত্তের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে। আর্য ভারতের উপেক্ষায় ধিকৃত হয়ে ছায়াবৃত অরণ্যের আড়ালে আজও তারা বিদ্যাহীন নিঃস্ব জীবনের ভার বহন করে চলেছে। হাজার হাজার বছর পরে খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীতে আর্য ভারতের সৌহার্দ্যের আহ্বান মাত্র ক্ষীণ-স্বরে ঘোষিত হয়ে আদিবাসীদের কানে পৌছতে আরম্ভ করেছে। আদিবাসীরা কেউ এ ডাকের অর্থ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না, অনেকেই সংশয় করে।

কিন্তু বোধ হয়, ঠিক ডাকার মত ডাকতে পারা যাচ্ছে না। কেমন করে ডাকলে আড়াই কোটী বনিয়াদী ভারত-সন্তান সাড়া দিয়ে যুগব্যাপী সঙ্গোপনের বেড়া অতিক্রম ক'রে বৃহৎ ভারতের জনতার উৎসব-অঙ্গনে মিলিত হতে পারবে, সেটাই আজকের দিনের সমস্যা। এই হলো আদিবাসী-সমস্যা। শ্রীঅমৃতলাল ঠক্করের মত জনসেবক সংখ্যায় ক'জনই বা আছেন এবং মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্মবিধির অন্যতম আদিবাসী-সেবার কাজকে ক'জন কংগ্রেসকর্মী ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন? মোট কথা হলো, এদিক দিয়ে জাতীয় উদ্যোগে যথার্থ কোন কাজই হয় নি।

এ পর্যন্ত যেসব মন্তব্য করা হলো, তার মধ্যে আর্য-ভারতের নিন্দার দিকটার কথা বেশী করে বলা হয়েছে। কিন্তু আর্য-ভারতের একটা বিশিষ্ট প্রশংসনীয় চরিত্রের কথা বলা হয় নি। আজ হাজার হাজার বছর ধরে আর্য-ভারত ও আদিবাসী-ভারত পাশাপাশিই রয়েছে। আর্য-ভারত আভিজাত্যের কারণে আদিবাসীদের সংস্রব থেকে দূরে সরে আছে, কিন্তু এর মধ্যে হিংস্রতা নেই আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় সভ্যের দল যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন, সেখানে আদিবাসী সমাজকে পাইকারী সংহারের দ্বারা ধ্বংস করতে তাঁরা একটুও দ্বিধা করেন নি। "আমেরিকার প্রথম শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের যেকেউ একটি রেড ইণ্ডিয়ানের মাথা কলোনী অফিসে জমা দিতে পারলে, তার জন্যে আড়াই পাউণ্ড পুরস্কার বরাদ্দ ছিল।" ভারতের প্রথম আর্য অভিযাত্রীরা তাদের প্রথম বর্বর জীবনের হিংস্রতায় হয়তো সেই অতিদূর অতীতে ভারতের অনার্যদের সম্বন্ধে ঠিক সতর শতকের খৃস্টধর্মী য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকের মত সংহারনীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভারতে একটা সভ্যতার পত্তন হবার পর অন্ততঃ বিগত পাঁচ ছয় হাজার বছরের মধ্যে আদিবাসীদের প্রতি ঠিক এই ধরণের জহ্লাদী আচরণ আর হয় নি। এটা অবশ্যই ভারতীয় সভ্যতার একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য।

আর একটা পূর্বোক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র থেকে আদিবাসীরা দূরে সরে আছে

এটা একেবারে সম্পূর্ণ সত্য নয়; মোটামুটিভাবে সত্য। অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনে এবং আগস্ট-সংগ্রামেও নিখিল ভারতের মুক্তিসাধনায় কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ বিস্মৃত হবার নয়। তা ছাড়া ভারতের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে বহু ঘটনার স্বাক্ষর রয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের আদিবাসী সমাজ মারাঠা ইত্যাদি ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তির মতই দেশপ্রেমের প্রেরণায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত দিয়ে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আদিবাসীর উদ্যোগে পরিচালিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই সংগ্রামের ইতিহাসকে শিক্ষিত ভারতীয়েরা যথার্থ সমাদরের সঙ্গে স্মরণ করেন না। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে আরম্ভ করে অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভকাল পর্যন্ত আধুনিক ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে একেবারেই কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে নি। কিন্তু আদিবাসীরা করেছে। আদিবাসীদের এক একটি বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থান যদিও ব্রিটিশ অস্ত্রশক্তির সাহায্যে সহজেই দমিত হয়েছে, কিন্তু তার জন্যে আদিবাসীর ঐতিহাসিক গৌরব ছোট হয়ে যায় নি।

আদিবাসী অঞ্চল ও জনসংখ্যা

আদিবাসীদের জনসংখ্যা আড়াই-কোটী, ভারতের জনসংখ্যার অনুপাত ধরে বলা যেতে পারে শতকরা সাড়ে ছয়।* অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বোম্বাই প্রদেশেই আদিবাসীরা জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে বেশী, শতকরা সাতের উপর। খান্দেশ থানা, কোলাবা, পাঁচমহল, উত্তর গুজরাট এবং নাসিক অঞ্চলে এরা লাখে লাখে বাস করছে। ১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে হাজার হাজার আদিবাসী উক্ত অঞ্চল ছেড়ে সিন্ধুপ্রদেশের মরু অঞ্চল থর ও পার্কারে পর্যন্ত চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রাচীনকালে অভ্যাগত আর্যযোদ্ধার আগমনে একবার নদীসিক্ত উর্বর উপত্যকায় বসতি ছেড়ে দিয়ে আদিবাসীকে দুর্গম উপলবন্ধুর আরণ্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তারপর থেকে শস্য ও শিকারের দুর্ভিক্ষের তাড়নায় আদিবাসীকে যুগ যুগ ধরে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে যেতে হয়েছে এবং আদিবাসীদের জীবনে আজও যাযাবরত্বের অস্থিরতা লেগেই আছে। যাযাবরত্বের কারণেই আদিবাসীদের সংস্কৃতিগত উন্নতি ভয়ানকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

১৯৩১ সালের আদমসুমারীর বিবরণ অনুসারে আদিবাসীদের জনসংখ্যার এই হিসাব পাওয়া যায়—

	প্রদেশ	জনসংখ্যা
(১)	আসাম	১৬,৭৮,৪১৯
(২)	বাঙ্গলা	১৯,২৭,২৯৯
(৩)	বিহার ও উড়িষ্যা	৬৬,৮১,২২৮
(৪)	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৪০,৬৫,২৭৭
(৫)	বোম্বাই ও সিন্ধু	২৮,৪১,০৮০
(৬)	মাদ্রাজ	১২,৬২,৩৬৯
(৭)	অন্যান্য অঞ্চল	৪,৩০,৫৮২
	মোট ...	১,৮৮,৮৬,২৫৪

* ডক্টর ডি, এন, মজুমদার বলেন, আদিবাসীরা সংখ্যায় ৩ কোটী (বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতির অভিভাষণ, ১৯৩৯ সাল)।

দেশীয় রাজ্য		জনসংখ্যা
(১) মধ্যভারত এজেন্সী ...	...	১৩,৪২,০৮১
(২) রাজপুতানা এজেন্সী ...	...	৮,০২,১৭৮
(৩) পশ্চিম ভারত এজেন্সী	...	৪,৯৫,৮৩৪
(৪) বরোদা ...	...	৩,১৩,২৭৩
(৫) গোয়ালিয়র ...	...	২,৮১,০৩৩
(৬) হায়দরাবাদ ...	...	২,২২,৮০৬
(৭) অন্যান্য ...	...	৬৪,০৩৩
	মোট ...	৩৫,২১,২৩৮

প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যা যোগ করলে মোট আদিবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২,২৪,০৭,৪৯২।

নিম্নে প্রদেশ ও জিলা অনুসারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীদের জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া হলো। সব জেলার নাম না দিয়ে মাত্র সেইগুলির নাম উল্লেখ করা হলো, যেখানে আদিবাসীর জনসংখ্যা অন্তত পঁচিশ হাজারের কম নয়।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সংক্ষেপে একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে :

"ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৫½ জন হলো আদিবাসী। আদিবাসীদের জনসংখ্যার ২০ ভাগের ১ ভাগ হলো খৃষ্টান। খৃষ্টান ছাড়া বাকী সমস্ত আদিবাসীই কমবেশী বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যাবার অবস্থায় রয়েছে। একদিকে যেমন পুরাপুরি গোষ্ঠীগত (tribal) পদ্ধতিতে জীবনযাপনের নিদর্শন দেখা যায়, অপরদিকে তেমনি সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজভুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। এই দুই চূড়ান্ত অবস্থার মাঝামাঝি কমবেশী পরিবর্তিত ও হিন্দুত্বপ্রাপ্ত আদিবাসীদের একটা ক্রমবিন্যস্ত সামাজিক স্তরভেদ আছে।"

১৯৩১ সালের আদম সুমারি রিপোর্টে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে যে বিবরণ আছে, সেটা উদ্ধৃত হলো :

		জনসংখ্যা	প্রধান বসতি অঞ্চল
আসাম :			
(১)	গারো	১,৯৩,৪৭৩	গারো পাহাড়, গোয়ালপাড়া
(২)	কাছাড়	৩,৪২,২৯৭	গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারাং, লক্ষ্মীপুর, কাছাড়
(৩)	খাসি	১,৭১,৯৫৭	খাসি রাজ্য, খাসি পাহাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড়
(৪)	লুসাই	১,১৪,১৫৮	লুসাই পাহাড়
(৫)	মিকির	১,২৯,৭৯৭	নওগাঁ, শিবসাগর, খাসি পাহাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড়
(৬)	নাগা	২,৬৮,৩০৩	নাগা পাহাড়, মণিপুর রাজ্য
বাঙলা :			
(৭)	চাকমা	১,৩৫,৫০৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম
(৮)	মুণ্ডা	১,০৮,৬৮৬	চব্বিশ পরগণা, জলপাইগুড়ি
(৯)	ওঁরাও	২,২৮,১৬১	জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর
(১০)	সাঁওতাল	৭,৯৬,৬৫৬	বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা
(১১)	টিপ্রা	২,০৩,০৬৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা রাজ্য
বিহার ও উড়িষ্যা :			
(১২)	ভুঁইয়া	৬,২৫,৮২৪	গয়া, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভূম, উড়িষ্যা রাজ্যসমূহ
(১৩)	ভূমিজ	২,৭৪,০৫৮	মানভূম, সিংভূম, উড়িষ্যা রাজ্য
(১৪)	গন্দ	২,৫৫,৭৫২	সম্বলপুর, উড়িষ্যা রাজ্যসমূহ

(১৫)	হো	৫,২৩,১৫৮	সিংভূম, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য
(১৬)	খাড়িয়া	১,৪৬,০৩৭	রাঁচি, উড়িষ্যার রাজ্যসমূহ
(১৭)	খন্দ	৩,১৫,৭০৯	অঙ্গুল, উড়িষ্যার রাজ্যসমূহ
(১৮)	মুণ্ডা	৫,৪৯,৭৬৪	রাঁচি, সিংভূম, উড়িষ্যা রাজ্যসমূহ
(১৯)	ওঁরাও	৬,৩৭,১১১	রাঁচি, পালামৌ, উড়িষ্যার রাজ্যসমূহ
(২০)	সাঁওতাল	১৭,১২,১৩৩	মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহ
(২১)	শবর	২,৪৪,৬৭৮	কটক, পুরী, সম্বলপুর এবং উড়িষ্যার রাজ্যসমূহ

মাদ্রাজ :

(২২)	খন্দ	৪,২৫,৩৬৯	গঞ্জাম, ভিজাগাপট্টম
(২৩)	পরাজ	১,২৩,১০০	ভিজাগাপট্টমের কোরাপুট এজেন্সি
(২৪)	শবর	২,১১,৭৮১	ভিজাগাপট্টম, গঞ্জাম

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার :

(২৫)	গন্দ	২২,৬১,১৩৮	সওগর, ডামো, জব্বলপুর, মান্দলা, সেওান, নরসিংহপুর, হোসাঙ্গাবাদ, বেতুল, ছিন্দওয়ারা, বর্দ্ধা, নাগপুর, চন্দা, ভাণ্ডারা, বলাঘাট, রায়পুর, বিলাসপুর, দ্রুগ, অমরাবতী, ইয়োটমল এবং বস্তার ও কংকের রাজ্য
(২৬)	কাওয়ার	২,৮৭,১৫৬	রায়পুর, বিলাসপুর এবং রায়গড় ও সরগুজা রাজ্য

(২৭)	কোর্‌কু	১,৭৬,৬১৬	হোসাঙ্গাবাদ, নিমার, বেতুল, অমরাবতী
(২৮)	পরধান	১,১৯,৫৫৫	মান্দালা, সেওনি, চন্দা, ইয়োটমল

বোম্বাই ও সিন্ধু

(২৯)	ভীল	৭,৭৬,৯৭৫	পাঁচমহল, আমেদগড়, পূর্ব ও পশ্চিম খান্দেশ, নাসিক, থর এবং পার্কার জিলা, মহীকণ্ঠ এবং রেবাকণ্ঠ এজেন্সি
(৩০)	ধোড়িয়া	১,৩৯,৩০৯	সুরাট জিলা ও এজেন্সি
(৩১)	ডুবলা ও তালবিয়া	১,৪৪,৬৪৪	সুরাট
(৩২)	নাইকড়া	১,০১,৯৫৪	পাঁচমহল, সুরাট, রেবাকণ্ঠ এজেন্সি
(৩৩)	ঠাকুর	১,১৬,৫৯১	থানা, নাসিক, কোলাবা
(৩৪)	বর্লি	২,০৬,৫৫১	থানা, নাসিক, সুরাট এজেন্সি ও ও জওহার রাজ্য

যুক্তপ্রদেশ ঃ

(৩৫)	গন্দ	১,২১,৫২৯	বালিয়া, গোরখপুর

রাজপুতানা রাজ্যসমূহ ঃ

(৩৬)	ভীল	৬,৫৫,৬৪৭	বাঁসোয়ারা, ডুঙ্গারপুর, মারবাড় ও মেবার রাজ্য

মধ্যভারত রাজ্যসমূহ ঃ

(৩৭)	ভীল	৩,৬৩,১২৪	ইন্দোর, রতলম, ধর ও ঝাবুয়া রাজ্য
(৩৮)	গন্দ	২,৮২,৩৯৭	রেওয়া ও ভোপাল রাজ্য
(৩৯)	কোল*	২,০০,২৪৯	রেওয়া রাজ্য

* 'কোল' কথাটা অনেক সময় ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও ওঁরাও উভয়কেই এক কথায় 'কোল' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মুণ্ডা ও ওঁরাও সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটী গোষ্ঠী, উভয়ের ভাষা ভিন্ন এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক। রেওয়া রাজ্যের 'কোল' মুণ্ডাও নয় ওঁরাও নয়; তারা ভিন্ন একটা গোষ্ঠী, কোল নামে পরিচিত।

উপরের তালিকা ব্যতীত আরও অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যাদের সংখ্যা ১ লক্ষের নীচে কিন্তু ৮৫ হাজারের ওপর। যথা :

(১)	মিরি	সংখ্যা	৮৫,০৩৮	আসাম
(২)	কুকি	,,	৯১,৬৯০	আসাম
(৩)	হলবা	,,	৯২,৭৮৪	বোম্বাই
(৪)	কট্‌কারি	,,	৮৭,৭৮৪	বোম্বাই
(৫)	কোণ্ডা-ডোরা	,,	৮৫,৯৫২	মাদ্রাজ
(৬)	কোইয়া	,,	৯৫,৮১৮	মাদ্রাজ

আদিবাসীর সামাজিক অবস্থার
কয়েকটী তথ্য

(ক) লিখন-পঠন ক্ষমতা :

প্রায় আড়াই কোটি আদিবাসীর সমাজে শিক্ষার প্রসার যা হয়েছে, তা অতি অকিঞ্চিৎকর। মোটের ওপর আদিবাসী সমাজকে নিরক্ষর সমাজ বলা যেতে পারে।

১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে কয়েকটি প্রদেশের ৭৬,১১,৮০৩ সংখ্যক আদিবাসী সম্বন্ধে লিখন-পঠন ক্ষমতার অনুসন্ধান করা হয়েছিল। এই ৭৬ লক্ষের ওপর আদিবাসীর মধ্যে মাত্র ৪৪,৩৫১ জন লিখন-পঠনক্ষম লোক পাওয়া গিয়েছিল, অর্থাৎ জনসংখ্যা অনুপাতে শতকরা মাত্র ০.৫৮ জন। প্রদেশ অনুসারে আদিবাসীদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা হলো—আসামে শতকরা ১.৪, বাঙলা শতকরা ০.৭, বিহার ও উড়িষ্যা শতকরা ০.৫, মধ্যপ্রদেশে শতকরা ০.৫ মাত্র।

১৯১১ সালের আদম সুমারির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে কত্‌কারি গোষ্ঠীর মধ্যে হাজারে তিনজন এবং ভীলদের মধ্যে হাজারে ৪ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। এর সঙ্গে ভারতের আর একটি অবনত সমাজের অর্থাৎ হরিজন সমাজের তুলনা করা যেতে পারে। ১৯২১ সালের আদম সুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী হরিজন মহরদের মধ্যে প্রতি হাজারে ২৩ জন এবং ভাঙ্গিদের মধ্যে প্রতি হাজারে ২৮ জন লিখনপঠনক্ষম লোক ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অতি-অবনত হরিজন সমাজও শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের চেয়ে সাত গুণে উন্নত।

এ পর্যন্ত মাত্র আদিবাসীদের লিখন পঠন ক্ষমতা (literacy) সম্বন্ধে বলা হলো এবং তারই এই দশা! উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে না বলাই ভাল, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র আদিবাসীদের কাছে বলতে গেলে একরকম নিষিদ্ধ এলাকা হয়েই রয়েছে। অতি

স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত আদিবাসীর সাক্ষাৎ আমরা পাই এবং তাঁরা যে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন সেটা একটা আকস্মিক সৌভাগ্য মাত্র, ভারত গবর্ণমেণ্টের সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থার ফল নয়। খৃস্টান মিশনারী সম্প্রদায় কিছু কিছু মধ্য ও উচ্চ স্কুল পত্তন করে আদিবাসীদের মধ্যে কয়েকজনকে শিক্ষিত হবার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু এটা নিতান্ত একপেশে সেবাধর্মের ব্যাপার। মাত্র খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত আদিবাসী পাদরী সায়েবদের অনুগ্রহ লাভ করবার অধিকারী, আর কেউ নন। আসামের খাসি সমাজে এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও ওঁরাও সমাজে উচ্চশিক্ষিত পুরুষ এবং নারীও আছেন। ভাই অমৃতলাল ঠক্কর (বিখ্যাত জনসেবক ঠক্কর বাপা নামে যিনি পরিচিত) লিখেছেন—"ভীল সেবামণ্ডলের উদ্যোগে একটি ভীল মেয়ে ১৯৪০ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে এবং পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে, সম্ভবত এই ভীল মেয়েটিই অ-খৃস্টান ভীলেদের মধ্যে প্রথম, যে কলেজে ভর্তি হলো।"

(খ) আদিবাসীর ভাষা :

আদিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী আছে, যারা তাদের প্রাক্তন 'জাতীয় ভাষা' হারিয়ে ফেলেছে অথবা বিস্মৃত হয়েছে এবং নতুন একটা ভাষা (হিন্দী বা উড়িয়া ইত্যাদি) গ্রহণ করেছে। এছাড়া প্রত্যেক গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রভাব (শব্দ ও ব্যাকরণ) খুবই বেশী বেড়েছে এবং দিন দিন বেড়ে চলেছে। বর্তমান আদিবাসীদের মধ্যে মোটামুটি ৩৪ রকম বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। কিন্তু এই ৩৪টি বিভিন্ন ভাষা মূল-ভাষা নয়, প্রায় সবগুলিই দুটি প্রধান মূল-ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষা (Dialect) মাত্র।

(১) মূলভাষা মন্ খমের—এই মন্ খমের গ্রুপের মধ্যে নয়টি উপভাষা (Dialect) আছে। আসামের আদিবাসীদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত।

(২) মূল-ভাষা মুণ্ডারি—এই মুণ্ডারি গ্রুপের মধ্যে সাতটি উপভাষা আছে এবং ছোটনাগপুর, মধ্যভারত ও উত্তর ভারত অঞ্চলে বেশী প্রচলিত।

(৩) মূল-ভাষা দ্রাবিড়—দ্রাবিড় গ্রুপের মধ্যে পনেরটি বিভিন্ন উপভাষা আছে, যা উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের আদিবাসীদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। **

ভীলেরা ও ভুঁইয়ারা আজকাল হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে। অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যারা উড়িয়া বাঙলা ও মগহি প্রভৃতি আর্য ভাষার (Indo-European Group) একটা বিকৃতরূপ ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। রাজমহলের মাল পাহাড়িয়া আদিবাসীদের ভাষা বস্তুত বাঙলা ভাষার অপভ্রংশ। আদিবাসীর ভাষা ও ভাষাগত সমস্যা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী একটি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হলো।

** সম্প্রতি এ বিষয়ে নতুন মতবাদ দেখা দিয়েছে। মুণ্ডারি ভাষা (অর্থাৎ খেড়োয়ারি বা কোলারীয় ভাষা) মন্‌খমের গ্রুপের ভাষা কি না, এ সম্বন্ধে সংশয় করবার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

"মুণ্ডারি সম্বন্ধে ঐ সংস্কৃতিতত্ত্বের লেখকদের এবং আরও অনেকের ধারণা যে তারা পূর্বদিক থেকে ভারতে এসেছে। তাদের ভাষা হলো অষ্ট্রিক ভাষা (মন্‌খমের প্রভৃতি)। এটা পণ্ডিত শ্মিটের (Schmidt) আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র।

"কিন্তু নতুন তথ্য আবিষ্কারের পর আমাদের আরও হঠাৎ সন্দেহ হয়েছে, আমাদের এই আদিবাসী আখ্যাত মুণ্ডারাও 'য়ুরোপীয়'? ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা মুণ্ডারি ভাষার বিচার করে দেখেছেন যে এই ভাষা মূলতঃ ফিনো-উগ্রিয়ান (Finno-Ugrian) বর্গের ভাষা। [ফিনো উগ্রিয়ান বর্গ অর্থাৎ— হাঙ্গারীর, ম্যজিগ্যর, ভোগল, উরাল, ওষ্টিয়াক, কাজানের কেরিমিস, ফিনল্যাণ্ডের ফিন এবং নিজনি নভোগোরোদের মোর্দিন ভাষার সমবায়] মুণ্ডারী শ্রেণীর ভাষা অর্থে মুণ্ডারি খেড়িয়া হো সাঁওতাল গোষ্ঠীর ভাষা বোঝায়। কেউ কেউ একে কোলবর্গের (Kolarian Group) ভাষা বলেন। মুণ্ডারী ভাষার সঙ্গে ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তারা পশ্চিম থেকে পূর্বদেশে এসেছে। মুণ্ডা সাঁওতালদের সঙ্গে ফিনো-উগ্রীয় জাতিদের সংস্কৃতিগত আচার অনুষ্ঠানেরও সাদৃশ্য আছে (De Hevesy)।

দ্রাবিড় ভাষা সম্পর্কেও নতুন থিওরী হয়েছে।

"ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় 'দ্রাবিড়' কথাটি বরাবর একটা গোলমাল সৃষ্টি করে এসেছে। দ্রাবিড় বলতে বিশিষ্ট কোন নরবংশ বা নৃতত্ত্বগত জাতি বোঝায় না। রিজ্‌লি (Risley) সাহেব এই গোলমাল সৃষ্টি ক'রে গেছেন। দ্রাবিড়ভাষীদের একটা 'জাতি' (Race) কল্পনা করে নিয়ে তিনি দ্রাবিড় কথাটাকে অ্যানথ্রপলজির বিচারে নিয়ে এসে উৎপাত করেছেন। বর্তমানে দ্রাবিড় কথাটা ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়েও গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

"দক্ষিণ ভারতের তামিল কানাড় বা কর্ণাট, তেলেগু ও মালয়লম্—এই তিন ভাষাই প্রধানতঃ তথাকথিত দ্রাবিড় বর্গের ভাষা। এই ভাষীরা কিন্তু জাতিগত ভাবে এক নয়, এই জাতিরা কবে

(গ) ভারত শাসন-ব্যবস্থায় আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ঃ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধান অনুসারে পৃথক নির্বাচন প্রথার দ্বারা আদিবাসীদের জন্য আইনসভায় কতগুলি আসন সংরক্ষিত (Reserved) হয়েছে। এই সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা মোট ২৪টি। যথা—

	প্রদেশ	আদিবাসীদের সংরক্ষিত আসন
(১)	আসাম	৯
(২)	বিহার	৭
(৩)	উড়িষ্যা	৫
(৪)	বোম্বাই	১
(৫)	মাদ্রাজ	১
(৬)	মধ্যপ্রদেশ	১
	মোট	২৪

বাঙলা প্রদেশে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন একটিও নেই, যদিও বাঙলায় আদিবাসীর সংখ্যা ১৯ লক্ষের ওপর। দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থার কথা না বলাই ভাল, সেখানে সাধারণ শিক্ষিত প্রজা-সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব যা আছে তা না থাকারই মত, আদিবাসীদের কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব সম্পর্কে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ করবার সঙ্গত কারণ আছে। আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়ে জাতীয়তাবাদীরা বলতে গেলে কোন আগ্রহ করেন নি, যেমন

ভারতে এসেছে তার প্রমাণ আমরা পাই না। দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে উরালিয়ান (Uralian) ভাষার শব্দ ও বর্ণের প্রভাব এবং সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ...উরাল ভাষার প্রভাব দ্রাবিড় সভ্যতার বৈদেশিকতা প্রমাণ করিয়ে দেয়। উরালীয় ভাষীদের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের ভূমিজ (Autochthonus) মানুষের প্রস্তরীয় সংস্কৃতির সমন্বয় কি দ্রাবিড় সভ্যতার বেদী ?"

[লেখক প্রণীত 'কাগজের নৌকা' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত]

হরিজনদের দাবীর সম্পর্কে হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রা
হরিজনদের সংখ্যার সমান, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় আদিবাসীদের জ
একটি আসন সংরক্ষিত এবং হরিজনদের বেলায় কুড়িটি আসন সংরক্ষিত
উড়িষ্যাতে যদিও আদিবাসীদের জন্য পাঁচটি আসন সংরক্ষিত, কিন্তু এর মধ্যে চার
আসনের প্রতিনিধি স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট মনোনীত (Nominate) করেন। আইনসভা
মনোনয়নের ব্যাপার কোন প্রদেশেই নেই এবং কোন সম্প্রদায়ের জন্যই নেই, মাত্র
আদিবাসীদের বেলায় উড়িষ্যায় এই বিচিত্র গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা চালু রাখ
হয়েছে।

লোকাল বোর্ড ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আদিবাসীদে
প্রতিনিধি গ্রহণ করবার কোন পদ্ধতিই নেই। সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে
কিছুটা অগ্রসরশীলতার প্রমাণ দিয়েছেন।

আদিবাসীর ধর্ম

ভারত গভর্ণমেণ্টের সেন্সাস বা আদম সুমারীতে ধর্ম অনুসারে জনসংখ্যা গণনার চেষ্টা হয়ে থাকে। ভারতে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ জৈন খৃস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সমাজের জনসংখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের ধর্ম কি? ভারত গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা খোঁজ না ক'রে 'অ্যানিমিজম' (Animism) কথাটির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সব আদিবাসীকে এই এক 'ধর্মমতের' কোঠায় তালিকাভুক্ত করেছেন। অ্যানিমিজমের অর্থ 'জড়োপাসনা' বা 'ভূতপূজা' বা 'প্রেতবাদ'। আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে সরাসরি এই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। তাছাড়া এই আখ্যা দিলে হিন্দুসমাজের ধর্মমত থেকে তাদের পার্থক্যও ঠিক বোঝা যায় না; কারণ অ্যানিমিজম বা জড়োপাসনা বা প্রেতবাদ বলতে যা বোঝায়, তা হিন্দুসমাজের বহু শ্রেণীর ধর্মাচরণের মধ্যেও মিশে রয়েছে। সুতরাং এধারণা মিথ্যে নয় যে, আদিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে 'জড়োপাসক' সংজ্ঞাটি কিছুটা জবরদস্তি করেই চাপানো হয়েছে।

আদিবাসীদের অ্যানিমিস্ট বা জড়োপাসক আখ্যা দেওয়ার পেছনে একটা ব্রিটিশ কূটনীতি যে ছিল, তা অনুমান করবার কারণ আছে। ভারতের হিন্দুসমাজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতভাগে ভাগ (Fragmentation) করা যায়, সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ কূটনীতিবিশারদেরা অনেক চেষ্টা করেছেন। 'তপশীলী জাতি' (Scheduled Caste) নাম দিয়ে হিন্দুসমাজের একটা অংশকে পৃথক করবার চেষ্টা হয়েছে। যুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এঁরা হিন্দু হলেও অতি 'অবনত শ্রেণীর হিন্দু' এবং এঁদের স্বার্থের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সংরক্ষণের প্রয়োজন এবং এঁদের উপকার করবার জন্তেই সাধারণ হিন্দুসমাজ থেকে এদের ভিন্ন ক'রে বেছে নিয়ে একটা পৃথক নামকরণ হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ভারতের মুসলমান ও খৃস্টান সমাজের মধ্যেও 'অবনত শ্রেণী' আছে, কিন্তু তাদের পৃথক করা

হয় নি। কিন্তু হিন্দুর সমাজদেহকেই খণ্ডিত করবার রাজনৈতিক প্রয়াস বিশেষ-ভাবে হয়েছে।

হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা এত ব্যাপক যে, তার মধ্যে একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী থেকে আরম্ভ করে ভূতপূজক পর্যন্ত সবারই স্থান আছে। হিন্দুধর্ম কথাটা সাংস্কৃতিক অর্থেই সবচেয়ে সত্য। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নেহরু, মহর ডাঃ আম্বেদকর এবং কাছাড়ী শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম বা ওঁরাও রায়সাহেব বন্দীরাম—হিন্দু-ধর্মের পরিধির মধ্যে এঁদের সবারই স্থান আছে। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট 'তপশীলী জাতি' নাম দিয়ে একটা বিভেদ আমদানী করলেন, তারপর আদিবাসী-দের সম্বন্ধে অ্যানিমিস্ট বা জড়োপাসক নাম দিয়ে আর এক দফা বিভেদ ঢুকিয়ে দিলেন। তথাকথিত তপশীলী জাতিরা যদি সামাজিক সংজ্ঞা অনুসারে 'অবনত হিন্দু' হয়ে থাকে, তবে আদিবাসীরাও 'অবনত হিন্দু'। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট আদিবাসীদের 'অবনত হিন্দু' বলতে রাজী নন, কারণ তাতেও হিন্দুসমাজের একটা ব্যাপক রূপ স্বীকৃত হয়ে যায়।

হিন্দুসমাজের কয়েকটি উচ্চবর্ণের অনুদার ও সঙ্কীর্ণ আচরণের (দৃষ্টান্তঃ অস্পৃশ্যতা) জন্য তপশীলী জাতিদের মধ্যে অনেকের মনে মোটামুটি একটা হিন্দুসমাজবিরোধী বিক্ষোভ আজকাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু তপশীলী জাতিরা নিজেদের হিন্দু বলতে কোন দ্বিধা করেন না এবং হিন্দুধর্মকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন না। বর্ণহিন্দুবিরোধী মনোভাব এঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলেও হিন্দুধর্ম-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি। সমস্যাটা বস্তুত ঘরোয়া বিবাদের মত এবং বিবাদটা সামাজিক। আদিবাসীদের মনোভাবের মধ্যেও একই ধরণের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। আদিবাসীরা তাঁদের নিজস্ব উৎসব, পূজাপদ্ধতি ও বিশ্বাস নিয়ে আছেন এবং তার মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীর পূজাপদ্ধতি ও হিন্দুসুলভ ধর্মবিশ্বাসকেও তাঁরা নিজস্ব করে নিয়েছেন। আদিবাসীদের মনে হিন্দুধর্ম-বিরোধী কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু তথাপি, হিন্দুসমাজ-বিরোধী একটা বিক্ষোভ আছে। এক্ষেত্রেও বিক্ষোভের মূল কারণ হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক।

হিন্দুসমাজের এই অভ্যন্তরীণ সামাজিক শ্রেণী-পার্থক্য ও বৈষম্যগুলির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ কূটনীতি হিন্দুসমাজকে তিন ভাগ করার চেষ্টা করেছে। 'তপশীল জাতিদের' ভিন্ন করা হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের সম্বন্ধে একটা নতুন ধর্ম আরোপ করার চেষ্টা সফল হয় নি, 'অবনত হিন্দু' নাম দিয়ে তাদের হিন্দুত্বকে যেন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্বীকার করতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়েছে ; কিন্তু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধর্ম (অ্যানিমিজম বা জড়োপাসনা) আরোপ করে একেবারে পৃথক করার চেষ্টা হয়েছে।

১৮৯১ সালে ভারতের সেন্সাস কমিশনার জে এ বেইন্‌স্ (J. A. Baines) বলেন : "বহু উপজাতীয় গোষ্ঠী (Tribal People) বর্তমানে হিন্দু হয়ে গেছে। এদের ধর্মমত এবং যারা এখনও অহিন্দু উপজাতীয়রূপে আছে, তাদের ধর্মমতের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানতে পারা যায় না।"

স্যার হার্বার্ট রিজলি (Sir Herbert Risley) তাঁর ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলেছেন : "হিন্দুধর্ম এবং জড়োপাসনার (Animism) মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য করা সম্ভব নয় …………উপজাতীয় (Tribal) লোকেরা ধীরে ধীরে অল্প অল্প ক'রে হিন্দুত্ব গ্রহণ ক'রে চলেছে। সুতরাং ঠিক কতখানি এবং কি পরিমাণের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করবার পর একজন উপজাতীয়কে হিন্দু বলা উচিত সে সম্বন্ধে কোন একটা মাপ স্থির করা সম্ভব নয়।"

১৯২১ সালের বিহার ও উড়িষ্যার সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি সি ট্যালেণ্টস্ (P. C. Tallents) বলেছেন : "প্রত্যেক লোক গণনার সময় আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে—এই সকল (আদিবাসী) লোকদের অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের থেকে পৃথক করে দেখা খুবই কঠিন হয়।"

১৯২১ সালের বোম্বাইয়ের সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরিষ্কারভাবে মন্তব্য করেছেন, "আমার বলতে কোন দ্বিধা নাই যে অ্যানিমিজম বা জড়োপাসনা কথাটাকে ধর্মের সংজ্ঞা হিসাবে একেবারে বাতিল করে দেওয়া উচিত। যাদের

এযাবৎ 'অ্যানিমিস্ট' নামে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাদের সকলকেই 'হিন্দু' নামে তালিকাভুক্ত করা উচিত।"

১৯২১ সালে ভারতের সেন্সাস কমিশনার মিঃ জে টি মার্টেন (J. T. Marten) তাঁর অভিমত খোলাখুলিভাবেই রিপোর্টে ঘোষণা করেছেন: "অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের ধর্মমত আর একজন ভীল বা গন্দের ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য করবার খুব সামান্যই কারণ আছে। উভয় সমাজই (অবনত হিন্দু এবং ভীল বা গন্দ) প্রধানতঃ জড়োপাসক। পার্থক্য মাত্র এই যে, অবনত হিন্দু তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে হিন্দু সমাজব্যবস্থার অনুশাসনের মধ্যে এনেছে, ভীল বা গন্দেরা এখনো তা পারে নি।"

১৯৩১ সালের সেন্সাস কমিশনার ডাঃ জে এইচ হাটন (Dr. J. H. Hutton) অ্যানিমিজম কথাটির ব্যবহারে আপত্তি করেন এবং তার বদলে 'উপজাতীয় ধর্মসমূহ' (Tribal Religions) এই একটা বর্গ কল্পনা করে আদিবাসীদের তার তালিকাভুক্ত করবার একটা চেষ্টা করেন। উপজাতীয় 'ধর্মসমূহ'—স্পষ্টতঃ ডাঃ হাটন বহুবচনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ উপজাতীয়দের অনেকগুলি ধর্ম। উপজাতীয়দের 'বিশিষ্ট একটা ধর্ম' তিনি খুঁজে পান নি। ডাঃ হাটন একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন, যার যৌক্তিকতা অনেকেই স্বীকার করেন। তিনি বলেন: "১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে উপজাতীয় ধর্মমতসমূহকে একটি 'আকারহীন' (Amorphous) ও অশিক্ষিত মনের আবছা কাল্পনিক কুসংস্কার বলে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা আমি স্বীকার করি না। অতীতে এক সময় অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং অস্ট্রলয়েড সংস্কৃতি এক বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং তার মধ্যে যে একটি সুস্পষ্ট দর্শন ও সত্যিকারের ধর্মাচরণ ('a real religious system and a definite philosophy') দেখা দিয়েছিল, বর্তমান আদিবাসীদের ধর্ম তারই ধ্বংসজনিত আবর্জনার মত টুকরা টুকরা নিদর্শন।" ডাঃ হাটনের ধারণা, বর্তমান হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ ঋগ্বেদের ধর্ম ও আর্যপূর্ব প্রচলিত ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসগুলির সম্মিলিত রূপ। তিনি মনে করেন, বর্তমানে

উপজাতীয় বা আদিবাসীদের মধ্যে যেসব ধর্মমত প্রচলিত আছে, তা দেখে মনে হয় য়, সেগুলি বস্তুতঃ "বাড়তি মাল ('surplus material') মাত্র, যা হিন্দুত্বের মন্দির-দেহের সঙ্গে এখনো সংলগ্ন করা হয় নি।"

হিন্দুত্বের সঙ্গে আদিবাসীদের এতখানি ঐতিহাসিক ও ধর্মগত লেনদেন ও সমন্বয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেও ডাঃ হাটন আদিবাসীদের হিন্দু বলতে রাজী হন নি। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে একটা মনগড়া যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। "যতক্ষণ না আদি-বাসীরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ করে, গরুকে পবিত্র জীব মনে করে এবং হিন্দু মন্দিরের বিগ্রহ পূজা করে, ততক্ষণ আদিবাসীদের হিন্দু বলা ঠিক হবে না।" দেখা যাচ্ছে যে, ডাঃ হাটন হিন্দু ও আদিবাসীসমাজের মধ্যে ধর্মগত অজস্র সাদৃশ্য ও সমন্বয়ের ইতিহাসটুকু লাভ করেও কোথায় কোথায় দু' একটা পার্থক্য আছে, খুঁটে খুঁটে তাই বের করে ভেদবাদের ভিত্তিটা তৈরী করবার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণা ডাঃ হাটনের বৈজ্ঞানিক বিচারকে মাঝে মাঝে ব্যাহত করেছে। এ সব সত্ত্বেও ডাঃ হাটনের মন্তব্যের মধ্যে আসল সত্যটুকু চাপা পড়তে পারে নি। তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন: "হিন্দুধর্ম এবং উপজাতীয় বা আদিবাসী ধর্মসমূহ, এই দুয়ের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা দুষ্কর। উপজাতীয়-দের হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ। যে যে অঞ্চলে 'পাহাড়ী' বা 'জংলী' উপজাতীয়েরা তাদের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার সম্পর্কে হিন্দুদের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই দেখা গিয়েছে যে, উপজাতীয়েরা তাদের প্রতিবেশী হিন্দুধর্ম থেকে অজস্রভাবে উপাদান আহরণ করে নিয়েছে; যদিও মনের দিক দিয়ে তাদের প্রাচীন চিন্তাপদ্ধতি অপরিবর্তিত থেকে গেছে।"

পূর্ব পূর্ব সেন্সাস রিপোর্টে আদিবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাকে ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ভারতের সেন্সাস কমিশনার মিঃ ইয়েট্স্ (Mr. W. M. Yeatts) একেবারে বাজে ('worthless') বলে বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, কোন আদিবাসীকে হিন্দু আখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট ভিত্তি প্রমাণ বা লক্ষণ স্থির করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তিনি বলেছেন:

অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে তুলনায় খৃস্টধর্ম এবং ইসলাম একটি বিষয়ে পৃথক্। অন্যান্য ধর্মমত আর এই দুই ধর্মমতের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যের প্রাচীর রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে এই দুই ধর্ম গ্রহণ করতে হলে এই প্রাচীর অতিক্রম করে যেতে হবে। কিন্তু যাকে হিন্দুধর্ম বলা হয় এবং যাকে অ্যানিমিজম্ বলা হয়, এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রাচীর নেই, বরং যেন একটা উন্মুক্ত বেওয়ারিশ অঞ্চল ('no man's land') পড়ে রয়েছে। যে পদ্ধতিতে আদিবাসী উপজাতির মানুষ হিন্দু-সমাজে এসে সংমিশ্রিত হয়ে যায়, তার মধ্যে দীক্ষা নেবার (conversion) কোন অনুষ্ঠান নেই। হিন্দুসমাজে যেতে হলে হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন মতবাদ গ্রহণ করতে হবে, অথবা বিশেষ শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করতে হবে—এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। বরং বলা যায়, ধীরে ধীরে ঐ বেওয়ারিশ অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে যাওয়াই হিন্দুসমাজে আসবার প্রক্রিয়া। এই অগ্রসর হবার প্রক্রিয়া সাধারণত কয়েকপুরুষ ধরে চলতে থাকে। অন্ততঃ অর্ধেক পথ পার হয়ে হিন্দুসমাজের দিকে অগ্রসর হলে তবেই তাকে "হিন্দু" আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। সুতরাং কোন আদিবাসী অগ্রসর হয়ে অর্ধেক পথ পার হয়েছে কিনা, এটা বোঝা খুবই কঠিন।*

*"The fact is of course that while between Islam or Christianity and othe religions there exists as it were a definite wall or fence over which or through which the convert must go, there is nothing between what is usually though vaguely described as Animism and the equally vague and embracing concept of Hinduism but a very wide no man's land; and the process by which a tribesman is assimilated to a Hindu is not that of conversion or the acceptance of a particular creed or joining in a definitely marked out section of the population, but a more or less gradual traversing of this no man's land. The traverse may and generally does occupy more than one generation and it would take an expert to say at what period and in which generation more than half the no man's land had been crossed so that one could say that the assimilation was more than half completed." —Census of India : 1941.

আদিম অধিবাসী অথবা উপজাতীয় হিন্দু ?

ধর্ম ভাষা শোণিত এবং আচার—জাতিগত এইসব প্রধান ভিত্তিগুলির বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্, বর্তমান হিন্দুসমাজ এবং আদিবাসী সমাজের মধ্যে পার্থক্য কতখানি এবং সাদৃশ্য কতখানি।

প্রাচীন নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে ফরসাইথ (Forsyth) বলেছেন: "বৈগা ভীল গন্দ কোল কোরকু এবং সাঁওতাল প্রভৃতি বিশিষ্ট উপজাতীয়ের মধ্যে কারা ভারতের প্রকৃত আদিম অধিবাসী অথবা কারা প্রথম ভারতে এসে বসতি স্থাপন করেছে, তা সম্ভবতঃ কখনই জানা যাবে না।……এদের আচার ধর্ম ও ভাষার সঙ্গে হিন্দুদের আচার ধর্ম ও ভাষা এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য এখন খুঁজে বের করা অসম্ভব। আধুনিক হিন্দুধর্মাবলম্বী বিরাট জাতিগুলির সঙ্গে এরাও ক্রমশঃ যদিও মিশে যেতে চলেছে, তবুও এদের বর্তমান অবস্থা হিন্দুসমাজ থেকে অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট এবং পৃথক।" (১)

যাযাবরবৃত্তির কারণে এবং প্রাচীনকালের রাজনৈতিক কারণে আদিবাসী বহু গোষ্ঠী ভারতের এক স্থান ছেড়ে আর এক স্থানে বসতি স্থাপন করেছে। কখনো বা অভিযান করে দূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। ব্র্যাডলে-বার্ট (Bradley-Birt) বলেন—"মুসলমান শাসনের শেষ দিকে পর্যন্ত পাহাড়িয়া সাঁওতাল এবং ভুইয়া প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী বর্তমান সাঁওতাল পরগণার অধিত্যকা অঞ্চলে বসতির সন্ধানে দলে দলে আসা যাওয়া করেছে।" লাড়্কা কোলেরা দক্ষিণে অভিযান করে ভুইয়াদের হটিয়ে দিয়ে সিংভূম অধিকার করে। (২)

কোরকু নামে আদিবাসী গোষ্ঠীটি বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পাহাড় অঞ্চলে বাস করে। এদের ভাষার সঙ্গে খেড়োয়ারী ভাষার (অর্থাৎ মুণ্ডারি অর্থাৎ সাঁওতালী বা কোলবর্গের ভাষা) সাদৃশ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খেড়োয়ারী-

---

(১) The Highlands of Central India—Forsyth.

(২) The Story of an Indian Upland—Bradley-Birt.

ভাষী ছোটনাগপুরী আদিবাসী কুটুম্বের কাছ থেকে কোরকুরা বর্তমানে বহু দূরে সরে গেছে। এই দুই কুটুম্বগোষ্ঠীর দুই উপনিবেশের মধ্যে সুবিস্তৃত দ্রাবিড়ভাষী গন্দ অঞ্চল অবস্থিত।

ছোটনাগপুরের ওঁরাও এবং রাজমহলের পাহাড়িয়াদের মধ্যে এক শ্রেণী যে ভাষায় কথা বলে তাতে বোঝা যায় যে, তারা দূর কর্নাট অঞ্চল থেকে এসেছে। "গন্দ এবং খন্দেরা দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চল থেকে উত্তরে এগিয়ে গিয়ে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় বসতি স্থাপন করে।……মধ্য-প্রদেশের বৈগা গোষ্ঠী ছোটনাগপুরের ভুইয়াদের একটি শাখা। কিন্তু বর্তমান বৈগারা হিন্দীভাষী এবং বর্তমান ভুইয়ারা পার্বত্য উড়িষ্যায় থাকে ও তারা উড়িয়াভাষী। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হবার পর খন্দেরা মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য বা আরণ্য অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। (১)

দূর অতীতের কথা বাদ দিলেও নিকট অতীতের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় যে, মাঝে মাঝে দুর্বল হিন্দু উপনিবেশ বা রাজ্য অঞ্চলে অন্য স্থান থেকে এসে আদিবাসীরা বসতি করে ফেলেছে এবং হিন্দুরা সরে গেছে। "এই অঞ্চলে (বিলাসপুর জমিদারী অঞ্চল) এককালে হিন্দু উপনিবেশ ছিল। এখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর ও মন্দিরগুলি দশম ও দ্বাদশ শতকের নিদর্শন।……এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই দেশ ১৬ এবং ১৭ শতাব্দীতে যেন আবার বর্বরতার মধ্যে পিছিয়ে যায়, সে সময় ছত্রিশগড় রাজবংশ তাদের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। রতনপুরের রাজপুত রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় পাহাড়ী অঞ্চলে কতকগুলি অনার্য গোষ্ঠীর দস্যুসর্দার প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এদেরই সাফল্যের প্রেরণায় দলে দলে আদিম অধিবাসীরা এই অঞ্চলে আগমন করে এবং বর্তমানে তারাই এই অঞ্চল দখল করে রয়েছে। (২)

---

(১) Tribes & Castes of the Central Provinces—Russel & Hiralal

(২) Final Report on the Land Revenue Settlement of the Zamindari States of the Billaspur District—Wills.

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের বর্তমান আদিবাসী গোষ্ঠীবর্গ যে যে অঞ্চলে বাস করছেন, তাঁরা সেখানকার "ভূমিজ" (Autochthones) সন্তান নন। ঔপনিবেশিকদের মত আদিবাসীরা দূর ও নিকট অতীতে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে নূতন নূতন বসতি স্থাপন করেছে, এবং কালক্রমে এবং ঘটনাচক্রে আবার নূতন কোন স্থানে চলে গেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, বর্তমান অঞ্চল অনুসারে আদিবাসীরা হয়তো ঠিক সেই সেই অঞ্চলের "ভূমিজ" নয়, কিন্তু তারা ভারতের ভূমিজ সন্তান। অর্থাৎ তারা ভারতবর্ষেরই ভূমিজ আদিম অধিবাসী এবং ঘটনাচক্রে ভারতেরই একস্থান থেকে আর এক স্থানে বসতি স্থাপন করে বেড়িয়েছে। এই সিদ্ধান্তেরও একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে সত্য নির্ধারণ সম্ভব।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, কতগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী আছে যারা হিন্দু-আর্য (Indo-Aryan) ভাষায় কথা বলে। যথা, ভীল, বৈগা মালপাহাড়িয়া, ভুইয়া প্রভৃতি। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এরা পূর্বে ভিন্ন একটা 'নিজস্ব' জাতীয় ভাষায় কথা বলতো, পরে ঘটনাক্রমে এদের ভাষান্তর ঘটেছে। এদের কথা বাদ দিলেও বর্তমানে দেখা যায় যে, আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান দুটি জাতীয় ভাষা রয়েছে। ওঁরাও, গন্দ, খন্দ এবং পাহাড়িয়াদের একাংশ প্রধানতঃ দ্রাবিড়-ভাষী। সাঁওতাল মুণ্ডা কোর্কু প্রভৃতি খেড়োয়ারী-ভাষী। এই দুই ভিন্ন ভাষাবলম্বী আদিবাসী সমাজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সুতরাং এদের মধ্যে কারা যে ভারতের প্রথম বসতিস্থাপক (Settler) তা আমরা জানি না। এক্ষেত্রে এই দুয়ের মধ্যে কাউকে আদিম অধিবাসী (Aborigines) বলা উচিত হবে কি?

আর্যদের, অর্থাৎ হিন্দু-আর্যদের যদি ভারতে বহিরাগত লোক (Immigrant) বলা যায়, তবে দ্রাবিড়ভাষী ও খেড়োয়াড়ীভাষী লোকদের সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়—ডাঃ হাটন এই মত অবলম্বন করেন। তাঁর মতে দ্রাবিড়ভাষী ও খেড়োয়াড়ী-

ভাষী উভয়েই ভারতে বহিরাগত। দ্রাবিড়ভাষীরা এসেছে সিন্ধুর ভেতর দিয়ে এবং খেড়োয়াড়ীভাষীরা পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে। ডাঃ হাটনের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হলো এই : "ভারতের প্রথম অধিবাসী হলো নিগ্রোবটু (Negrito) গঠনের নরগোষ্ঠী, কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্যের কোন চিহ্ন ভারতে স্থায়ী হয় নি। এদের পরে ভারতে প্রায়-অস্ট্রেলয়েড (Proto-Australoid) নরগোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং এদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে ভারতে স্থায়ী হতে পেরেছে। বলতে গেলে এরাই ভারতের 'আদিম অধিবাসী' (Aborigines)। ভারতের অতি প্রাচীন যুগের এই নিগ্রোবটু এবং প্রায়-অস্ট্রেলয়েড নরগোষ্ঠীর ভাষা কি ছিল, তার কোন পরিচয় ও প্রমাণ আমরা জানি না। ভাষা হিসাবে প্রথম নরগোষ্ঠীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তারা হলো খেড়োয়ারীভাষী মানুষ এবং এই ভাষা অস্ট্রো-এসিয়াটিকবর্গের (Austro-Asiatic) ভাষা। সুতরাং খেড়োয়ারী-ভাষীরা যে ভারতে বহিরাগত তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি। ঠিক এইভাবেই দ্রাবিড়-ভাষী জাতি বাইরে থেকে ভারতে এসেছে, হিন্দু আর্যভাষীরাও এসেছে।" সুতরাং আদিকাল থেকে ভারতে ভূমিষ্ঠ কোন ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করার মত কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। আদিম অধিবাসী কথাটি বর্তমান ভারতের কোন বিশেষ জাতি সমাজ বা গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না।

ভারতে ব্রিটিশ শাসননীতির মধ্যে কি বিচিত্র ভেদবাদ গ্রহণ করা হয়েছে, 'আদিম অধিবাসী' থিওরী তার এক একটা প্রমাণ। কে কবে ভারতে প্রথম বসতি করেছে, হাজার হাজার বছর পূর্বের বিস্মৃত ইতিহাসের রহস্যের মধ্যেই সে সত্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু ব্রিটিশ নীতি প্রস্তর যুগেরও পূর্বের জীর্ণ ইতিহাসের কঙ্কাল ধরে টানাটানি করেছেন ভারতের জাতীয় ঐক্যকে খণ্ডিত করবার জন্য। ধর্মকে ভেদবাদের অজুহাত করে যেমন হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচন (Separate Electorate) প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে, তেমনি ভারতীয় সমাজের মধ্যে কারা প্রাচীন এবং কারা অর্বাচীন, এই কল্পিত পার্থক্যের অজুহাত করে, আদিবাসীদেরও আধুনিক জাতিদেহ থেকে পৃথক করবার চেষ্টা হয়েছে। হিন্দু-

মুসলমানকে যেমন পৃথক নির্বাচনের কৌশলে আদিবাসীদেরও তেমনি 'পৃথক অঞ্চলের' কৌশলে ভিন্ন করে রাখা হয়েছে। ভারতের যে যে অঞ্চল প্রধানতঃ আদিবাসীদের বাসভূমি সেই সব অঞ্চলগুলিকে 'তপশীলী জিলা, (Scheduled District), 'অনগ্রসর অঞ্চল, (Backward Tract) 'এবং শাসনসংস্কার-বহির্ভূত অঞ্চল' (Excluded Area) নাম দিয়ে বড়লাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখা হয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি অধিকাংশ আদিবাসী অঞ্চলে প্রচলিত নয়, কোন কোন অঞ্চলে আংশিকভাবে প্রচলিত। আধুনিক ভারতীয় সমাজ যে ব্যবস্থায় জীবন যাপন করছে, আদিবাসী সমাজকে সেই ব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আদিবাসী সমাজকে 'বিশেষভাবে যত্ন করার' জন্য ব্রিটিশ অভিভাবক তাকে আধুনিক ভারতীয়ের সান্নিধ্য থেকে আড়াল করে রেখেছেন। 'আদিম অধিবাসী' থিয়োরী এই কূটনীতির একটা বড় সহায়ক।

এই থিয়োরী নিতান্তই জবরদস্তির থিয়োরী। ইতিহাসের সত্য হলো, আধুনিক হিন্দু সমাজের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের একটা সম্পর্কের সূত্র ধীরে ধীরে, নানা ছোট বড় বাধা সত্ত্বেও, একটা ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপনের কাজ করে চলেছে। সাঁওতাল সমাজ ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে, কিন্তু বহু হিন্দু আচার এবং উৎসবকে তারা আপন করে নিয়েছে। ১৮৯১ সালে সাঁওতালদের মধ্যে একটা সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক জনৈক সাঁওতাল মনস্বী, নাম ভাগ্‌রিথ অর্থাৎ ভগীরথ। সংস্কারক ভগীরথের আন্দোলনের প্রধান বিষয়গুলি ছিল—শূকর এবং মুর্গী খাওয়া বন্ধ করতে হবে, মদ্য পান ত্যাগ করতে হবে এবং মারাং বুরু দেবতার পূজো ছেড়ে দিয়ে 'এক ঈশ্বর' বিশ্বাস করতে হবে। রিজলি সাহেবের মতে পশ্চিম বঙ্গের কুর্মি সমাজ বস্তুতঃ সাঁওতালদেরই একটি হিন্দুত্বপ্রাপ্ত শাখা। রাজমহল পাহাড়ের কটৌরি নামে একটি পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর শাখা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। ভুইয়ারা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করে এবং ভুইয়া সমাজের অনেক 'দেশীয় রাজা' এবং জমিদারেরা ক্ষত্রিয়ত্বেরও দাবী করেন। মানভূমের ভূমিজ কোলেরা হিন্দু হয়ে গেছে, বাঙলায় কথা বলে। হিন্দুধর্মীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করেও এরা প্রাচীন

গোষ্ঠীর নৃত্যগীতমুখর উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে অবশ্য ত্যাগ করে নি। ওঁরাওদের মধ্যে 'টানা ভগত' আন্দোলন বিরাট জাতীয় আন্দোলনরূপে প্রসার লাভ করে। টানা ভগত আন্দোলনে ওঁরাওয়েরা যেসব মন্ত্র আবৃত্তি করে তা হিন্দী ভাষাতেই রচিত। টানা ভগত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় জাগরণের ভাব ওঁরাও সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছিল, এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক হিন্দুধর্মের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যে কবীর পন্থের প্রচারও হয়েছে। ১৯২১ সালের বিহার-উড়িষ্যার সেন্সাস রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, "কবীর পন্থে ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের চিন্তা ও জীবনযাপন প্রণালীতে বিশিষ্ট রকমের উন্নতি-মূলক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।"

হিন্দুর সামাজিক শ্রেণীবিভাগে 'অন্ত্যজ' বলে একটা কথা আছে। অন্ত্যজ সবার অধম, দীনের হতে দীন, ঘৃণিত। তবু তারা হিন্দু। আদিবাসী সমাজের অনেকে হিন্দু সমাজের এই 'অন্ত্যজ' প্রথাকে অত্যন্ত ভয় করে, কেন না আদি-বাসীরা বৈষয়িক সম্পদে দীন হলেও তারা সামাজিক গণতন্ত্রে বর্ধিত মানুষ। হিন্দু সমাজে আদিবাসীকে আনতে হলে একটা না একটা শ্রেণী বা 'জাত' হয়েই আসতে হয়। দুঃখের বিষয়, এভাবে যারা এসেছে তাদের অনেককে একেবারে ছোট জাত হয়েই আসতে হয়েছে। যদি 'ইতর' বা 'অন্ত্যজ' আসনগুলি ছাড়া আদি-বাসীদের জন্য হিন্দু সমাজে আর একটু উচ্চ স্তরের আসন খোলা থাকতো, তবে বহুদিন পূর্বেই আদিবাসী সমাজ সমগ্রভাবে হিন্দু সমাজদেহের অঙ্গীভূত হয়ে যেত; দুর্ভাগ্যের বিষয় তা হয় নি। বর্তমানের উড়িয়া-ভাষী খন্দ সমাজকে উড়িয়া হিন্দুরা ডোমের সমশ্রেণী বলে মনে করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুর গোঁড়ামি এক-আধটুকু শিথিল হয়েছে দেখা যায়। যেমন পুরীর শবর জগন্নাথ মন্দিরের রন্ধনশালায় পাচকের কাজ করবার অধিকার লাভ করেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের সহরগুলিতে মেথর এবং ধাঙড় সমাজের ইতিহাস যদি

অনুসন্ধান করে কেউ দেখেন, তবে জানতে পারবেন কত হতভাগ্য আদিবাসী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় অবস্থার জন্যই পুরীষবাহকের কাজ গ্রহণ করেছে।

আবার অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যাদের মধ্যে এক একটা বড় অংশ হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছে, এদের একেবারে 'অন্ত্যজ' হবার দুর্ভাগ্য হয় নি। কারণ, সংখ্যায় অনেক হওয়ায় এরা নিজস্ব একটা সমাজ রাখতে পেরেছে। খন্দদের মধ্যে যারা হিন্দু হয়েছে, তারা রাজখন্দ নামে পরিচিত। কোরকুদের মধ্যে যারা হিন্দু হয়েছে, তারা রাজ কোরকু নামে পরিচিত। ভীলেরাও হিন্দু হয়ে গেছে। বৈগাদের মধ্যে যারা হিন্দু হয়ে গেছে তাদের সমাজ বিঁন্ঝোবার নামে পরিচিত। হিন্দু সমাজ এদের যেভাবেই গ্রহণ করে থাকুক, এরা নিজেরা কিন্তু নিজেদের অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু বলে মনে করে না। বরং এদের মধ্যেও উচ্চবর্ণসুলভ জাতের গর্ব বেশ ভালভাবে দেখা দিয়েছে। রাজকোরকু বা রাজখন্দেরা চামার বা মুসলমমানদের ছোঁয়া খায় না। খান্দেশের ভীলেরা মহর চামার ও মুচি প্রভৃতি 'হরিজনের' হাতের ছোঁয়া রান্না-করা খাদ্য খায় না, যদিও মুচিরা ভীলদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে থাকে। মান্ধাতা পাহাড়ে দেবমন্দিরের বিগ্রহের পূজারী ভীলবংশের লোক, ঠাকুর গোষ্ঠীর আদিবাসীরা ধর্মকর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করতে আরম্ভ করেছে। কত্কারি আদিবাসী অহিন্দুর হাতের ছোঁয়া খাদ্য খায় না। এরা প্রতিবেশী হিন্দুর মত পন্ধরপুরে তীর্থযাত্রা করতেও শিখেছে। বর্লি আদিবাসীরা বিবাহ অনুষ্ঠানে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করছে। বর্ণহিন্দুরা গৃহকর্মে বর্লিদের পরিচারকের কাজে নিযুক্ত করতে কোন দ্বিধা করেন না।

সুতরাং আদিবাসীদের সম্পর্কে যেমন অ্যানিমিস্ট আখ্যা খাটে না তেমনি আদিম অধিবাসী আখ্যাও খাটে না বরং বলতে পারা যায়—উপজাতীয় হিন্দু (Tribal Hindu) এবং এই উপজাতীয় হিন্দু বস্তুত 'অবনত হিন্দু' ছাড়া আর কিছু নয়।

হিন্দু সমাজের প্রতি আদিবাসীর স্বাভাবিক আগ্রহ

বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানী লেখকেরা অনেকে আদিবাসী সমাজের এই ঐতিহাসিক পরিচয়টুকু ধরতে পারেন নি। তাই অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কেন আদিবাসীরা তাদের জংলী জীবনের সামাজিক স্বাধীনতা ছেড়ে দিয়ে হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা নিম্নশ্রেণীর আসন গ্রহণ করবার জন্যও আগ্রহশীল? দরিদ্র ও অনগ্রসর আদিবাসীরা সামাজিক এবং বৈষয়িক উন্নতি কামনা করে, কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা নিম্ন শ্রেণীর ঠাঁই গ্রহণ করে কি সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়? ব্রিটিশ সমালোচকেরা এর রহস্য বুঝে উঠতে পারেন না।

১৯৩১ সালের বিহার-উড়িষ্যা আদম সুমারির রিপোর্টে সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লেসি (Lacey) লিখেছেন: "ছোটনাগপুরের কুর্মি মাহাতোরা এই বলে আন্দোলন আরম্ভ করেছে যে, কুর্মিরা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব। আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, এই আন্দোলন কি কুর্মি মাহাতো সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হবে?" ১৯৩১ সালের মধ্যপ্রদেশের সেন্সাস রিপোর্টে মিঃ সুবার্টও (Shoobert) এই ধরণের আদিবাসী দরদ প্রকাশ করেছেন—সামাজিক মর্যাদা উন্নত হবে, এই আশায় আদিবাসীরা হিন্দু বলে পরিচিত হতে চায়, কিন্তু সত্যি কি এ আশা সফল হবে? মিঃ এলুইন আদিবাসীদের কতকগুলি সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করে এই মন্তব্য করেছেন—'এই সব আন্দোলনের দ্বারা আদিবাসীরা ইচ্ছে করেই তাদের সংস্কৃতি নষ্ট করেছে, এর ফলে বর্ণ হিন্দুরা তাদের শ্রদ্ধা করবে এই তাদের আশা।' (১) ডাঃ হাটন আরও বেশী দুঃখিত। "শোচনীয় ব্যাপার এই যে, আদিবাসী গোষ্ঠীরা হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা 'জাত' (Caste) হবার জন্য এত আগ্রহশীল এই কারণে যে, এর ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত হবে বলেই তারা মনে করে। কিন্তু এর ফলে সাধারণত আরও বেশী অধঃপতন হয়ে থাকে।" আর একজন

---

(১) The Baiga—By Verrier Elwin.

সমালোচক ও' ম্যালি দুঃখ করে লিখেছেন—'শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসীরাই বেশী করে হিন্দুধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে'। (২)

ব্রিটিশ সমালোচকের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে আদিবাসী দরদের প্রমাণ যতটা না পাওয়া যায়, হিন্দুসমাজবিরোধী উষ্মার প্রমাণ ততটা পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজগঠনের মধ্যে এমন কি বিশিষ্ট মহত্ত্ব বা শক্তি আছে যার জন্য আদিবাসীরা হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে? ব্রিটিশ সমালোচকেরা এ বিষয়ে বৈদেশিক গোঁড়ামি বর্জন ক'রে একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করেন না। 'জাত' (বা Caste System) নামে হিন্দুসমাজের একটা 'খারাপ প্রথার' কথা তাঁরা অবগত আছেন, এবং এই জানাটাই সর্বস্ব করে বসে আছেন, এছাড়া যেন হিন্দুসমাজের আর কোন সৎ বৈশিষ্ট্য নেই। এবং জাত প্রথারও যে অন্যদিক দিয়ে কতগুলি সামাজিক শক্তি আছে, তার তাৎপর্য একেবারেই তাঁদের মাথায় ঢোকে নি।

ব্রিটিশ সমালোচকের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্। আধুনিক ভারতীয়েরা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিতে পারেন? হিন্দুসমাজের জাতপ্রথা ও উচ্চনীচ বর্ণভেদ থাকা সত্ত্বেও কেন আদিবাসীরা হিন্দুত্বের প্রতি আগ্রহশীল? আদিবাসীদের হিন্দুত্ব গ্রহণের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমগ্র ব্যাপারটা একতরফা উদ্যোগেই হয়েছে। আদিবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হিন্দুসমাজের দিকে এগিয়ে এসেছে, হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের হিন্দুসমাজে গ্রহণ করবার জন্য হিন্দুদের দিক থেকে কোন উদ্যোগ হয় নি। হিন্দুসমাজের বিরাট কাঠামোর মধ্যে যে স্তরে সম্ভব হয়েছে, সেই স্তরেই হিন্দুত্বপ্রয়াসী আদিবাসী নিজের গুণে এসে স্থান গ্রহণ করেছে। দ্রোণ একলব্যকে শিষ্যত্ব দিতে রাজী হয় নি, একলব্য তবু নিজের জেদে দ্রোণকে গুরুরূপে মনে মনে মেনে নিয়েছিল। হিন্দুসমাজ ও আদিবাসী সমাজের পারস্পরিক মনোভাবের মধ্যে কতকটা দ্রোণ-একলব্য সম্পর্কের রীতি যেন রয়েছে।

যাই হোক্, ব্রিটিশ সমালোচকেরা তাদের খৃষ্টীয় সমাজদেহের-ইস্পাতগঠন (steel frame) দেখে মনে করেন যে এর চেয়ে ভাল সমাজগঠন আর কি হতে

(2) Modern India and the West—O' Malley.

পারে? হিন্দুসমাজ গঠনকে তাঁরা নিতান্ত একটা জাতপ্রথা বিড়ম্বিত গোঁড়া, পরিবর্তনবিমুখ সমাজ বলে মনে করেন। এটা তাঁদের একপেশে দৃষ্টির দুর্বলতা মাত্র। বহু বৈচিত্র্যে, বহু বিরোধী রীতি-নীতির সামঞ্জস্য মিশ্রণে ও সমন্বয়ে, বহু ভাষা পরিচ্ছদ আচার উৎসব ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ভূমিকার বিরাটত্বে, অতি পরিব্যাপ্ত ও অতি গভীর হিন্দুসমাজের সত্তায় পরিবর্তন ও আহরণের যে শক্তি আছে, সেটা দেশী বিদেশী অনেক সমালোচকেরা সহজে দেখতে পান না। হয়তো হিন্দু সমাজের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আদিবাসী সমাজ এর প্রতি আকৃষ্ট। আর যদি সমাজের কথা ছেড়ে দিই, তবে বলতে হয় হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য আদিবাসী সমাজ হিন্দুসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হিন্দু সংস্কৃতিকে আদিবাসীরা বৈদেশিক সংস্কৃতি বলে মনে করতে পারে না। কিন্তু জাতপ্রথাহীন বিখ্যাত খৃস্টীয় ও মুসলিম সংস্কৃতিকে আদিবাসীরা বৈদেশিক সংস্কৃতি বলে সহজেই বুঝতে পারে, কারণ এই দুই সংস্কৃতি আদিবাসীদের চিরকেলে ঐতিহাসিক রুচি, সংস্কার ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার ও আঘাত করে। সামাজিক বিষয়ে হিন্দু যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ এবং সেই অনুপাতে দুর্বল, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু তেমনি উদার। হিন্দুর এই সাংস্কৃতিক চরিত্রের শক্তিকে ব্রিটিশ সমালোচকেরা বুঝে উঠতে পারে না। সামাজিক দিক দিয়ে হিন্দু নিজের যে দুর্বলতা ঘটিয়েছে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শক্তি অর্জন ক'রে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে। অ-হিন্দু আদিবাসীর বোঙা দেবতার শিলাবেদীকে, অ-হিন্দু আদিবাসীর ডাইন ওঝা ও দেবকলিকে, অ-হিন্দু আদিবাসীর নাচগান, উৎসবব্রতকে উচ্ছেদ করার মত উচ্চধর্মীয় আবেগ কোন হিন্দু পোষণ করে না। এ বিষয়ে খৃস্টান ও মুসলমানের মনোভাব ঠিক বিপরীত। বহু আদিবাসী গোষ্ঠী হিন্দু নাম গ্রহণ করেছে এবং হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা বিশুদ্ধ আদিবাসীই রয়ে গেছে—সেই গোষ্ঠীগত দেবতার পূজা, উৎসব ও সমাজ। তবু তারা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করে, এবং হিন্দুরাও তাদের হিন্দু মনে করে—সামাজিক সম্পর্ক হোক্ বা না হোক্। পরের সংস্কৃতিকে এইভাবে আপন বলে স্বীকার করে নেবার

এবং নিজ সমাজে স্থান দেবার উদারতাই হিন্দুর বড় শক্তি। এ শক্তি খৃস্টান বা মুসলমান সমাজের মধ্যে নেই। আদিবাসী সমাজ তাদের দীর্ঘ অতীতের ইতিহাসে দেখে এসেছে যে, সম্পূর্ণ নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে তারা অনায়াসে হিন্দু আখ্যা গ্রহণ ক'রে হিন্দু সমাজের কোন একটা স্তরে থাকতে পারে। এতে কোন বাধা নেই। হিন্দু সমাজ থেকেও কোন আপত্তি হয় না। ডাঃ হাটন, মিঃ লেসি ও মিঃ এলুইন প্রমুখ বিজ্ঞবর্গ হিন্দুর এই সাংস্কৃতিক উদারতার শক্তিকে বুঝতে পারেন না বলেই আদিবাসীদের 'শোচনীয়' হিন্দুঘেঁসা মনোভাব দেখে হায় হায় করে ওঠেন।

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এই মন্তব্য ক'রে থাকেন যে, হিন্দুধর্ম অন্যধর্মাবলম্বী মানুষকে দীক্ষা দিয়ে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে না (Non-Proselytizing Religion)। আধুনিক কালের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে উক্ত পণ্ডিতদের মন্তব্য খাটে না, কারণ সংস্কারপ্রবণ হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীকে হিন্দুত্বে দীক্ষা দিয়ে সমাজে গ্রহণ কর'তে আরম্ভ ক'রেছে। আধুনিক কালের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্, গোঁড়া হিন্দুধর্মকে আমরা যেভাবে দেখে আসছি, তার মধ্যেও পরধর্মাবলম্বীকে আত্মস্থ করার একটা প্রক্রিয়া বহুদিন থেকে চ'লে আসছে। এই প্রক্রিয়া খৃষ্টান মিশনারি বা মুসলমান মোল্লাদের আচরিত প্রথার মত নয়, এটা একটা বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় প্রথা। ডাঃ হাটনের মত হিন্দুত্ববিরোধী পণ্ডিতও সেকথা জানেন এবং জেনেশুনেই এই সত্য কথাটাকে সহ্য করতে পারেন না। কেন এবং কিভাবে বহুকাল ধরে বিরাট আদিবাসী সমাজ হিন্দুধর্মে ও সমাজের মধ্যে চলে আসছে, সেটা ডাঃ হাটনের মন্তব্যের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

"হিন্দু ধর্ম এখনো বিস্তার লাভ ক'রে চলেছে। উপজাতীয় ধর্মকে হিন্দু তার নিজের সামাজিক উৎকর্ষের গুণে আত্মস্থ ক'রে চলেছে। উপজাতীয় দেবদেবীর উপর হিন্দুরা নিজেদের দেবদেবীর নাম আরোপ করে, হিন্দু পুরোহিতেরাও এই সব নতুন দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি উদ্ভাবন ক'রে চলেছে, উপজাতীয় অহিন্দু সর্দারদের জন্য একটা ভাল জাতে সম্মানকর স্থান ক'রে দিয়ে আদিবাসীকে হিন্দুসমাজ নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। এই সব সমাজভুক্ত উপজাতীয় [illegible] জন্য

হিন্দু পুরাণের অন্তর্গত ঋষি মুনি ইত্যাদির নামে এক একটা মৌলিক গোত্র নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।" (১)

হিন্দুর সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির এই বহুরূপ ('Multiformity') যিনি বুঝতে পেরেছেন, তিনি হিন্দুত্বের প্রধান শক্তির রহস্যটুকু অনায়াসে বুঝতে পারবেন।

(১) "...it (Hindusim) still spreads at the present day, absorbi tribal religion in virtue of its social prestige and by identification local gods with its own, by an experimental resort to Hindu priests, a by the social promotion of pagan chiefs who are provided with suit mythological pedigrees."

—Hutton, Census of India, ১৯

ব্রিটিশ সমালোচকেরা দুঃখ করেছেন যে, আদিবাসীরা 'হিন্দুত্ব' গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে একটা নীচজাতরূপে স্থান লাভ করে। এ মন্তব্য কতখানি সত্য?

এ মন্তব্য মোটামুটিভাবে সত্য নয়। গন্দ কোরকু ও বৈগা প্রভৃতি কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর হিন্দুত্বপ্রাপ্ত শ্রেণীগুলির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এরা নিজেদের উন্নত বৈষয়িক অবস্থার জোরে এবং কতকটা গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রেরণায় ক্ষত্রিয় ও রাজপুতের সমান শ্রেণীমর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ছোটনাগপুরে কুর্মি মাহাতোরা একটা সম্পন্ন সমাজ এবং তারাও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে। যেসব আদিবাসী সমাজের আর্থিক অবস্থা ভাল তারা হিন্দুসমাজের মধ্যে নিম্নতম স্থান কখনই স্বীকার করে না, তারা একটা ভাল জাত হিসাবেই মর্যাদা দাবী করে এবং সেটা আদায়ও করে নেয়। শুধু তাই নয়, যেসব আদিবাসী নীচ জাতরূপে স্থানলাভ করে থাকে, তারাও মর্যাদাসম্পন্ন জাত হবার জন্য দাবী করতে ত্রুটি করে না। শ্রেণীমর্যাদা লাভ করার জন্য তারা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত কোন আশ্রয় আশ্রম বা আন্দোলনের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। পানকা নামে আদিবাসী সম্প্রদায়কে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যের স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কবীর পন্থের আশ্রয় গ্রহণ করে পানকা সম্প্রদায় স্পৃশ্য জাত হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন ছত্রিশগড়ের অস্পৃশ্য চামার সম্প্রদায় সৎনামী আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের মর্যাদা উন্নীত করেছিল। ১৮৭০ সাল থেকেই উড়িষ্যার খন্দ সমাজ নিজেদের উন্নত করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং সুরাপান বর্জনের চেষ্টা করেছে (১)। সমগ্রভাবে আদিবাসীদের একটা পরিবর্তনবিমুখ গোঁড়া সমাজ বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভুল করেন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা এঁরা করে থাকেন। নিজেদের গোষ্ঠীমর্যাদা সম্বন্ধে এঁরা খুবই সচেতন, নীচ জাত হবার আগ্রহ এঁদের মোটেই নেই। গন্দ মহাসভা একটি বড় সঙ্ঘ

(১) Descriptive Ethnology of Bengal—Dalton.

এবং রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, নিজেদের সমাজের গলদ সম্বন্ধে এই সঙ্ঘ অচেতন নয়। সঙ্ঘবদ্ধ কর্মপন্থা উদ্যোগ ও আন্দোলনের পদ্ধতিকে এঁরাও আয়ত্ত করেছেন। এঁরা হিন্দুসমাজে নীচ জাতের ঠাঁই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন এবং নিয়েও থাকেন না। ১৯৩১ সালের আগে থেকেই পশ্চিম খান্দেশের ভীল সমাজের একটি নিজস্ব সঙ্ঘ আছে এবং জনৈক ভীল সর্দার এর সভাপতি। এই সঙ্ঘ ভীলদের বিবাদ নিষ্পত্তি করে এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ভীল মনস্বী গুলা মহারাজের সামাজিক প্রগতিমূলক আন্দোলনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আন্দোলন ১৯৩৮ সালের ঘটনা। যদি ধরে নেওয়াও হয় যে, অতীতে কিছু কিছু আদিবাসী হিন্দুসমাজে এসে নীচজাতের স্থানলাভ করেছিল, তবু বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা নেই। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমতঃ, বর্তমানে আদিবাসী সমাজ তাদের আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুসমাজও অস্পৃশ্যতা বর্জন করে সমাজসাম্যের দিকে এগিয়ে চলবার প্রয়াস করছে।

বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস এক নয়। সংস্কৃতির দিক দিয়েও সকলে এক স্তরের নয়। সম্পদের দিক দিয়েও সব গোষ্ঠী সমান নয়।

পাহাড়িয়া নামে আদিবাসী সমাজ 'এক ন্যায়বান ঈশ্বরে' বিশ্বাসী, জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাসী—যারা ইহজীবনে সৎকর্ম করে তারা পরজন্মে উন্নত জীবন লাভ করবে এবং যারা অসৎ কর্ম করে তারা নীচ জীবন লাভ করবে। সাঁওতালী ধর্মমতে এক শ্রেষ্ঠ দেবতার কল্পনা করা হয়—তিনি হলেন 'ঠাকুর'। ঠাকুর কথাটি নিশ্চয় সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা নয়, হিন্দুদের থেকেই এই নাম এবং সম্ভবতঃ আইডিয়া তারা গ্রহণ করেছে। যেসব আদিবাসী হিন্দুধর্মের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত এবং প্রভাবিত হয়েছে, তাদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রসার কঠিন হয়েছে। "যেসব পাহাড়িয়া ও সাঁওতাল হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি তাদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার করা মিশনারিদের পক্ষে সহজ হয়েছে।" (১) ব্রি

(১) The Story of an Indian Upland—Bradley Birt.

র্মমতের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে মুণ্ডা ও ওঁরাও সমাজে বহু ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। আদিবাসীদের প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলনে হিন্দু ধর্মনীতির ক্রিয়া দেখা যায়। হিন্দুধর্ম বা হিন্দুর নীতিতাৎপর্যকে সম্পূর্ণ বা সমগ্রভাবে উপলব্ধি করে আদিবাসী সমাজ একটা পরিবর্তন বা নূতনকে গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে, ঠিক এই ধরণের মন্তব্য করা যায় না। হিন্দুধর্মের পূজা পদ্ধতি লোকাচার ও উৎসবের বিরাট ক্ষেত্র থেকে যে বিষয়টি মনে ধরে সেইটি গ্রহণ করতে আদিবাসীরা দ্বিধা করে না। হিন্দুত্বপ্রাপ্ত গন্দেরা হনুমান ও গণপতির পূজা করে। "বেরার থেকে বস্তার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সমস্ত আদিবাসী সমাজে ভীমসেনের পূজা প্রচলিত।.........নিজেদের দেবতা ছাড়া গন্দেরা আর একটি অদৃশ্য সৃজনকর্তা ও পালনকর্তা দেবতার কল্পনা করে, যার নাম 'ভগবান' (২)। মান্দলা জিলায় গন্দ এবং বৈগা গণেশ উৎসব, দশহারা, দীপালি এবং হোলি উৎসব পালন করে। হিন্দুত্ব-প্রাপ্ত বা হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত আদিবাসী সমাজ কর্তৃক যেসব হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান পালিত হয়, তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এইসব ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণতঃ আদিবাসীরা পানোৎসব বাদ দেয় না। নতুনকে গ্রহণ করেও তারা এই পানোৎসবের গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য ছাড়তে পারে নি, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য রকম ব্যতিক্রম দেখা যায়।

আদিবাসীদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সাধারণতঃ কিভাবে হিন্দু-নীতি গ্রহণ করে থাকে, তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

টানা ভগত আন্দোলন

ছোটনাগপুর অধিত্যকায় ওঁরাও আদিবাসী সমাজ, চরিত্র, বুদ্ধি ও তেজস্বিতায় একটি অগ্রসরশীল সমাজ। এঁরা বহু সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত এবং এঁদের

(২) Aboriginal Tribes of the Central Provinces—Hislop.

মধ্যে বহু বিখ্যাত সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজকে বহু দূষিত রীতি ও আচার থেকে মুক্ত করবার জন্য এরা আত্মশক্তির সাহায্যেই প্রয়াস করে এসেছেন। দুঃখের বিষয় নব্য ভারতের আধুনিক ভারতীয়েরা আদর্শবাদী হয়েও আদিবাসী সমাজের বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের খবর জানেন না। মদ্যপান, ডাইনতন্ত্র ও ভূতপূজা ইত্যাদি সামাজিক দোষগুলিকে দূর করবার জন্য ওঁরাও সংস্কারকেরা একের পর এক চেষ্টা করে আসছেন। এই সব সংস্কারকের দল 'ভগত' নামে আখ্যাত। প্রথম বিখ্যাত সংস্কারকের দল হলো ভুইপন্থ ভগত সমাজ। তারপর যারা আন্দোলন করেছে তারা হলো কেশ ভগত দল, বিষ্ণু ভগত দল ও কবীরপন্থ ভগত দল। সবচেয়ে বিখ্যাত হলো টানা ভগত দল। ১৯১৪ সালে যাত্রা ভগত নামে এক ওঁরাও যুবকের মুখে এক নতুন বাণী শুনে ওঁরাও সমাজ চঞ্চল হয়ে ওঠে। যাত্রা ভগত ঘোষণা করে যে, স্বপ্নের মধ্যে 'ধর্ম' তাকে কতগুলি আদেশ করে গেছে—ভূতে বিশ্বাস ছেড়ে দাও, পশুবলি করো না, মাংসাহার ও মদ্যপান বর্জন কর। যাত্রা ভগতের আবেদনে হাজার হাজার ওঁরাও সাড়া দেয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে থাকেন এবং যাত্রা ভগতকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করেন। আদিবাসী সমাজে কোন একটা সমাজ সংস্কারের আন্দোলন দেখলেই গভর্ণমেণ্ট দমন করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন, এটাই বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়।

যাত্রা ভগতকে দমিয়ে দিলেও আন্দোলন প্রসার লাভ করে। আন্দোলনের পদ্ধতি এই : সন্ধ্যার পর গ্রামের যুবকেরা দলবদ্ধ হয়, তারপর ভূত তাড়াবার জন্য মন্ত্র আবৃত্তি করতে থাকে।

মন্ত্র :—

"চন্দ্রবাবা সূর্যবাবা ধর্তি বাবা তারাগণ বাবা
নাচন কে জগহ কৌন হৈ, কৌন হৈ, কৌন হৈ"

এইভাবে মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে তারা অগ্রসর হয়, কোথায় ভূত আশ্রয় নিয়ে রয়েছে সেই জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। লক্ষণ দেখে যে জায়গায় ভূত আছে বলে সন্দেহ হয় সেইখানে এসে সকলে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ায়। শুধু উত্তর দিকে একটু ফাঁক থাকে। তারপর হাতজোড় করে গানের সুরে আবৃত্তি করে:

"টানা বাবা টান, ভূতনীকে টান
টানা বাবা টান, লুকল ছিপল
ভূতনীকে টান" ইত্যাদি।

ভূত তাড়াবার এই আন্দোলনে ব্রিটিশ-ভারত গভর্ণমেণ্ট অস্থির হয়ে উঠলেন, এবং বহুলোককে গ্রেপ্তার করলেন। কিন্তু তবু আন্দোলন চলতে থাকে।

টানা ভগত আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়টির পরিচয় মাত্র দেওয়া হলো। টানা ভগতেরা আদিবাসী সমাজে আরও বৃহৎ একটি আন্দোলন করেছে এবং সেজন্য ত্যাগ দুঃখ নির্যাতন বরণ করেছে। এবিষয় অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সনাতন গন্দি

গন্দ সমাজে ১৯৩৬ সালে বাদলশা ভাই নামে জনৈক সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। 'সনাতন গন্দি' নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করে বাদলশা ভাই গন্দ সমাজে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। মিঃ এলুইন লিখেছেন, সনাতন গন্দি আন্দোলনের নির্দেশ হলো—"বানর হত্যা করো না, কারণ তারা দেবতার সহচর, সত্যনারায়ণের ব্রত কর এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখ, বৈদিক প্রথায় বিবাহ অনুষ্ঠান কর। গো ব্রাহ্মণে ও সাধুকে সেবা করলে শ্রেষ্ঠ পুণ্য লাভ হয়। কলিযুগে মেয়েদের বিশ্বাস করো না, মেয়েদের মধ্যে যারা একবার গৃহত্যাগ করবে তাদের আর ঘরে ফিরিয়ে নিও না।" (১)

মিঃ এলুইন এই সংস্কার আন্দোলনের যে পরিচয় দিয়েছেন সেটা সত্য নয়। হিন্দুনীতি অনুসারে আন্দোলন হয়েছে ঠিকই, এবং মিঃ এলুইন বোধ হয় এই

(১) The Baiga—Verrier Elwin.

কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে সমস্ত আন্দোলনটাকে একটা কদর্য কুসংস্কারমূলক প্রগতিহীন আন্দোলন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সংস্কারক বাদলশা তাই প্রধানতঃ শিক্ষা বিস্তারের জন্য, নারীর সম্মানের জন্য এবং মদ্যপান বর্জনের জন্যই এ আন্দোলন করেছিলেন। মিঃ এলুইন তাঁর গ্রন্থে সেসব কথা উহ্য রেখেছেন। মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি, তিনি আন্দোলনের দোষটুকু খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তিনি আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও প্রেরণাগুলি উপলব্ধি করতে পারেন নি। আপাতদৃষ্ট যে ঘটনাগুলি তাঁর খারাপ লেগেছে শুধু সেইগুলিকে মূলধন করে তিনি সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিন্দের ব্যবসা করেছেন।

আদিবাসীদের সামাজিক আন্দোলনের স্বরূপ থেকে আমরা একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাই—সমস্ত আন্দোলনে হিন্দু রীতিনীতির প্রাধান্য, তারমধ্যে কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ। এই ইঙ্গিতের অর্থই এই যে, হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে একটা সহজ আবেদন আছে যা আদিবাসীদের নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে।

ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে আদিবাসী

বিদ্রোহিণী নাগা রাণী গুইদালোর কীর্তি কাহিনী সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ কিছু কিছু খবর রাখে। আসাম ভ্রমণের সময় পণ্ডিত নেহরু এই নাগা মহিলার কথা জানতে পারেন এবং এক প্রবন্ধে সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। যেহেতু আধুনিক ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত, সেই হেতু গুইদালোর ব্রিটিশবিরোধী অভ্যুত্থানের সংবাদ স্বভাবত ভারতবাসীর মনে সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু শিক্ষিত ভারতবাসী আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে খোঁজ খবর করলে আরও বহু আদিবাসী বীর ও শহীদের কথা জানতে পারবেন। দুঃখের বিষয়, সেরকম উৎসাহের লক্ষণ বড় বেশী দেখা যায় না। আদিবাসীদের রাজনৈতিক তথা ব্রটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও আলোচনা ভারতীয় সমাজে সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার যুদ্ধে আদিবাসীর শোণিততর্পণ বহু পার্বত্য উপত্যকায় ও অরণ্যভূমিতে বহু পবিত্র হল্‌দিঘাট রচনা করেছে। সে কাহিনী আজও নিরালা বনমর্মরের মত নাগরিক ভারতীয়ের কাছ থেকে দূরেই রয়ে গেছে।

ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ভারতে কয়েকটি দেশীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। মারাঠা, শিখ এবং হায়দার-টিপুই ব্রিটিশ-বিরোধিতার সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইতিহাসে এই কাহিনী বড় করে লেখা আছে। কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতে প্রথম গণসংগ্রামের দৃষ্টান্ত হলো আদিবাসীদের সংগ্রাম। কোন আদিবাসী রাজশক্তির সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তির লড়াই হয় নি, কারণ আদিবাসী রাজশক্তি বলে কিছু ছিল না। সিপাহী অভ্যুত্থানের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে গণসংগ্রামের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকারের গণসংগ্রাম একমাত্র এবং প্রথম আদিবাসীরাই করেছে, সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে এবং পরেও। আদিবাসী-দের এই সব সংগ্রামকে অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিকও নিতান্ত 'জংলী বিক্ষোভ' ধারণা করে একটা আলোচনার যোগ্য বিষয় বলেই মনে করতে পারেন নি। কিন্তু

অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, আদিবাসীদের সংগ্রামে সভ্য ভারতবর্ষের সংগ্রামের মতই দেশপ্রেমের এবং গোষ্ঠীপ্রেমের প্রেরণা ছিল।

একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সত্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন মনে করি। ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সহযোগিতা করেছে। বৃটিশেরা ভারতীয়দের মধ্যে বহু তাঁবেদার রাজশক্তি পেয়েছে, ভাড়াটিয়া ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যেই ব্রিটিশ বহু ভারতীয় রাজ্য গ্রাস করতে পেরেছে। ভারতবাসী তার প্রাক্তন ইতিহাসের এই অখ্যাতি চাপা দিতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তি আদিবাসী সমাজ থেকে ভাড়াটিয়া সৈনিক সংগ্রহ করতে পারে নি, কারণ আদিবাসীদের পক্ষে ভাড়াটিয়া মনোবৃত্তি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আদিবাসীদের এমন একটা সহজ বিদ্রোহীসুলভ দাসত্ববিরোধী চরিত্র ছিল যার জন্যে ইংরাজ সেনাপতির দল এদের মধ্যে রংরুট সংগ্রহে উৎসাহ বোধ করেন নি। তার ওপর আদিবাসীরা তাদের গোষ্ঠী ও মেজাজের পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ভাল করেই জানিয়ে দিয়েছিল।

আদিবাসীদের সংগ্রাম—খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মত। নিজেদের প্রেরণায় নিজেদের ঐক্যে ও উদ্যোগে পরিচালিত সংগ্রাম। সভ্য ভারতবর্ষের কাছ থেকে এ সংগ্রামে আদিবাসীরা কোন সহায়তা লাভ করেনি বরং তার উল্টোটাই সত্য। আদিবাসীদের সংগ্রাম দমনে ভারতীয় সিপাহী অস্ত্রচালনা করেছে এবং ভারতীয় দারোগা তশীলদার ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার স্তম্ভরূপে আদিবাসী অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছে। ইংরাজ আমলে আদিবাসীদের মনে যতটুকু ভারতীয়-বিরোধী তথা হিন্দু-বিরোধী ক্ষোভ প্রবল হয়েছে, তার মূল কারণ এইখানে। হিন্দুরা বৃটিশের প্রজা হয়ে এবং বৃটিশ শাসনব্যবস্থার দ্বারাই পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠা কায়েম করার জন্য আদিবাসীদের আরণ্য ভূমিতে জমিদার, মহাজন ও বেনিয়ারূপে দেখা দেয়। ব্রিটিশ শোষণযন্ত্ররূপে হিন্দুরা আদিবাসীদের কাছে এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব স্বভাবত হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের রূপে দেখা দিয়েছিল এবং তার জের আজও রয়ে গেছে।

কোল বিদ্রোহ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলার রাজা হয়ে বসবার পর বাঙলা ও বিহারের আদিবাসী অঞ্চলে ব্রিটিশ (কোম্পানী) আইন, ভূমিকর ও রাজস্ব প্রথার প্রবর্তন হতে থাকে। এই বৈদেশিক পদ্ধতি আদিবাসীদের চিরাচরিত আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার ওপর আঘাতের মত এসে পড়ে। ব্রিটিশ শাসকের আমলারূপে এবং ব্রিটিশ স্বার্থের ফড়িয়ারূপে হিন্দুরা আদিবাসীদের মধ্যে উপদ্রবের মত দেখা দেয়। ব্রিটিশ শক্তির পত্তনের পরেও সমতলবাসী হিন্দুরা পাহাড়ী আদিবাসীদের কাছে ঘেঁসতে পারতো না। কিন্তু না ঘেঁসতে পারলে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কায়েম থাকে না, সুতরাং ব্রিটিশ রাজশক্তি বার বার অস্ত্রের সাহায্যে আদিবাসীদের ঘায়েল করে হিন্দুদের জন্য আদিবাসী অঞ্চলের পথ খুলে দিয়েছে এবং তারপর হিন্দুরা গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে।

আদিবাসীদের সম্পর্কে অতীত ব্রিটিশ নীতি এবং বর্তমান ব্রিটিশ নীতির আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একদিন সাম্রাজ্যিক স্বার্থের খাতিরে আদিবাসীদের নিভৃত আরণ্য এলাকায় সমতলবাসী হিন্দুকে গরজ করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আর আজ এক একটা বহির্ভূত অঞ্চল (Excluded Area) সৃষ্টি করে হিন্দুদের কাছ থেকে আদিবাসীকে পৃথক করে রাখবার চেষ্টা, কারণ আজ হিন্দু আর নিতান্ত ব্রিটিশের আমলা নয়, হিন্দু ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠক ও প্রচারক, সম্রাটদ্রোহী।

সিংভূমের কোলহান নামে অঞ্চলটি হো-অধ্যুষিত। হো সমাজের অপর নাম লড়কা কোল অর্থাৎ লড়ুয়ে কোল। কোলেরা আজ পর্যন্ত কোলহানে হিন্দুদের খুব সামান্য রকমই ঘেঁসতে দিয়েছে। শুধু হিন্দু নয়, হো ভিন্ন অন্য কোন আদিবাসী গোষ্ঠীকেও এই অঞ্চলে তারা প্রশ্রয় দেয় নি। জগন্নাথ দর্শনাভিলাষী হিন্দু তীর্থযাত্রীরা কোলহানের পথ দিয়ে পুরী যেত, হো'রা তাও বন্ধ করে দেয়।

১৮১৯ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোলহানের হো'দের দমন করবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু এই অভিযানের পরেও হো'রা সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার

করে নি। ১৮৩১ সালে সমস্ত ছোটনাগপুরে আদিবাসী সমাজে বিদ্রোহের ঝড় জেগে উঠে—এই অভ্যুত্থান কোল বিদ্রোহ নামে আখ্যাত। কোলহানের হো সমাজও এই বিদ্রোহে যোগদান করে। তীরধনু ও কুঠারে সজ্জিত আদিবাসী বিদ্রোহীর সংগ্রাম ব্রিটিশের উন্নত অস্ত্রের কাছে পরাজয় মানতে বাধ্য হয়। ছোটনাগপুরের অজস্র পাষাণবেদিকা সহস্র আদিবাসী শহীদের শোণিতে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

রাজমহলের বিদ্রোহী পাহাড়িয়া

ব্রিটিশ রাজত্বের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে রাজমহলের পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সমতলবাসী জমিদারদের নানারকম বিরোধ দেখা দিতে থাকে। পাহাড়িয়ারা মাঝে মাঝে পাহাড় অঞ্চল থেকে নেমে এসে আবাদী অঞ্চলের হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে যেত। হিন্দু জমিদারেরা নানারকম ঘুষ বকসিস ও দক্ষিণা দিয়েও পাহাড়িয়াদের আক্রমণ বন্ধ করতে পারে নি। এর পর হিন্দু জমিদারেরা কৌশল করে একদল পাহাড়িয়াকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে সকলকে হত্যা করে। পাহাড়িয়ারা প্রতিশোধ নেবার জন্য ভয়ানকভাবে তৈরী হয়। এটা ১৭৭২ সালের ঘটনা। জমিদারদের ওপর প্রতিশোধ চরিতার্থ করা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনী জমিদারদের সাহায্যে এসে পৌঁছে যায় এবং পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হয়। এই সঙ্ঘর্ষে ব্রিটিশ সৈন্য ব্যর্থ হয় এবং পাহাড়িয়ারা ১৭৭৮ সাল পর্যন্ত তাদের যথেচ্ছা লুণ্ঠন ও আক্রমণের পালা চালাতে থাকে। এর পর ব্রিটিশ ফৌজের কর্তা পাহাড়িয়াদের শান্ত করার জন্য অন্যরকম পদ্ধতি অবলম্বন করে। পাহাড়িয়াদের জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা এবং গোষ্ঠীপতি সর্দারদের দ্বারা পঞ্চায়েৎ শাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

১৮৩৬ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সাঁওতালদের স্থায়ীভাবে বসতি করাবার জন্য বিশেষভাবে একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে। এই এলাকা বর্তমান সাঁওতাল পরগণারই একটি প্রধান অংশ এবং তৎকালে এই অঞ্চল 'দামনি কো' নামে পরিচিত ছিল। এটা সাঁওতালী ভাষা, অর্থ পাহাড়ী পরিষদ (Hill Assembly)। এই অঞ্চলের

জন্য সাঁওতাল গোষ্ঠী-পঞ্চায়েতের সাহায্যে একটা বিশেষ রকম শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল। দামনি কো সাঁওতাল চাষীর পরিশ্রমের গুণে শস্যের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বৃটিশ-প্রবর্তিত নূতন অর্থনৈতিক পন্থা ও শাসন-ব্যবস্থার অপরিহার্য পরিণাম অনুসারে এই অঞ্চলে হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটে। মুদ্রা জিনিসটার রীতিনীতি ও চরিত্র সাঁওতালী মনের কাছে তখনও সম্পূর্ণ তাৎপর্য নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। দাদন বন্ধক নিলাম ঠিকা মজুরী ও সুদ তেজারতির জটিল অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পড়ে সাঁওতাল চাষীর শস্য ও জমি ধীরে ধীরে পরহস্তগত হতে আরম্ভ করে। মহাজনী কারবারের লেনদেনের পরিণাম প্রথম তারা বুঝে উঠতে পারে নি, কিন্তু একদিন বুঝলো। একদিন দেখা গেল, তাদের সর্বস্ব পরের দখলে চলে গেছে। সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় রেলপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় এবং সাঁওতালেরা মহাজনদের কাছে দাদন-নেওয়া ঠিকা মজুর হিসাবে বাঁধা হয়ে থাকায়, রেলপথ তৈয়ারীর কাজে নগদ মজুরী অর্জনটুকুও ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৫৫ সালে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। সমস্ত সাঁওতাল একসঙ্গে বিদ্রোহ করে, ঘৃণ্য দিকু অর্থাৎ বিদেশীর যে কোন চিহ্ন লোপাট করে দেবার জন্য দিকে দিকে আক্রমণ করে। শুধু হিন্দুকে হত্যা নয়, কুঠিওয়ালা ও প্ল্যাণ্টার ইংরাজ নরনারীকেও হত্যা করা হ'তে থাকে। এর পর বৃটিশ ফৌজ আসে। ধনুর্ধর সাঁওতাল যোদ্ধার দল কামান ও রাইফেলের অগ্নিবর্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়। এই সঙ্ঘর্ষে ১০ হাজার সাঁওতাল নিহত হয়।

বিরসা ভগবান

শিক্ষিত ভারতবাসী বিরসা ভগবানকে খুব বেশী চেনে না। মুণ্ডা সমাজে ইনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং এঁর জীবন ও সাধনার প্রেরণা মুণ্ডা সমাজের মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার চির উৎসরূপে জাগ্রত রয়েছে। সুখের বিষয়, কয়েক বৎসর আগে পালামৌ ও রাঁচী কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে কয়েকবার 'বিরসা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়েছিল। আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের মন যে বিরসা ভগবানের মত এক অদ্ভুতকর্মা মুণ্ডা মনস্বীর সাধনার মূল্য আজ উপলব্ধি করতে

পেরেছে, কতিপয় কংগ্রেসকর্মীর উদ্যোগের মধ্যে তার কিছুটা প্রমাণ তবু পাওয়া গেল। ছোটনাগপুরের প্রতি থানায় পুলিশের খাতায় 'বিরসাইট্' (Birsaite) আখ্যায় চিহ্নিত শত শত আদিবাসীর নামের তালিকা আছে। এরা বিরসা-পন্থী, সুতরাং ভয়ানক সন্দেহভাজন, সর্বদা পুলিশের নজর তাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক হয়ে রয়েছে। আধুনিক ভারতীয়েরা জানেন, তাঁদের সমাজের রাজনৈতিক সাধনাব্রত কত যুবক রাজরোষে পড়ে বিনা বিচারে বন্দীত্ব গ্রহণ করেছে, পুলিশের সদাসতর্ক খবরদারীর উপদ্রবে বিড়ম্বিত জীবন যাপন করেছে। দেশের কাজের জন্য ভারতের যুবক এই নির্যাতন সহ্য করেছে এবং দেশবাসী যুবক-ভারতের এই ত্যাগের দৃষ্টান্তকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। রাজরোষের মাত্রাহীন নিগ্রহ থেকে, অন্তরীণতা বা বন্দিদশা থেকে রাজনৈতিক কর্মীকে মুক্ত করার জন্য দেশব্যাপী জনমতের আন্দোলনও হয়ে থাকে। এইবার আদিবাসীদের প্রসঙ্গে আসা যাক্। বিশেষ স্মরণীয় সত্য এই যে, কংগ্রেসী গণ-আন্দোলন কিম্বা গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাতের বহু পূর্ব থেকেই হাজার হাজার বিরসাপন্থী মুণ্ডা রাজরোষে নিগৃহীত হয়ে আসছে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে ভারতের জনমতে কোন প্রতিবাদের উচ্চবাচ্য হয় নি।

কে এই বিরসা ভগবান? ১৮৭৪ সালে রাঁচীর এক মুণ্ডা আদিবাসী পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এর আগে ১৭৮৯ সালে, ১৭৯৯ সালে, ১৮০৭ সালে ১৮১২ সালে, ১৮১৯ সালে এবং ১৮৩১ সালে মুণ্ডারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল ১৮৩১ সালের বিদ্রোহই বিখ্যাত 'কোল বিদ্রোহ'। এর পর মুণ্ডা সমাজে কতকটা শান্ত অবসাদের অধ্যায় আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৬ সালে খৃস্টান মিশনারীরা এসে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করে মুণ্ডাদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের ওপর রাজভক্তির প্রলেপ দিতে থাকেন। বিরসা মুণ্ডা ছেলেবেলায় মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং সামান্য ইংরাজীও তিনি শিখেছিলেন। তিনি জার্মান লুথেরীয় মিশনের দ্বারা দীক্ষিত খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু স্কুলে শেখানো আইনসম্মত সুবাধ্য জীবনের আদর্শ বোধ হয় কিশোর বিরসার মনে কোন রেখাপাত করতে পারে নি। মুণ্ডা সমাজের

দুঃখদীর্ণ অবস্থা, ইংরাজ শাসনের অবমাননাকর বন্ধন, বির্‌সার মনে বেদনার জ্বালা সৃষ্টি করে। খৃস্টান মিশনারি ও গির্জার চূড়া, থানা আদালত ও কাছারী, জমিদার এবং মহাজনের গদি—এসব কি মুণ্ডাসমাজের পক্ষে কল্যাণের লক্ষণ? বির্‌সা মুণ্ডার মনে ঘোর সন্দেহ জাগে।

রাঁচী থেকে একদিন বির্‌সা মুণ্ডা তার নিভৃত উপত্যকার কুটীরে ফিরে যায়। তারপর একদিন পল্লী জনতাকে সম্বোধন করে বির্‌সা তার বাণী ঘোষণা করে, স্বপ্নে আমি প্রত্যাদেশ পেয়েছি। মুণ্ডাসমাজকে উন্নত হতে হবে। তার জন্যে প্রস্তুত হও।

বির্‌সা তার গোষ্ঠী জনতার কাছে এক নতুন কর্মপন্থা উপস্থিত করে—মদ্যপান বর্জন, নিরামিষ গ্রহণ, উপবীত ধারণ ইত্যাদি। এই সামাজিক সংস্কার আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গভর্ণমেণ্টও সতর্ক হয়ে ওঠেন। গভর্ণমেণ্টের দমননীতির সঙ্গে আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে ক্রমেই পূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। বির্‌সার নির্দেশে মুণ্ডাসমাজ খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করে। ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম খাজনা বন্ধ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। মুণ্ডাদের সঙ্গে পুলিশের কতগুলি সংঘর্ষও হয়। তার পর বির্‌সাকে গ্রেপ্তার করে রাঁচী জেলে এনে রাখা হয়। সেই রাত্রে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং অকস্মাৎ রাঁচী জেলের প্রাচীর ধ্বসে পড়ে যায়। বির্‌সাকে তারপর হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেই ১৯০২ সালে বন্দিদশায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মুণ্ডা জননায়কের মৃত্যু হয়।

বির্‌সার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত মুণ্ডা সমাজের বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা সড়ক পুল টেলিগ্রাফের তার থানা তশীলদারী অফিস প্রভৃতি সরকারী সংস্থাগুলির ওপর আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ সৈন্যদল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় এবং বিদ্রোহের অবসান ঘটে। কিন্তু মুণ্ডাসমাজে বির্‌সা মুণ্ডা বির্‌সা ভগবান নামেই অমর হয়ে রইলেন। তাঁর আদর্শ আজও মুণ্ডার বনময় সংসারে সৌরভের মত ছড়িয়ে আছে। বির্‌সাপন্থীরা আজও ইংরাজ সরকারের

সন্দেহভাজন। তারা চাকরী পায় না, তাদের নাম দাগীর খাতায় চিহ্নিত, তাদের, সময়ে অসময়ে থানায় হাজিরা দিতে হয়।

একজন ইংরাজ মিশনারি লিখেছেন—বির্সা মুণ্ডার মুখের গড়নের সঙ্গে যীশু খৃষ্টের মুখের গড়নের সাদৃশ্য ছিল। বিদ্রোহী বির্সার ব্যক্তিত্বের প্রতি কোন কোন মিশনারী কিরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এসব উক্তি তারই প্রমাণ।

বির্সা ভগবান প্রবর্তিত আন্দোলনের একটা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যদি বলা হয় যে, বির্সা ভগবান আধুনিক মহাত্মা গান্ধীর পূর্বরূপ (Proto-type) তাহলে যুক্তির দিক দিয়ে অত্যুক্তি হবে না। আমরা দেখেছি, গান্ধীজী রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা নীতিগত স্তরের মধ্যে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছেন, এর মধ্যে সর্বপ্রধান নীতি হলো—অহিংসা। বির্সা ভগবান মুণ্ডা-সমাজকে প্রথমে অহিংসা নীতির দ্বারাই একটা আদর্শসম্মত সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্যে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। ধনুক ও কুঠারবিলাসী শিকারপ্রিয় আমিষাশী মুণ্ডা সমাজের সম্মুখে তিনি কঠিন অহিংসার আদর্শ রেখেছিলেন। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের তিনিই প্রথম প্রবর্তক। অহিংস সংগ্রামের এই একটি পদ্ধতিকে বির্সা ভগবান আবিষ্কার করেছিলেন।

তারপর, বিরসা আন্দোলনের চরম পরিণাম যেভাবে দেখা দিয়েছিল, সেটা যেন ভারতের আগস্ট সংগ্রামের পূর্বরূপ। আগস্ট সংগ্রামে ভারতীয় জনতা যেভাবে থানা কাছারী আদালত রেলপথ সড়ক ও টেলিগ্রাফের তার প্রভৃতি সংযোগব্যবস্থার (communications) উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, পঞ্চাশ বছর পূর্বে মুণ্ডাসমাজ সেই গণসংগ্রামমূলক পদ্ধতির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছে। আধুনিক কালে রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের (Political Suspect) ওপর যে রীতিতে সরকারী বিধিনিষেধের খবরদারী করা হয়ে থাকে, তার পরীক্ষা বির্সাপন্থী মুণ্ডাসমাজের ওপর প্রথম হয়েছে। অনেককাল আগেই হয়েছে এবং হয়ে আসছে। বির্সা আন্দোলনে সম্পূর্ণ অহিংসার আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে নি, যেমন ভারতের জাতীয় সংগ্রামেও মাঝে মাঝে অহিংসা নীতির বিচ্যুতি ঘটেছে।

জাতীয় সংগ্রামে আদিবাসী

এপর্যন্ত আদিবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্রোহ অভ্যুত্থান ও সংগ্রামের কিছু পরিচয় দেওয়া হলো। আদিবাসীদের এইসব সংগ্রামে তারা কখনো কোন ভারতীয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা পায় নি, বরং বিরোধিতা পেয়েছে।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব লাভ করার পর কংগ্রেস ভারতে কয়েকটি জাতীয় সংগ্রামের উদ্যোগ সূচনা ও পরিচালনা করেছে। একথা সত্য যে ভারতের এই জাতীয় সংগ্রামে আদিবাসীদের কিছু কিছু অংশ নিরপেক্ষভাবেই দূরে থেকেছে। কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের সাড়া ও আবেদন অনেকেই আবার উপেক্ষা করতে পারে নি। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং আগস্ট সংগ্রাম—প্রত্যেকটি সংগ্রামে আদিবাসীরাও অংশ গ্রহণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদীর কূটনীতির কৌশলে আদিবাসী সমাজকে জাতীয়তার ছোঁয়াচ থেকে দূরে রাখার বহু চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও, আদিবাসীরা তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয় নি। জাতীয় সংগ্রামে আদিবাসীদের সহযোগিতা নিশ্চয় এই সত্য প্রমাণ করে যে, আধুনিক আদিবাসীর চিন্তা আর নিতান্ত গোষ্ঠীপ্রীতির পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জাতিপ্রীতির বৃহত্তর সংস্কার ও চেতনা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। আদিবাসীদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এটা প্রথম এবং সম্পূর্ণ একটা নতুন সংস্কার। শিক্ষায় ও সম্পদে অনগ্রসর বলে এবং জাতীয়বাদীদের তরফ থেকে যথোচিত আহ্বানের অভাবের ফলে হয়তো অনেক আদিবাসীর মনে জাতিবোধ এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মনটা যে সর্বভারতের সমাজের সঙ্গে জাতিত্ব লাভ করার জন্য তৈরী, তার প্রমাণ তারা দিয়েছে।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রথম রাঁচীতে আসেন। হাজার হাজার 'টানা ভগত' আদিবাসী দূর দুর্গম গিরি উপত্যকার পল্লী থেকে অহিংস মহাপুরুষের দর্শনের জন্য উপস্থিত হয়। গান্ধীজীর বাণীর তাৎপর্য বুঝতে তাদের একটুও দেরী হয় নি, কারণ যাত্রা ভগতের আদর্শে তাদের মন আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। গান্ধীবাণী শোনার পর টানা ভগতেরা আরও নৈষ্ঠিক অহিংস হয়ে

ওঠে। চরকার সুতো ও হাতে বোনা খদ্দর ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র এরা আজও পরে না। অসহযোগ আন্দোলনে হাজার হাজার টানা ভগত আদিবাসী কারাবরণ করে। এদের শাস্তির মেয়াদও অন্যের তুলনায় দীর্ঘতর হয়েছিল। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে টানা ভগত আদিবাসীরা চৌকীদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে। গভর্ণমেণ্ট হাজার হাজার টানা ভগতের জমি ও অস্থাবর নিলামে চড়িয়ে দেয়, তবু এদের সংগ্রামী উৎসাহ নিষ্প্রভ হয় নি।

হাজারিবাগের গুমিয়া থানা ও পরেশনাথ পাহাড় এলাকায় সাঁওতালদের মধ্যে অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন খুব প্রসার লাভ করে। বহু সত্যাগ্রহে সাঁওতালেরা কারাবরণ করে।

ভীলেরা এবং মধ্যপ্রদেশের গন্দ সমাজও জাতীয় সংগ্রামে সত্যাগ্রহে ও আন্দোলনে যোগদান করে। নাগপুরের 'পতাকা সত্যাগ্রহে' বহু আদিবাসী যোগ দিয়েছিল। বিশেষ করে 'জঙ্গল আইন অমান্য' সত্যাগ্রহে আদিবাসীরা প্রবল উৎসাহে যোগদান করে। ইংরেজের আইন তাদের চিরকালের আপন জঙ্গলকে পর করে দিয়েছে, আদিবাসীদের মনে এটা দুঃসহ ক্ষোভ। ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের সাড়া কিছু না কিছু উদ্যম সঞ্চার করেছিল।

১৯৪২'এর আগস্ট সংগ্রামে

আগস্ট সংগ্রামেও আদিবাসী সমাজ পিছিয়ে থাকে নি। একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে আগস্ট সংগ্রামে সাঁওতাল পরগণায় আদিবাসীদের উদ্যোগ ও আত্মদানের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ধৃত করা হলো।

"সাঁওতাল পরগণার দামনিকো এলাকায় খুব জবরদস্ত রকমের আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন সত্যাগ্রহের সাধক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পট্টনায়ক।

"দামনি কো এলাকাকে চলতি কথায় সংক্ষেপে দামনি বলা হয়। সাঁওতাল পরগণার এই অরণ্যময় অংশে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরাই সংখ্যাধিক। এবং

গভর্ণমেণ্ট এই অঞ্চলের চারিদিকে তালগাছের বৃত্ত রচনা করে যেন অঞ্চলটিকে পৃথক করে রেখেছেন।

"চারটি দামিন আছে—দুমকা, গোড্ডা, রাজমহল ও পাকুড় মহকুমায় এই চারটি দামিন অঞ্চল ছড়িয়ে আছে। দামিন এলাকার ভিতর প্রতি তিন মাইল অন্তর এক একটি 'বাংলো' আছে। প্রত্যেক বাংলো এক একজন পরগণাইতের অধীনে। পরগণাইতের ক্ষমতা আইন অনুসারে দারোগার সমান, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পরগণাইত মশাই প্রায় রাজাগিরি করে থাকেন। এই বাংলোগুলিই দামিন এলাকার থানা। বাংলোগুলি একাধারে কাছারী ও অফিসার প্রভুবর্গের থাকবার জায়গা। আদিবাসীদের উপর এই বাংলোগুলি একটা দানবীয় আতঙ্কের প্রতীকের মত। এই এলাকায় অদ্যাবধি গভর্ণরের খাস শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, অর্থাৎ গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা এখানে এখনো চালু করা হয় নি। দামিন এলাকার ক্ষেত্রফল ১৩৩৩৮ বর্গমাইল।

"পট্টনায়কের দল দামিন এলাকার শাসনক্ষমতা দখল করবার জন্য এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। 'বাংলো'গুলি দখল করে নিয়ে পরগণাইত-চালিত প্রত্যক্ষ সরকারী শাসনব্যবস্থা থেকে প্রজাদের মুক্ত করে দিয়ে কংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পট্টনায়ক এবিষয়ে লিখেছেন—প্রথমে পোড়েরা এবং পরে আমড়াপাড়াকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল পাহাড়িয়া সেবাসংঘ সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের মধ্যে গত দেড় বছর ধরে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করে আসছিলেন। এদের পেটভাতের প্রধান সমস্যাটি যে কি তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। এই জন্যই এই অঞ্চলে আন্দোলন আরম্ভ করার আগে আমরা এই কথাই ভাবছিলাম—এখানে ঠিক কোন্ পদ্ধতিতে এবং কি ধরণের আন্দোলন করা উচিত। জঙ্গল সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলে ভালরকম সাড়া পাওয়া যাবে, এটা আমরা জানতাম। সরকারী জঙ্গলে কুরবা করা অর্থাৎ গাছপালা উচ্ছেদ করে সেখানে ক্ষেত আবাদ আরম্ভ করে দেওয়া সত্যাগ্রহের একটা পদ্ধতি হতে পারে। সরকারী কাছারীগুলি দখল করে নেবার কথা আলোচনা করা হয়।

"ব্যাপক জঙ্গল সত্যাগ্রহ সহজ ও সম্ভব ছিল। শুধু এবিষয়ে একটি হুকুমনামা বা নির্দেশ ব্যাপকভাবে চারদিকে প্রচার করে দিলেই হলো। কিন্তু সব ব্যাপারে ব্যাপক সংগঠনের প্রয়োজনও ছিল। আমড়াপাড়া পৌঁছে আমি সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের মধ্যে কাজ করবার জন্য মহকুমার প্রধান প্রধান সর্দারকে আহ্বান করি। এর আগে দু'তিন মাস ধরে 'কুরবা' বা পাহাড়ী ক্ষেত আবাদ করা ব্যাপার নিয়ে নানা হাঙ্গামার দায়ে আমাদের সংঘের কাছে শত শত দরখাস্ত এসে পৌঁছেছিল। আমরা এই সব হাঙ্গামার বিষয় বিচার করে দেখছিলাম। সরকারী জঙ্গলের অফিসার আর পুলিসের আচরণের ফলেই এই গণ্ডগোলটা চারদিকে পেকে উঠেছিল। পাহাড়িয়াদের পক্ষে এবং আমাদেরও পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি ও শ্রীসত্যকালী ভট্টাচার্য দু'এক জায়গায় গিয়ে গণ্ডগোল মিটিয়ে দিই এবং সাঁওতাল পাহাড়িয়াদের অধিকার রক্ষা করতে সমর্থ হই। এই জন্যেই আমাদের ওপর পাহাড়িয়াদের খুব আস্থা ছিল। এই কারণে আমরা কুরবা প্রশ্ন নিয়েই আন্দোলন আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

"এ ছাড়া সাঁওতাল এবং পাহাড়িয়া কর্মীদের আমরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি। কর্মীরা তাদের 'হরিজন সেবক' এবং 'সর্বোদয়' পড়ে শোনাতো এবং এই স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে নিজ নিজ আহুতি দেবার জন্যও প্রেরণা দিত। এর পর একটা নির্দিষ্ট স্থানে যত অধিকসংখ্যক সম্ভব এক জনতার সমাবেশ করার জন্য আমরা কর্মীদের চারিদিকে প্রেরণ করি। আমরা তাদের বলে দিয়েছিলাম যে—আন্দোলন পরিচালনার জন্য টাকার প্রয়োজন, অথচ আমাদের টাকা নেই। এর প্রত্যুত্তরে আদিবাসী কর্মীরা আমাদের যা বলেছিলেন, তাতেই আমাদের যথেষ্ট ভরসা ও নিশ্চিন্ততা হয়। কর্মীরা আমাদের নিরাশ মনে আশা ভরে দিয়ে বলে—'বাবু, আমরা আমাদের অধিকার রক্ষার জন্যে ঘাসপাতা খেয়েই লড়াই করবো। আমাদের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না। বরং আমাদেরই দুশ্চিন্তা, কি করে

এই জঙ্গলে আমরা আপনাদের খাওয়াতে পারি।' আমাদের পক্ষে এইটুকু কথাই যথেষ্ট ছিল।

"আমি আর শ্রী কে গোপালন্ দু'জনে মিলে এই হুকুমনামা বা নির্দেশ রচনা করেছিলাম। উক্ত নির্দেশ-পত্রে বলা হয়েছিল—সরকারী জঙ্গল কেটে ক্ষেত-আবাদ করা হবে, ঋণ মকুব করা হবে, জঙ্গলের জন্য টিকিট জারী বন্ধ হবে ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও বলা হয়েছিল, প্রত্যেক সরকারী কাছারী কংগ্রেসের তরফে দখল করা হবে। চৌকীদার থেকে শুরু করে পরগণাইত এবং ফরেস্টার ও রেঞ্জার ইত্যাদি সকলকে কংগ্রেসের সরকার খারিজ করে দিয়েছে, কেউ যেন আর তাদের না মানে।

"সমস্ত হিন্দুস্থান যখন জেগে উঠেছে, তখন হিন্দুস্থানের জঙ্গলই বা কেন ঘুমিয়ে থাকবে? আমরা আন্দোলন আরম্ভের জন্য তৈরী হলাম। শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে সরিয়ে রাখা এবং সরকারী ইমারত ধ্বংস করে দেওয়া—এই দু'টি কার্যক্রমকেও আমরা অহিংসাসম্মত বলেই ধরে নিয়েছিলাম। ২১শে আগস্ট সকাল বেলায় আদিবাসী মেয়েদের সভা হলো। প্রত্যেক মেয়ে পবিত্রভাবে নববস্ত্র পরিধান করে এসেছিল। এক পয়সা বা এক আনা যার যা সাধ্য, চাঁদা নিয়ে এসেছিল। প্রতি ঘর থেকে এক একজন পুরুষকে আন্দোলনের জন্য উৎসর্গ করতে মেয়েরা রাজী হয়। মেয়েরা সভায় সিদ্ধান্ত করে যে, যতদিন পুরুষেরা সংগ্রামে নিযুক্ত থাকবে, তারা প্রতিদিন তুলসীবৃন্ত নিয়ে সংগ্রামের সাফল্য প্রার্থনা করবে। সন্ধ্যায় পুরুষদের সভা হয় এবং প্রথম দফায় দেড়শতজন সত্যাগ্রহী নির্বাচিত হয়। প্রত্যেক সত্যাগ্রহী ২৩শে আগস্ট তারিখে ঘর থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে লাঠি, দড়ি, কোদাল, গাঁইতা আর শাবল নিয়ে পাহাড়পুরে একত্রিত হবে—এই সিদ্ধান্ত করা হয়।"

"আন্দোলন আরম্ভ হয়। ডমরু হাটে মদের দোকান থেকে মদের পিপা খুলে মদ ঢেলে ফেলে দেওয়া হয়। পাহাড়ী জনতার জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মদ চোলাইয়ের সব যন্ত্রপাতি দোকানদার নিজেই ভেঙ্গে দেয়। সাঁওতালেরা মহা-

উৎসাহে ডম্বরু গ্রামের ফরেস্ট অফিস ভস্মীভূত করে। এর পর চাঁদশা বাংলোর ওপর আক্রমণ। পরগণাইত ও অনেক চৌকীদার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাংলোতে ছিল। পাহাড়ীয়া সত্যাগ্রহীর দল নির্ভীকভাবে বাংলোর সম্মুখে উপস্থিত হয়। পরগণাইত বন্দুক তোলা মাত্র একজন তার বন্দুক কেড়ে নেয় এবং সত্যাগ্রহীরা পরগণাইতকে বন্দী করে। অন্যান্য চৌকীদারেরা পালিয়ে যায়। এই বাংলোয় দু'জন সত্যাগ্রহী বন্দী ছিল, তাদের মুক্ত করা হয়। বাংলো ও ফরেস্ট অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মদের দোকান ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

"২৪শে আগষ্ট গোড্ডা রোডের ওপর গাছ ফেলে দিয়ে চলাচল বন্ধ করা হয়। দু'টি কাঠের পুল উৎখাত করা হয় এবং বোকৃড়া-বাঁধ বাংলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর সুস্‌নির বাংলো ভস্মীভূত এবং মদ-চোলাইয়ের ভাটি ভেঙে ফেলা হয়।

"২৫শে আগস্ট সাঁওতালী ও পাহাড়িয়া সত্যাগ্রহী দল দু'ভাগ হয়ে একদল ডুম্‌রিচিট বাংলোর দিকে, আর একদল আলুবেড়াতে পৌঁছয়। আলুবেড়ার ফরেস্ট অফিস ভস্মীভূত ও ভাটিখানা ভাঙা হয়। ডুম্‌রিচিটের বাংলো ফরেস্ট অফিস ও ভাটিখানা ভস্মীভূত হয়।

"২৭শে আগস্ট তারিখে সিলিংগিতে বাংলো ও ফরেস্ট অফিস এবং এর পর গন্তরিয়া গ্রামের ভাটিখানা ধ্বংস করা হয়। রক্‌সি গ্রামে জঙ্গল দারোগার দ্বারা পরিচালিত অস্ত্রসজ্জিত জোলার দল আমাদের দলকে আক্রমণ করে এবং আমরা বন্দী হই। আমাদের ওপর প্রচণ্ড রকম মার পড়ে। শ্রীদুর্গা টুডু আক্রমণের পর ১০ মিনিটের মধ্যেই মারা যায়। শ্রীবাবুয়া পাহাড়িয়া, মেল সিং পাহাড়িয়া ও ভুখন বরবার আহত হয়। আমরা গ্রেপ্তার হয়ে ৮ই সেপ্টেম্বর রাজমহল জেলে এসে প্রবেশ করি। এ ছাড়া ঠট্‌ঠু মুরমু, রঘু মুরমু, চরণ টুডু, সংগ্রাম মুরমু ও নয়ন হাসদা প্রভৃতি বিশিষ্ট আদিবাসী সাংঘাতিকভাবে আহত হয়।

"আন্দোলন ক্ষান্ত হবার পর গোড্ডা দুমকা ও পাকুড় মহকুমার দামিন অঞ্চলে সশস্ত্র পুলিশ ফৌজের আগমন হয় এবং জনসাধারণের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ

অত্যাচার চলতে থাকে।……প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু না কিছু টাকা জোর করে আদায় করা হয়।…… সিঁদরীজোলা গ্রামে শ্রীসিংহাই মালপাহাড়িয়া ও শ্রীকীর্তি মালপাহাড়িয়ার গৃহে লুণ্ঠনের পর সশস্ত্র পুলিশ ও ফৌজ আগুন লাগিয়ে দেয়। ডোমন সোনাই, সুখু, ছোট কার্তিক, ছোট সিংহাই, দুর্গা ও শিবা মালপাহাড়িয়ার ঘর লুণ্ঠিত হয়। পাহাড়পুরের শ্রীলুথরু মুরমুর ঘর লুঠ করে আটটি গরুর গাড়ীতে আসবাব বোঝাই করে পুলিশ নিয়ে যায়। মহাগামা গ্রামের শ্রীদুলারচাঁদ টুডুর গরু-বাছুর সব লুঠ করে নিয়ে যায়।

"দুমকার উত্তরে পলাসী নামে একটি পাহাড়ী স্থান আছে। এখানকার সাঁওতালেরা আগস্ট সংগ্রামে যোগদান করেছিল। পলাসীতে একদিন যখন সাঁওতাল সত্যাগ্রহীর দল ভাত রান্না করছিল, সেই সময় আচম্‌কা সৈন্যদল এসে তাদের ওপর আক্রমণ করে। আক্রমণের ফলে তৎক্ষণাৎ মুডমা টুডু, কুশ পাহাড়ী, বয়মান টুডু, বিসরিয়াম, মৈল মুরমু, কাকো হাসদা শহীদোচিত মৃত্যু বরণ করে।

"রাঁচীতে টানা ভগতেরা কোন কোন থানার ওপর চড়াও করে ও গ্রেপ্তার হয়। খুঁটি মহকুমায় চরখা ভগত আত্মগোপন করে এক মাস পর্যন্ত আন্দোলন পরিচালনা করে।" (১)

বাংলা দেশেও আগষ্ট সংগ্রামে আদিবাসী সমাজের লোক প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে। বোলপুরের ঘটনায় এবং বালুরঘাটের বিদ্রোহে সাওতালেরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে এবং সাঁওতালেরাই সংঘর্ষে আত্মাহুতি দেয়। খুবই দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত এই সাঁওতাল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে একটি জনসভাও হয়নি। আজও তাঁদের কেউ স্মরণ করে না। তাদের অনাথ পরিবারের খোঁজখবরও কেউ নেয় না, স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা দূরে থাক্। বিপ্লবী হোক্ বা সংগ্রামীই হোক্, পলিটিক্সওয়ালা ভদ্রলোকের চেতনার ভেতরে জাত প্রথাটা যেন রয়েই গেছে, নইলে গরীব সাঁওতালের শহীদোচিত আত্মদানের ইতিহাসকে আমরা স্মরণ করি না কেন?

(১) আগস্ত ক্রান্তি (হিন্দী)—অধ্যাপক বলদেব নারায়ণ।

দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন ও আদিবাসী

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে। এই প্রজা-আন্দোলন যদিও প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলন নয়, তবুও দেশীয় রাজ্যের প্রজামণ্ডলের সংগ্রাম ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুসারে বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামেরই একটি অধ্যায়।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস এবং তারা প্রজা-আন্দোলনের ব্যাপারে সাধারণ দেশীয় প্রজাসমাজের চেয়ে অনগ্রসর নয়। আদিবাসী প্রজাও সমান উৎসাহে প্রজামণ্ডলে যোগদান করেছে, সংগ্রাম করেছে—নির্যাতন বরণ করে নিয়েছে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যে যেখানে আদিবাসী আছে, সেখানেই প্রজা-আন্দোলনে আদিবাসীরা অল্পবিস্তর যোগদান করেছে। গড়জাত উড়িষ্যায় স্বেচ্ছাচারী রাজ্যগুলিতে প্রজাবিদ্রোহে আদিবাসীর দান কম নয়। তালচের, গাঙ্গপুর, ঢেঙ্কানল, রাণপুর প্রভৃতি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যে যে প্রবল প্রজাবিদ্রোহের ঝড় জেগে ওঠে, আদিবাসী প্রজাও সেই ঝড়ে সমানভাবে মেতে ওঠে। এই প্রসঙ্গে একটিমাত্র ঘটনার কথা উদ্ধৃত করা হলো, তাতে বোঝা যাবে দেশীয় রাজ্যের আদিবাসী প্রজাও বর্তমান যুগে কতখানি রাজনীতি-সচেতন হয়েছে।

১৯৩৯ সালে এপ্রিল মাসে উড়িষ্যার গাঙ্গপুর রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে এবং গাঙ্গপুর দরবার আন্দোলন দমন করতে গিয়ে অত্যাচার করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। এই সম্পর্কে গাঙ্গপুর দরবারের বিবৃতি থেকেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক্—

"রাজ্যের মুণ্ডারা খাজনা-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করেছে।······মুণ্ডা ও ওঁরাওদের মধ্যে বহুসংখ্যক খৃস্টানও রয়েছে এবং রোম্যান ক্যাথলিক ও লুথারীয় দু'টি মিশন এখানে আছে। এর মধ্যে লুথারীয় মুণ্ডারা অত্যন্ত বদমেজাজের সম্প্রদায় এবং রাজ্যের আইন মানতে চায় না। রাজ্যের জমি নতুন করে বন্দোবস্ত

(Settlement) করার পর যে খাজনার হার ঠিক করা হয়েছে, লুথারীয় মুণ্ডারা তা মানতে অস্বীকার করে।······গাঙ্গপুরের রাণীসাহেবা রাঁচীর লর্ড বিশপ এবং রোম্যান ক্যাথলিক পাদরীদের অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন খৃস্টান মুণ্ডাদের বুঝিয়ে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করার উপদেশ দেন। লর্ড বিশপ ও রোম্যান ক্যাথলিক পাদরী সাহেবেরা রাণীসাহেবার অনুরোধ মত মুণ্ডাদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করার জন্য বলে। কিন্তু লুথারীয় মুণ্ডারা তবু আন্দোলন চালিয়ে যায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কেও খাজনা বন্ধ আন্দোলনে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করে।

নেতা নির্মল মুণ্ডা

"এই আন্দোলনের নেতার নাম নির্মল মুণ্ডা।·········নির্মল মুণ্ডার নির্দেশে মুণ্ডারা রাণীসাহেবার আহূত প্রচারসভা বয়কট করতে আরম্ভ করে এবং খাজনা বন্ধ আন্দোলন চালাতে থাকে।·····রাণীসাহেবা কতগুলি সেস মকুব করে দেয়। তবুও মুণ্ডারা সন্তুষ্ট হয় না। অতঃপর গাঙ্গপুরের দরবার রাঁচীতে লুথারীয় মিশনের চার্চ কাউন্সিলকে অনুরোধ করে এবং চার্চ কাউন্সিল একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে মুণ্ডাদের নিরস্ত করার চেষ্টা করে।······কিন্তু এঁদের অনুরোধে কোন ফল হয় না, নেতা নির্মল মুণ্ডার নির্দেশ অনুসারেই মুণ্ডারা আন্দোলন চালাতে থাকে।······অতঃপর দরবার সৈন্যদলের সাহায্যে দহিজিরা নামক মুণ্ডাগ্রাম ঘেরাও করে এবং আন্দোলনের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। নির্মল মুণ্ডাকে ধরা সম্ভব হয় না, সে পালিয়ে যায়। পলাতক নির্মল মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যায়।·····নির্মল এমনভাবে মুণ্ডাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে যে, কোন গ্রামে সরকারের অফিসার খাজনা আদায় করতে এলেই দামামাধ্বনি করা হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মুণ্ডারা তীর ধনুক নিয়ে বাধা দেবার জন্য সমবেত হতো। এর পর পুলিশকেও বাধা দেবার জন্য নির্মল মুণ্ডা সকলকে তৈরী করতে থাকে।······নির্মল নিজে একজন

চৌকিদারকে টাঙি নিয়ে আক্রমণ করে। পুলিশ সিম্‌কো গ্রামে নির্মলকে গ্রেপ্তার করার জন্য উপস্থিত হয়, কিন্তু সমস্ত মুণ্ডা তীর ধনুক নিয়ে পুলিশকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হয়, পুলিশ ফিরে আসে।……এর পর দরবার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চেয়ে পাঠান এবং জনৈক ব্রিটিশ অফিসারের অধীনে ৮ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ৫০ জন সৈন্য হাজির হয়। ম্যাজিস্ট্রেট, কয়েকজন পুলিশ এবং সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্টও এই সঙ্গে আসেন।……এই সশস্ত্র বাহিনী ও অফিসারের দল নির্মলকে গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রামে উপস্থিত হয়। গ্রামের জনতা বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট জনতাকে শান্তিপূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার অনুরোধ করে। কিন্তু জনতা আরও মারমুখী হয়ে ওঠে এবং লাঠি ও কুঠার নিয়ে আক্রমণ আরম্ভ করে। এরপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করে, মুণ্ডারা পুলিশ ও সৈন্যদল উভয়কেই আক্রমণ করে। গুলীবর্ষণের পর মুণ্ডারা ছত্রভঙ্গ হয়, নির্মল মুণ্ডাকে ঘর থেকে বের করে এনে গ্রেপ্তার করা হয়। ৩২ জন মুণ্ডা নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়।……বর্তমানে অবস্থা আয়ত্তাধীন, খাজনা আদায় হচ্ছে।"

গাঙ্গপুর দরবার কত নির্দোষ এবং মুণ্ডা প্রজারা কত দোষী, উক্ত দরবারী রিপোর্টে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। সবচেয়ে অর্থপূর্ণ ঘটনা হলো পাদরী সমাজের আচরণ। খৃস্টান মুণ্ডা প্রজার অধিকার সম্বন্ধে তিলমাত্র ঔৎসুক্য না দেখিয়ে বরং দরবারের পক্ষে গিয়ে তাঁরা আন্দোলন বন্ধের চেষ্টা করেছেন। দেশীয় রাজ্যের দরবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্নেহে আশ্রিত, এ তত্ত্ব বোধ হয় পাদরী সমাজ ভাল করেই জানেন এবং এবিষয়ে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদসহযোগী নীতির কখনো ব্যতিক্রম হয় না।

অনেকে বলতে পারেন, খৃস্টান মুণ্ডারা সুবাধ্য প্রজা হিসাবে ভাল ছেলের মত আইন-সম্মত জীবন যাপন করুক, এটাই পাদরীবর্গের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। কিন্তু গত সাধারণ নির্বাচনে রাঁচীর লুথারীয় ফাদারবর্গ যে আচরণের প্রমাণ দিয়েছেন তাতে এ যুক্তি মিথ্যে প্রমাণিত হয়। বিশুদ্ধ

ধর্মপ্রচারক হয়েও, ঠিক ঝোপ বুঝে রাজনৈতিক কোপ মারতে এঁরা জানেন। গত নির্বাচনে মুণ্ডা সমাজকে কংগ্রেসবিরোধী হাঙ্গামায় প্ররোচিত করতে লুথারীয় ফাদারবর্গ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।

গাঙ্গপুরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে উড়িষ্যার কংগ্রেস নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সমস্ত ঘটনার স্বরূপ ও ইতিহাসের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় :

"গাঙ্গপুরের খৃস্টান মুণ্ডা প্রজারা নতুন বর্ধিত হারে খাজনা দিতে আপত্তি করে। গত কয়েক বৎসর থেকেই তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। এর অনাদায়ী খাজনার পরিমাণ মোট ৬৩ হাজার টাকা। মাত্র এইটুকুই মুণ্ডা প্রজাদের অপরাধ (?), এর অতিরিক্ত আর কিছুই তারা করে নি। স্থানীয় লুথারীয় ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল মুণ্ডা আন্দোলনের নেতা। মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ৩২ জনের প্রাণসংহার করা হয়েছে।......এই মাত্রাহীন হিংস্র আচরণের কোন প্রয়োজন ছিল না, নির্মল মুণ্ডাকে অন্যান্য নেতার মত শান্তভাবেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মুণ্ডা প্রজাদের দাবী যুক্তিসঙ্গত ছিল কি না ছিল, এ সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই হয় নি।......পণ্ডিত নেহরু ইস্টার্ণ স্টেট এজেন্সীর রেসিডেণ্টকে এবিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। অনুরোধ উপেক্ষিত হয়েছে। পণ্ডিতজী দুঃস্থ ও শোকার্ত মুণ্ডা পরিবারদের জন্য ও আহতদের জন্য সেবা ও সাহায্য পাঠাতে চেয়েছেন, কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব এই সামান্য অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছেন।" (১)

(১) Orissa States Enquiry Committee Report (1939)—By Orissa States People's Conference.

"একটি বিরসাপন্থী যুবকের কাহিনী"

গোষ্ঠীগত খাঁটি আদিবাসী, ধর্মান্তরিত খৃস্টান আদিবাসী, শিক্ষিত আধুনিক ভারতবাসী, খৃস্টান মিশনারী এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট—বিংশ শতাব্দীর ঘটনার পরিণামে এঁদের সকলকে একটা সম্পর্কের মধ্যে আসতে হয়েছে। এই সম্পর্ক কিন্তু সুস্থির হয়ে উঠতে পারে নি। প্রত্যেকের লক্ষ্য, রুচি এবং আদর্শের রূপ ক্রিয়া ও পন্থা ভিন্ন। পরস্পরের দ্বন্দ্বে ও প্রতিযোগিতায় এই সম্পর্ক একটা ঐতিহাসিক পরীক্ষার ভেতর ভেঙে-গড়ে নতুন করে তৈরি হয়ে উঠছে। এর মধ্যে কে কতখানি ভুল করছে এবং কে কতখানি নির্ভুল, তার মীমাংসা এখনো হয় নি। ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। সমস্যাটার উদাহরণ হিসাবেই একটি কাহিনী এই প্রসঙ্গে বিবৃত হলো ঃ

"আমাদের ক্লাসটা ছিল একটি অ্যানথ্রপলজির ল্যাবরেটরীর মত। এমন বিচিত্র মানবতার নমুনা আর কোন স্কুলের কোন ক্লাসে আছে কিনা, জানি না। তিনটি রাজার ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। একজন জংলী রাজার ছেলে, কুচকুচে কালো চেহারা। আর দুজন ছিল সত্যিকারের ক্ষত্রিয়াত্মজ—সুগৌর গায়ের রঙ, পাগড়িতে সাঁচ্চা মোতির ঝালর ঝুলতো। তাছাড়া ছিল—সিরিল টিগ্‌গা, ইম্যানুয়েল খালখো, জন বেস্‌রা, রিচার্ড টুডু, স্টীফান হোরো এবং আরো অনেক। এত সাঁওতাল ওরাওঁ আর মুণ্ডা সন্তানের সমাবেশের মাঝখানে তবু আমরা ক'জন ইণ্টার ক্লাস পরিবারের বাঙালী ও বেহারী ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে সর্বকর্মের মোড়লীর গৌরব অধিকার করে বসেছিলাম। রাজার ছেলেগুলোকে আমরা বলতাম সোনা ব্যাঙ্, আর মুণ্ডা ওরাওঁদের বলতাম কোলা ব্যাঙ্। ওদের কাউকে আমরা কোনদিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। রাজার ছেলেগুলি অবশ্য আমাদের সঙ্গে কথা বলতো না। অপরপক্ষে টিগ্‌গা, খালখো, বেস্‌রা, টুডু—ওরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যেতো। টিফিনের সময় একটা আনি নিয়ে টুডুকে দিতাম। বলতাম—টুডু চট্ করে একদৌড়ে এই এক আনার ঝালবাদাম নিয়ে এসতো। গঙ্গা সাহুর দোকান থেকে আনবে।

স্কুল থেকে গঙ্গা সাহুর দোকান দেড় মাইল হবে। কৃতার্থভাবে আনিটা হাতে তুলে নিয়ে টুডু সেই প্রচণ্ড রোদে-ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে পোড়া হরিণের মত উদ্দামবেগে দৌড়ে চলে যেত গঙ্গা সাহুর দোকানে। ফিরে এসে ঝালবাদামের ঠোঙাটা আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে দূরে সরে যেত। আমরা বলতাম—কী আশ্চর্য টুডু, এতটা পথ দৌড়ে এলে তবু তুমি একটুও হাঁপাচ্ছো না!

আর্যসুলভ এই ফাঁকা কথার কারসাজিটাকে আন্তরিক অভিনন্দন মনে করেই টুডু দূরে দাঁড়িয়ে গর্বভরে হাসতো। আমরা চোখ টিপে লক্ষ্য করতাম—টুডু কেমন জোর করে তার পরিশ্রান্ত শ্বাসবায়ুটাকে ঢোঁক গিলে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাকে ঝালবাদামের একটু শেয়ার দিতে আমরা বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলে যেতাম। দিতে গেলেও টুডু নিত না।

আমরা দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে স্টীফান হোরো আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছে। আমরা ঘাবড়ে যেতাম। স্টীফান যেন তীর মেরে আমাদের বুকের ভেতরের ধূর্ত রসিকতায় ফুসফুসটাকে চেখে দেখছে। সব বুঝে ফেলতে পারছে। কিন্তু সবার মধ্যে একমাত্র স্টীফানই পারে, আর কেউ নয়?

টুডু, খালখো, টিগ্‌গা, বেস্‌রা সকলেই কতকটা এই রকমেরই বাধ্য বেকুব বিশ্বাসী আর নিরীহ ছিল। আমরা মনে মনে হাসতাম। —হায় রে রাঁচীর জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ্!

ওদের মধ্যে ঐ একটি মাত্র কাল কেউটে ছিল স্টীফান হোরো। বড় উদ্ধত ছিল স্টীফানের স্বভাবটা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, হোরোর কাছে আমাদের আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত। ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার জন্য মাঝে মাঝে যেচে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। আরও লজ্জার বিষয়, স্টীফান এক-এক সময় আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। ঐ মাথাঠাসা মোটা মোটা চুলের ঘুঙুর, চেপ্টা নাক, আবলুসকালো চেহারা—তবু এত অহঙ্কারী!

স্টীফান হোরোর ওপর প্রথম একটু ভয় ও শ্রদ্ধা হলো একটা ঘটনায়। সেদিন খেলার মাঠে দেখলাম—হোরো হকি স্টীক আনে নি। হোরো তবু খেলতে চায়। কিন্তু নিজের হকি নিয়ে খেলতে হবে—এটাই আমাদের নিয়ম ছিল। হোরো বার বার আমাদের অনুরোধ করলো—কিছুক্ষণের জন্য কেউ আমাকে একটা স্টীক ধার দাও, এক হাত খেলেই আবার দিয়ে দেব।

কেউ কারও স্টীক পরের হাতে দিতে রাজী ছিল না। হোরো বললো—আমি বিনা স্টীকেই খেলবো।

গোঁয়ার হোরো একটি ঘণ্টা আমাদের উদ্দাম হকি স্টীকের আঘাত আর আছাড়ের বিরুদ্ধে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে পা দিয়ে খেলে গেল। হোরোর দুটি নিরেট শিশু কাঠের পায়ের ওপর বেপরোয়া হকি স্টীক চালাবার সময় এক একবার সন্দেহে আমাদেরই হাত কেঁপে উঠেছে—স্টীকটাই ভেঙে না যায়।

স্টীফান হোরো ক্রমেই আমাদের ভাবিয়ে তুলছিল। শুধু ভয় আর শ্রদ্ধা নয়—আর একটা কারণে আমরা হোরোকে এইবার ঈর্ষা করতে আরম্ভ করলাম। লেখাপড়ার ব্যাপারে হোরো আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশী পেয়ে গেল। ঘটনাটা জাতীয় অপমানের মত আমাদের গায়ে বিঁধলো। বেহারী ছাত্রদের জাতীয়তা কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল জানি না, কিন্তু হোরোর সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্রে তারাও আমাদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট করলো। আমরা বেশ জোর গলায় রটিয়ে দিলাম—এ স্কুলে অ-খৃস্টানদের ওপর বড় অবিচার চলেছে। মাস্টারেরা সবাই খৃস্টান। সুতরাং খৃস্টান হোরো বেশী নম্বর পাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু কী ভয়ানক অন্যায়!

আমাদের অভিযোগকে মনে-প্রাণে সত্য বলে বুঝলেন শুধু একমাত্র অ-খৃস্টান শিক্ষক—সংস্কৃতের মাস্টার বৈজনাথ শর্মা—পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী আমাদের সান্ত্বনা দিলেন। —কি আর করবে বাবা! পাদরীদের

স্কুলে এই রকমই অন্যায় কাণ্ড হয়ে থাকে। যাক্, ইউনিভার্সিটি তো আছে। সেইখানে ধরা পড়ে যাবে, কার কতখানি যোগ্যতা।

প্রমোশনের পর নতুন বছরে স্টীফান হোরো আরও ভয়ানক গোঁয়ার্তুমি করে বসলো—পা দিয়ে হকি খেলার চেয়েও ভয়ানক। স্টীফান হোরো তার অ্যাডিশনাল ইংরিজি ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। খৃস্টান টীচারেরা সবাই হোরোকে ধমকালেন, হেডমাস্টার ফাদার লিগুন ক্ষুণ্ণ হলেন, পণ্ডিতজী অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলেন। তবু অনার্য হোরোর সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হলো না।

পণ্ডিতজী আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন —স্টীফান হোরো সংস্কৃত নিয়েছে। আর কি? এইবার দেবভাষার কপালে কি আছে কে জানে।

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমাদের কেমন সন্দেহ হলো—পণ্ডিতজীকে যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছে! যাক্।

শীঘ্রই আমাদের যত ধারণা, সংশয়, আক্রোশ, আশঙ্কা পর পর কতকগুলি ঘটনায় আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগলো।

নিউ টেস্টামেন্ট থেকে ডেভিডের গাথাগুলি আগাগোড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে ফার্স্ট প্রাইজ পেল স্টীফান হোরো। সেকেণ্ড, থার্ড ও ফোর্থ প্রাইজের অগৌরবে মুখ শুকনো করে আমরা বসে রইলাম। ফাদার লিগুন উচ্ছ্বসিত আনন্দে হোরোর প্রশংসা করে ঘোষণা করলেন—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তোমায় নিশ্চয় দারোগা করে দেব স্টীফান, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তা করতে পারেন ফাদার লিগুন। এতটুকু সুপারিশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু এই দারোগাগিরিই যদি স্টীফান হোরোর জীবনের পরমার্থ হয় হোক, তার জন্য আমরা মোটেই হিংসা করি না। তার জন্য এত কষ্ট করে নিউ টেস্টামেন্ট মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের।

তার পরের দিনই বাইবেল ক্লাসে হোরোকে একেবারে ভিন্নরূপে দেখতে পেলাম আমরা। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে আমরা শুধু খাবি খেতে লাগলাম।

বাইবেল ক্লাসের একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে বসেছিল স্টীফান। পড়াতে পড়াতে ফাদার লিগুন বার বার পুলকিত নেত্রে হোরোকে প্রশ্ন করছিলেন—স্টীফান, তুমিই উত্তর দাও। তুমিই সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবে।

—জানি না স্যার। স্টীফানের রুক্ষ গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, স্টীফান হোরোর আরও রুক্ষ ও বিরক্ত মুখটা ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ফাদার লিগুনের দিকে যেন তাকাতে চায় না হোরো।

ফাদার লিগুনের সোনালি দাড়ির ওপর বসানো শক্ত বরফ দিয়ে গড়া সাদা মুখে ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠছিল। স্টীফানের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন—স্টীফান, আজ কি তোমার ব্রেনটাকে দরজার বাইরে রেখে ক্লাসে এসেছ? উত্তর দিতে পারছ না কেন?

—জানি না স্যার। আবার স্টীফান হোরোর সেই স্পষ্ট অবিচল ও অকুতোভয় উত্তর শুনে আমাদের বুকে দুরু দুরু শুরু হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে অসময়ে ক্লাস বন্ধ করে ফাদার লিগুন চলে গেলেন।

কিন্তু স্টীফান হোরোর এত রাগ কেন? এত অভিমান কেন? নিউ টেস্টামেণ্ট মুখস্থ করে কার মাথা কিনেছে? কী হতে চায়? হাউস অব লর্ডস্-এর সদস্য?

এর পর বিপদে পড়লেন পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীর মতিগতিও ক'দিন থেকে কেমন একটু বিসদৃশ দেখাচ্ছে। আমাদের এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন পণ্ডিতজী একটু স্বস্থবোধ করেন। দেখা হলেই ব্যস্ত হয়ে সরে পড়েন। অথচ পণ্ডিতজীকে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করার আছে। ফার্স্ট টার্মিন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই তো যত নম্বর প্রমোশন আর পজিশন নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা, গবেষণা ও কৌতূহলের সময়। পণ্ডিতজীর উদার হাতের নম্বর অনেক সময় আমাদের

'টোটাল'কে পরিস্ফীত করে কৃপণ খৃস্টান শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আজও আমরা তাই জানতে চাই—পণ্ডিতজী কার জন্য কতদূর করলেন। ইন্দুকে যদি একবার বুক ঠুকে পঁচাশি দিয়ে দেন, তবে টোটালে তার ফার্স্ট হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। সব খৃস্টানী ষড়যন্ত্র জব্দ হয়ে যায়।

পণ্ডিতজীর বাড়িতে গিয়েছি, লাইব্রেরী ঘরে একা একা পেয়েছি, পথে পথ-রোধ করেছি—কিন্তু পণ্ডিতজী কি রকম গোলমেলে কথা বলে সব কৌতূহল যেন চাপা দিতে চান। আমাদের সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

আমতা আমতা করে দুবার মাথা চুলকিয়ে পণ্ডিতজী শেষ পর্যন্ত সত্য সংবাদটা ব্যক্ত করে দিলেন। —সংস্কৃতে স্টীফান হোরো সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে—একশোর মধ্যে পঁচাত্তর।

—আর ইন্দু? আমাদের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পণ্ডিতজী অপরাধীর মত বললেন—বত্রিশ।

মাত্র বত্রিশ! পণ্ডিতজীর মত বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের ক্ষোভ অসংযত হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতজী মিনতি করে বললেন—স্টীফান হোরো এত ভাল সংস্কৃত লিখেছে, এ-তো তোমাদেরই গৌরব, আর্যভাষার গৌরব। এতে তো তোমাদের খুশি হবার কথা। এটা হোরোর জয় নয়, এটা হলো সংস্কৃত ভাষার জয়।

চুলোয় যাক সংস্কৃত ভাষার জয়। ইন্দু ফার্স্ট হতে পারবে না, এটা যে আর্যত্বের কত বড় পরাভব, বাঙালীর কত বড় অপমান, তা পণ্ডিতজী বুঝলেন না। কিন্তু আমরা ঠিক রহস্যটি বুঝে ফেললাম—পণ্ডিতজী হলেন বেহারী, তাই।

কিন্তু বাতাসের নিশ্চয় সেই পরম গুণ আছে—যার জন্য শত অন্যায়ের অব-রোধের মধ্যেও ধর্মের কল নড়ে উঠে। লাইব্রেরীর ঘরে যেদিন বোর্ডনিবিদ্ধ মার্কশীটের কাছে আমরা গিয়ে চোখ তুলে দাঁড়ালাম, সেদিন আমরা বিশ্বাস করলাম—সত্যের জয় আছে, মিথ্যার পরাজয় আছে।

ইন্দুই ফার্স্ট হয়েছে। স্টীফান হোরো অনেক নীচে। ইংলিশে, ইতিহাসে, ভূগোলে, অঙ্কে—সব বিষয়ে অতি নগণ্য নম্বর পেয়েছে স্টীফান হোরো, একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া। ভেবে অবাক হলাম আমরা—খৃস্টান টীচারেরা হোরোর ওপর হঠাৎ এত নির্দয় হয়ে উঠলেন কেন ?

আরও কিছুদিন পরে স্টীফান হোরো আমাদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য হ'য়ে গেল। শুধু আমাদের কাছে নয়, খালখো, বেসরা, টিগ্‌গা সবাই বলাবলি করে—কি জানি হয়েছে হোরোর !

বড়দিনের উৎসবে আমরাও পিকনিক করতে গিয়েছিলাম শিলোয়ারার জঙ্গলে। রান্নার কাঠের জন্য মহা উৎসাহে একটা মরা কেঁদ গাছ ভাঙছিলাম আমরা। হঠাৎ দেখলাম, স্রোতের ধার দিয়ে একা একা হোরো চলেছে। হাতে একটা গুলতি। আমরা চেঁচিয়ে ডাকলাম হোরোকে। এরকম অভাবিতভাবে হোরো যখন এসেই পড়েছে, তখন সেও আমাদের সঙ্গে এই বনভোজনের আনন্দের একটু শেয়ার নিক না কেন। পোলাও হবে, মাংস হবে, দই আছে, বৈকুণ্ঠ ময়রার সন্দেশ আছে। খেয়ে খুশি হবে হোরো। একেবারে আনকোরা মুণ্ডা, জীবনে বোধহয় এসব খায় নি কখনো।

হোরো এগিয়ে এল। আমাদের কাছে এসেই একটা শাল গাছের শাখার দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে রইল। তারপরেই শিকার লক্ষ্য করে গুলতি তুলে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালী আহত হয়ে ধপ করে মাটীর ওপর পড়লো। একটা লাফ দিয়ে আহত কাঠবিড়ালীটাকে লুফে নিয়ে পকেটের ভেতর রাখলো স্টীফান।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ওটা কি হবে স্টীফান ?

—খাব। নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলে ফেললো হোরো। মনের ঘেন্না চেপে রেখে তবু আমরা হোরোকে নিমন্ত্রণ করলাম।—ওসব ছুঁড়ে ফেলে দাও স্টীফান। পাগল কোথাকার। এস, আমাদের পিকনিকে তুমিও খাবে আমাদের সঙ্গে।

—না। হোরোর মুখের ভেতর থেকে ঝকঝকে দুপাটি সাদা দাঁতের হাসি আপত্তি জানালো।

এ রকম জংলী হয়ে যাচ্ছে কেন স্টীফান। রিচার্ড টুডু একদিন কানে কানে আমাদের বললো,—সত্যিই কি জানি হয়েছে হোরোর, বোধ হয় শীগ্‌গির পাগল হয়ে যাবে। ফাদার লিগুন আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, হোরোর সঙ্গে যেন কেউ না মেশে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—কেন টুডু ?

টুডু।—একজন বুড়ো সোখার* সঙ্গে আজকাল বড় ভাব হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিদিন মঙ্গলবারের হাটে গিয়ে সোখার সঙ্গে দেখা করে হোরো।

তাতে কি এমন অপরাধ করেছে হোরো ?

টুডু ভুরু কুঁচকে বললো।—অপরাধ নয় ? এতে বাইবেলের অপমান করেছে হোরো। চার্চে যায় না, কারও কথা শোনে না। তিনদিন বোর্ডিংয়ে ছিল না। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

—বোর্ডিংয়ে ছিল না ? কোথায় ছিল ?

টুডু গলার স্বর আরও নামিয়ে চুপে চুপে বললো।—বুরুতে* গিয়েছিল। সেখানে নেচে গেয়ে এসেছে। পেট ভরে ইলি* খেয়ে নেশা করেছে। তা ছাড়া ·····

টুডু হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো—একটা কথা বলছি, কাউকে বলো না যেন। জানতে পারলে হোরো আমায় মেরে ফেলবে।

টুডুকে অভয় দিলাম।—না, কেউ জানতে পারবে না, তুমি বল।

টুডু।—একটি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে। মেয়েটার নাম চিরকি, মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের মেয়ে।

* সোখা অর্থাৎ ওঝা।
* বুরু অর্থাৎ মেলা
* ইলি অর্থাৎ মহুয়ার মদ

টুডুর কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে যেন গিলছিলাম আমরা। আমাদেরই সহপাঠী দীন-দরিদ্র মুণ্ডা হোরো, কতই বা বয়স; তবু সেই হোরো আজ এক মুহূর্তে আমাদের বাইবেল ক্লাশ, সংস্কৃতের নম্বর আর হকি খেলার সব আনন্দ উত্তেজনাকে মূল্যহীন করে দিয়ে, এক রোমাঞ্চময় অনুরাগের স্কুলে গিয়ে সবার অগোচরে নাম লিখিয়ে এসেছে। সেই মেয়েটি, চিরকি মুরমু তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। শাল ফুলের মালা গলায় দিয়ে, খোঁপায় একটা বনজবা গুঁজে, স্রোতের ভাষার মত খল খল হাসির বন্ধনে হোরোর কালো হৃদয়ের সব দুরন্তপনাকে বন্দী করে কোন্ উপত্যকার একটি নিভৃতে নিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকে ফিরে আসার সাধ্য নেই হোরোর। কোন্ সাধেই বা আসবে।

টুডু তখনো সেইরকম পাকা পাকা কথা বলে চলেছিল।—মুরমুরা বোঙা পূজো করে, ওদের সঙ্গে মেলামেশা কি উচিত হলো? বড় ভুল করেছে হোরো।

স্টীফান হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এটা শুধু একটা গুজব হয়েই রইল। কার্যতঃ দেখলাম, হোরোকে তাড়ানো হলো না। নিজের ইচ্ছে মত ক্লাশে আসে হোরো। নিজের ইচ্ছে মতই অনুপস্থিত হয়। অনুগত খৃস্টান ছাত্রেরা হোরোকে এড়িয়ে যায়। হোরো যেন একঘরের মধ্যেই একঘরে হয়ে আছে।

রিচার্ড টুডু যে আশঙ্কা প্রচার করেছিল, কাজের বেলায় দেখলাম তার উল্টোটাই হয়েছে। হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় নি। সে বোর্ডিংয়ে আছে, অথচ তার সম্পর্কে যেন সব শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আমরা দেখে অবাক হয়ে যেতাম, এক একদিন বিকেলে ফাদার লিণ্ডন টেনিস খেলছেন হোরোর সঙ্গে। আশ্চর্য! টুডু বেসরা টিগ্‌গা, এরা হোরোর চেয়ে কম কালো আর বেশী বিশ্বাসী খৃস্টান। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা শুধু ফাদার লিণ্ডনের টেনিস খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেবার মর্যাদা পেয়েছে। তার বেশী নয়। আর স্টীফান একেবারে···সত্যি আশ্চর্য।

বোর্ডিংয়ের বাগানে বিকাল বেলা জল দেবার ভার ছিল হোরোর ওপর। এই কর্তব্যটুকুর বিনিময়ে হোরো বোর্ডিংয়ে ফ্রী খেতে পেত আর থাকতো। আমরা দেখলাম, হোরো আর বাগানে যায় না, জল তোলে না। উদ্যানসেবার ভার টিগ্‌গার ওপর চাপানো হয়েছে। বেচারী টিগ্‌গা! সকাল বেলার রান্নার জন্য কাঠ কাটে, তার ওপর আবার বিকেল বেলা জল তোলা!

টুডু এসেই আর একদিন একটা খবর দিল—আজকাল আর হাটে যাবার সুযোগ পায় না স্টীফান। বুড়ো সোখার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায় না। প্রতি মঙ্গলবারে সারা দুপুর ফাদার লিণ্ডনের ঘরে বসে 'পিলগ্রিম্'স্ প্রগ্রেস্' (Pilgrim's Progress) পড়ে। পড়া শেষ হলে নাকি চা-বিস্কুট খায় হোরো। ফাদার লিণ্ডন খাওয়ান।

আমাদের উৎসাহ ঔৎসুক্য আলোচনা আর গবেষণার সীমা ছিল না। অলক্ষ্যে কত বড় একটা ঘটনার দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে, তার কিছু কিছু আভাস আমরা আমাদের অনুভব দিয়ে ধরতে পারছিলাম। একদিকে কেম্ব্রিজের এম. এ. বিখ্যাত শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিণ্ডন; অপর দিকে কোন্ এক জংলী মুণ্ডা ডিহির বুড়ো সোখা—দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ বর্বরবেশী এক যাদুমন্ত্রা। যেন দুই যুগে লড়াই—বিংশ শতক বনাম প্রাক্-ইতিহাস। বুড়ো সোখা বোধ হয় সে লাঞ্ছনা ভুলতে পারে না, ছেলেধরা পাদরীরা তাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, খৃস্টান করে দিয়েছে হোরোকে। তারই প্রতিশোধ নেবে বুড়ো সোখা। এই সুসভ্য ডাইনদের দুর্গ থেকে আবার জঙ্গলের ছেলেকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ফাদার লিণ্ডন তাই বোধ হয় সতর্ক হয়েছেন। স্টীফান হোরো যদি আবার জংলী হয়ে যায়, সে পরাজয় আর অপমান বড় বেশী করে বুকে বাজবে। সহ্য করা কঠিন হবে। লিণ্ডন জানেন প্রতি মঙ্গলবারের হাটে বুড়ো সোখা আসে। একটা আরণ্য আত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। চা বিস্কুট টেনিস—সুসভ্যতার এক একটি প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিণ্ডন।

আমরা বলতাম—চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। দেখা যাক্, কে জেতে কে হারে।

গুড ফ্রাইডের ছুটিতে সবাই দেশে যাবার ছুটি পেল। টুডু টিগ্‌গা বেসরা খালখো—সবাই চলে গেল। ওদের পক্ষে যাবার কোন বাধা ছিল না। কাঁধের লাঠিতে এক একটা পোঁটলা ঝুলিয়ে জঙ্গলের পথে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল একটানা হেঁটে ওরা চলে যাবে নিজের নিজের ডিহিতে। কোন পাথেয় দরকার হয় না। ততখানি পয়সা খরচ করার সামর্থ্যও নেই ওদের। কিন্তু হোরোকে ছুটি দিতে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন ফাদার লিগুন। হোরো যেদিন গেল, সার্ভিস বাসটা এসে দাঁড়ালো বোর্ডিংয়ের কাছে। আমরা দেখলাম, ফাদার লিগুন মণিব্যাগ থেকে টাকা বের করছেন, বাসের টিকিট কিনে দিচ্ছেন হোরোকে।

আমাদের মধ্যে বাজি ধরা হলো—হোরো আর ফিরে আসবে কি না। ইন্দু বললো—নিশ্চয় আসবে। ফাদার লিগুন ওর জংলীপনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। দুবেলা চা-বিস্কুট মারছে আজকাল। তার আস্বাদ কি ভুলতে পারবে হোরো?

আমি বললাম—আর ফিরে আসবে না হোরো। এখানে না হয় চা-বিস্কুট আছে, কিন্তু ওদিকে যে……

ইন্দু।—ওদিকে কি?

বললাম।—চিরকি মুরমুকে ভুলে গেলে?

ইন্দু একটু নিরাশ হয়ে পড়লো—তাই তো।

ছুটি ফুরিয়ে গেলে আবার বোর্ডিংয়ের জীবন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সবাই এসেছে। স্টীফান হোরো ফিরে এসেছে। ইন্দুর জিত হলো। আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। রাগ হলো হোরোর ওপর। হোরোটা সত্যিই একটা গবেট ও বেরসিক।

কিন্তু টুডুর কাছে কতগুলি গল্প শুনে আমাদের এই আক্ষেপ মুহূর্তে মুছে গেল। আমরা শুনলাম বুড়ো সোখার কথা, হোরোর কথা, চিরকি মুরমুর কথা। হোরোদের জঙ্গলের ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে ফোটা পলাশের আলেয়ার মত হয়ে আমাদের কল্পনার সীমার পারে যেন দুলতে শুরু করে দিল।

ইন্দু বললো।—চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোখার জয় অবধারিত।

হোরোর পাশের ডিহির ছেলে টুডু। খৃস্টান টুডুরা অখৃস্টানদের সঙ্গে মেশে না। টুডু তবু যেন গোয়েন্দার মত হোরোর সব কীর্তি দেখে এসেছে। তবে টুডু প্রাণ থাকতে ফাদার লিণ্ডনের কানে এসব কথা কখনো তুলবে না। হোরোর ওপর প্রচণ্ড একটা শ্রদ্ধা ও মমতা আছে টুডুর। হোরোর কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারে না বলেই, আমাদের কাছে বলে। বলে বলে যেন স্তব্ধ শ্রদ্ধার বেদনা খানিকটা হালকা করে নেয়।

টুডু দেখেছে—একদিন তীর দিয়ে একটা হরিণ মেরেছিলো হোরো। স্রোতের ধারে হোরো দাঁড়িয়েছিল ধনুক হাতে। চিরকি মুরমু তার পা ধুইয়ে দিচ্ছিল।

টুডু দেখেছে—চিরকি তাদের গাঁয়ের ওরা* থেকে জ্যোৎস্না রাতে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছে। হোরো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চিরকিকে হাতে ধরে নিয়ে গেছে।

টুডু দেখেছে—হোরো খৃস্টান হয়েও আখ্‌ড়াতে গিয়ে মাদল বাজিয়েছে। চিরকিও নাচে কিনা সেখানে। বুড়ো সোখা ভালবাসে হোরোকে। কেউ তাই হোরোকে ঘৃণা করে না।

টুডু বললো।—জংলীদের সঙ্গে মিশে দুদিন সেণ্ডেরা** করেছে হোরো। টাঙি হাতে উৎসবে পাগলের মত নেচেছে। শিমুল গাছে আগুন ধরিয়েছে—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলেছে। সবার আগে এক লাফ দিয়ে এক কোপে জ্বলন্ত গাছ কেটেছে হোরো।

টুডু গলার স্বর খুব অস্পষ্ট করে ভয়ে ভয়ে বললো—আমি দেখেছি, তারপর গায়ের ফোস্কাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাবার জন্যে আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোরো। চিরকি মুরমু আস্তে আস্তে এসে হোরোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

* ওরা অর্থাৎ কুমারীদের শয়নশালা।

**সেণ্ডেরা অর্থাৎ শিমুল বনে বহ্নি-উৎসব

বোর্ডিংয়ের পাশে ছোট মাঠের ঘাসের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আমরা টুডুর গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ বোর্ডিংয়ের বারান্দা থেকে একটা বাঁশীর স্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে মাথা দুলিয়ে, টুডু গুণ গুণ করে গাইতে লাগলো—

রাতা মাতা বিরকো তালা
রে নালো হোম নিরজা
রাগা ইংগা···········

উৎফুল্ল টুডুর হাবভাব আর উৎসাহ দেখে মনে হলো, এখুনি সে নাচতে শুরু করে দেবে।

—কে বাজাচ্ছে বাঁশী ? কে ?

আমাদের ব্যস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে টুডু গান থামিয়ে বললো—ঐ, সেই গান। হোরো সেই স্বরটা বাজাচ্ছে।

—কোন্ গান ?

—চিরকি মুরমুর গান।

—গানটার মানে কি টুডু ?

টুডু উত্তর দিল।—গানটার অর্থ, শোন আমার জোয়ান বন্ধু, পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না।

একটা পুলকের সঞ্চার আমাদের মনের ওপর অগোচরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। বললাম—এ যে আমাদেরই মত গান টুডু।

ইন্দু চাপা স্বরে আবৃত্তি করলো—শুন শুন হে পরাণ পিয়া···

কিছুক্ষণ আবিষ্টের মত নিঝুম হয়ে বসেছিলাম আমরা। বোধ হয় আমরা মনে মনে চিরকি মুরমু নামে বনের লতার মত না-দেখা একটি মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম—না, তোমার বন্ধু পালিয়ে যাবে না। আমরা প্রার্থনা করছি, হোরো তোমার কাছে ফিরে যাবে।

হঠাৎ ফাদার লিগুনের গর্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। বোর্ডিংয়ের বারান্দার অন্ধকারে যেন একটা ধস্তাধস্তি চলছে। টুডু দৌড়ে গিয়ে ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে ফিরে এলো। সন্ত্রস্তের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—ফাদার লিগুন হোরোর বাঁশী ভেঙে দিয়েছেন।

আমাদের সবার মনে একসঙ্গে ধক্ করে কতগুলি প্রতিহিংসার শিখা জ্বলে উঠলো। ঘা কতক জমিয়ে দিতে পারলো না হোরো?

টুডু বিমর্ষভাবে বললো—আমারও কেমন ভয় হচ্ছে। হোরো বড় গোঁয়ার। ফাদার লিগুনকে এর ফল টের পাইয়ে দেবে হোরো।

কিন্তু এর পর স্টীফান হোরোর গোয়ার্তুমির কোন প্রমাণ পেলাম না। বরং দেখলাম, গোঁ ধরেছেন ফাদার লিগুন। ফাদার লিগুনের অভিযান আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার সফরে বের হন। কখনো ভোজপুরী লেঠেল সঙ্গে যায়, কখনো বা আট দশটা কনেস্টবল। থানাতে একটা চিঠি দিলেই কনেস্টবল চলে আসে। যেন একটা যোদ্ধার দল নিয়ে দুদিনের জন্য জঙ্গল এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যান ফাদার লিগুন। সত্যই তিনি একজন ধর্মযোদ্ধা। আমরা শুধু মনমরা হয়ে ভাবতাম—ফাদার লিগুনের এই রহস্যময় আনাগোনা কবে বন্ধ হবে? কবে শান্ত হবে তাঁর সাদা মুখের লাল্‌চে উত্তেজনা?

টুডুর কাছে শুনে স্পষ্ট করে বুঝলাম, মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের ডিহিতেই ফাদার লিগুনের অভিযান শুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে এরই মধ্যে একটি মাটির গীর্জা তৈরী করে ফেলেছেন। অরণ্যের বুকের ভেতর ঢুকে তিনি যেন হাজার হাজার বছরের বৃদ্ধ যত বোঙাদের শিলাময় বেদী কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

খুব বেশী দিন পার হয় নি, শুনলাম, মোরাঙ্গি পাহাড়ে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। মাটির গীর্জাটা ভেঙে ধূলো করে দিয়েছে। কে করেছে?

যে করেছে, তাকে আমরা স্বচক্ষে একবার দেখলাম। বুড়ো সোখা। সেসন জজের আদালতের ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে আমরাও রায় শুনলাম—বুড়ো সোখার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

স্টীফান হোরোকে দেখতাম—বোর্ডিংয়ের বাগানে একটা বুড়ো বটের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে সময় অসময় শুধু দোল খায়। দুলে দুলে যেন এক দুঃসহ গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিচ্ছে স্টীফান হোরো।

নন-কো-অপারেশনের ঝড় বইল সারা দেশে। আমরা স্কুল ছাড়বো। জালিয়ানওয়ালাবাগের অপমান আমরা যতটা বুঝেছিলাম তাতেই যথেষ্ট অশান্ত হয়ে উঠেছিলাম।

আমরা বাঙালী আর বেহারী ছেলের স্কুল ছাড়লাম। রাজার ছেলেরা কেউ ছাড়লো না। খৃস্টান ছেলেরাও নয়—টুডু টিগ্‌গা বেসরা খালখো কেউ নয়। আমরা পিকেটিং করে ওদের বাধা দিতে লাগলাম।

আমাদের খুব ভরসা ছিল, হোরো আমাদের দলে আসবে। ফাদার লিগুন যেভাবে ওকে অপমান করেছেন, জীবনে সে আর কোন দিন পাদরী বা সাদা চামড়াকে সহ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমরা স্কুলের ফটকে পিকেটিং করছিলাম। দেখলাম হোরো আসছে। —স্বতন্ত্র ভারত কি জয়! জয়ধ্বনি করে আমরা হোরোকে অভ্যর্থনা জানালাম।

হোরো এগিয়ে এসে ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল, পরেশের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বনশূয়রের মত গোঁ গোঁ করে পথ করে নিয়ে ক্লাশে গিয়ে ঢুকলো।

সেইদিন হোরোকে আমরা ভাল করে চিনলাম। পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলী হোরো। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষকে চিনলো না, একটু শ্রদ্ধা করলো না। চিনলো শুধু ওর জঙ্গলটাকে। কিন্তু তোর জঙ্গলটা যে ভারতবর্ষের মধ্যেই রে বনবৃষ। ভারতবর্ষের বাইরে তো নয়।

আট বছর পরের কথা। আমি লেপো থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। সকাল বেলায় ক'জন বিরসাইট মুণ্ডা এসেছে হাজিরা দিতে। জেল থেকে আজই ওরা খালাস পেয়েছে। এখানে হাজিরা দিয়ে তারপর নিজের নিজের ডিহিতে চলে যাবে। বিরসাইটরা অত্যন্ত সন্দেহভাজন জীব। প্রতি বছর হাঙ্গামা বাধায়। পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে। জঙ্গল আইন মানে না, মহাজনদের পিটিয়ে তাড়িয়ে

দেয়, চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে চায় না। বাজারে বসলে তোলা দেবে না। জমি ক্রোক করতে গেলে আদালতের পেয়াদাকে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দু'বছর আগে একবার স্বরাজ ঘোষণা করেছিল বিরসাইট মুণ্ডারা। পাদরীকে মেরেছে, পুলিশকে মেরেছে, অনেকগুলি পুল ভেঙেছে। ওরমানঝির জঙ্গলে একটা খণ্ড-যুদ্ধ হয়েছিল ওদের সঙ্গে।

সবচেয়ে শেষে হাজিরা লেখাতে যে লোকটা উঠে এল তার নাম রুন্নু হোরো।

ডায়েরীর ওপর থেকে চোখ তুলে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। তার মাথার চুলের জংলী খোঁপাটাও জটার চূড়ার মত হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলাফলের মালা, আদুড় গা, কোমরে ছোট একটি কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাঁসার বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু এক জোড়া সুশাণিত আধুনিক চোখ……।

বিস্ময় চাপতে গিয়ে, তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম—স্টীফান হোরো।

লোকটা ম্লানভাবে হেসে বললো।—না না ঘোষ, আমি রুন্নু হোরো।

—তুমি একজন বিরসাইট ?

—আমি বিরসা ভগবানের শিষ্য।

—বিরসা ভগবান ? সে কে ?

—সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। আমি তাঁকে চোখে দেখি নি, আমার বাবার মুখে তাঁর কথা শুনেছি। ইংরেজের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদীর মত মরে গেছে আমাদের বিরসা ভগবান। তাঁর চেহারা দেখতে কেমন ছিল জান ঘোষ ?

—কেমন ?

—যীশু খ্রীস্টের মত।

একটু চুপ করে থেকে হোরো বললো—আমাদের জঙ্গলে বাইরে থেকে অনেক

পাপ এসে ঢুকেছে, ঘোষ। তাই বিরসা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ কি ভুলতে পারি?

আমি ডাকলাম। —স্টীফান হোরো······

হোরো প্রতিবাদ করলো। —বল, রুনুঢ় হোরো।

চুপ করে গেলাম। হোরো নিজে থেকেই খুশি হয়ে নানা খবর জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলো। —ইন্দু কোথায়? পরেশ কি করছে?

চারদিকে একবার সাবধানে তাকিয়ে নিয়ে হোরোকে প্রশ্ন করলাম—এত রোগা হয়ে গেলে কেন হোরো?

হোরো—আমার টি. বি. হয়েছে। আচ্ছা, এবার যাই আমি।

একটা কথা জানবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করছিল। তবু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। শেষে সাহস করে বলেই ফেল্‌লাম। —একটা খবর জানতে বড় ইচ্ছে করছে স্টীফান।

স্টীফান।—বল।

জিজ্ঞাসা করলাম—চিরকি মুরমু কোথায়?

স্টীফান শান্তভাবে উত্তর দিল—ও; জান না বুঝি? ফাদার লিণ্ডনের মিশনে চলে গেছে চিরকি। খৃস্টান হয়েছে। এখন হাজারীবাগের কনভেণ্টে থাকে।

স্টীফানের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ একবার চিক চিক করে উঠলো, তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতই, কিন্তু জলে ভেজা। আর কোন কথা জিজ্ঞেস করা হলো না, স্টীফানও নিঃশব্দে চলে গেল।

কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মত মনের মধ্যে বিঁধছিল। হয়তো আমরাই নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে স্টীফানকে হারিয়ে দিলাম, স্টীফানও বনবাসে চলে গেল।*

* লেখক প্রণীত 'মণিকর্ণিকা' গল্পগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ১৩৫১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'মন্দিরা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ভারতবর্ষের লোকের নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) পরিচয় দিতে গিয়ে অনেক পণ্ডিত দ্রাবিড়, আর্য ও কোলারীয় ইত্যাদি কতগুলি কথা বংশবাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটা পুরাতন প্রথা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিকও নয়। দ্রাবিড় বা আর্য বলতে কোন বিশিষ্ট নরবংশ বোঝায় না। ঐ কথাগুলি ভাষাবাচক অর্থেই ঠিক। বলতে পারা যায়, দ্রাবিড়ভাষী বা আর্যভাষী গোষ্ঠী ইত্যাদি। শোণিত ও আবয়বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতের মানুষকে বিচার করলে কয়েকটি মৌলিক নরবংশের (Race) পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিক ফন আইকস্টেট (Von Eickstedt) ভারতের মানুষকে তিনটি নরবংশগত বর্গে ভাগ করেছেন: (১) বেদ্দা বর্গ (Weddid Group)—যাহা হলো প্রাচীন ভারতবাসী। (২) মেলানীয় বর্গ (Melanid Group)—যারা হলো কৃষ্ণকায় ভারতবাসী এবং (৩) হিন্দ্ বর্গ (Indid Group)—যারা হলো আধুনিক বা নতুন ভারতবাসী।

ফন আইকস্টেট ভারতের অধিবাসীর নৃতাত্ত্বিক বর্গবিভাগের যে সব সংজ্ঞা তৈরী করেছেন, সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষা থেকে ভিন্ন। সংজ্ঞাগুলি নিতান্ত দেশীয় এবং এর কোন প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীর মনুষ্যজাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দেবার মত যে সব পারিভাষিক বর্গবিভাগ আছে, তার দ্বারাই ভারতের আদিবাসীদের পরিচয় প্রকাশ করা যায়, কারণ আদিবাসীরা পৃথিবীর মনুষ্যজাতির একটা অংশ। আদিবাসীরা যদি নিতান্ত ভারতের মাটিতেই উদ্ভূত মানুষ হতো, তবে আইকস্টেটের দেওয়া সংজ্ঞাগুলির বিশিষ্ট একটা অর্থ হতো। কিন্তু সেটা তো ঐতিহাসিক সত্য নয়; প্রাচীন পৃথিবীতে কোন নরবংশ স্থাণু হয়ে ছিল না, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষের স্রোত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে। মনুষ্যজাতির ইতিহাস বলতে গেলে মানুষের শোণিতের পৃথ্বী-পরিক্রমার ইতিহাস। সেই জন্য সাধারণভাবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নৃতত্ত্বগত পরিচয় যে পরিভাষার সাহায্যে দেওয়া হয়ে থাকে, ভারতের আদিবাসীর পরিচয় সম্পর্কে সেই পরিভাষা প্রযোজ্য।

ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষার সাহায্যে ভারতের আদিবাসীদের যে নৃতাত্ত্বিক বর্গবিভাগ করেছেন এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাই বিবৃত হলো।

(১) প্রোথো-অস্ট্রেলয়েড (Proto-Australoid) :

আইকস্টেট যে বংশকে বেদ্দীয় (Weddid) নাম দিয়েছেন ডাঃ গুহ তাকেই প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড অর্থাৎ প্রায়-অস্ট্রেলীয় বংশ বলেছেন। সিংহলের বেদ্দা, মধ্য-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী—এই তিন নরবংশের মধ্যে আকৃতিগত যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তার থেকে এই তিন নরবংশকেই একই মূল গোষ্ঠীর মানুষ বলে ধারণা করা হয়েছে, এবং এই মূল গোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিক আখ্যা হলো প্রায়-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। এই তিন নরবংশের মধ্যে ভারতীয় নরবংশ (মধ্য ও দক্ষিণ-ভারত) হলো দৈর্ঘ্যে সব চেয়ে ছোট, বেদ্দারা তার চেয়ে বড় এবং অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা সব-চেয়ে বড়।

সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসী প্রধানতঃ প্রায়-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। শুধু তাই নয়, পশ্চিম-ভারতের আদিবাসীরাও এবং গঙ্গা উপত্যকাবাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও প্রায়-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। মধ্য-ভারতের মালভূমিবাসী ভীল, কোল, বড়াগা, কোরোয়া, খারোয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ এবং মাল পাহাড়িয়া—এরা সকলেই প্রায়-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠী। দক্ষিণ-ভারতের চেঞ্চু, কুরুম্বা, ইয়েরুবা ইত্যাদিও প্রায়-অস্ট্রেলীয়।

এর মধ্যে একটা কথা আছে, উল্লিখিত সকলেই শুদ্ধশোণিত প্রায়-অস্ট্রেলীয় নয়। অনেকের সঙ্গে নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছে এবং সেই কারণে প্রায়-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর এই আদিবাসীদের অনেকের মধ্যে নেগ্রিটো মুখ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ছাপও কিছু পড়েছে।

(২) নিগ্রোবটু (Negrito) :

এরা বৃহত্তর নিগ্রো (Negroid) বংশেরই একটা খর্বতাগ্রস্ত শাখা। খুলির গড়ন এবং আংটির মত কোঁকড়ান চুল এদের বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য হলো—

দৈর্ঘ্যে বামনাকার, ছোট মাথা, ছোট চিবুক, ফোলা কপাল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন হালকা, শরীরের তুলনায় হাত লম্বা, গায়ের রং অত্যন্ত কালো (উদাহরণ, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বুসম্যান ও হটেনটট)। আফ্রিকা ছাড়া নিউগিনি, ফিলিপিন, মালয় এবং আন্দামানে নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে নিগ্রোবটু (Negrito) আকৃতির মানুষের ঠিক 'টাইপ' (Type) বা সর্বলক্ষণযুক্ত চেহারা পাওয়া যায় না। সম্প্রতি কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুড়ের পার্বত্য অঞ্চলে সার্ভে করার পর কোন কোন শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যাদের চুল নিগ্রোবটু ধরণের কোঁকড়া ও আংটি-পাকানো। কাডার, পুলাইয়া, ইরুলা ও ইয়ানাড়ি ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীর মধ্যে এই লক্ষণযুক্ত মানুষ দেখা যায়। ডাঃ হাটন আংগামি নাগাদের মধ্যেও এই নিগ্রোবটুসুলভ লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন, রাজমহল পাহাড়ের আদিবাসীদের অনেকের মধ্যে নিগ্রোবটুসুলভ আংটি-পাকানো চুলের নিদর্শন দেখা গেছে।

দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে সম্পূর্ণ নিগ্রোবটু গঠনের কোন গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ না পাওয়া গেলেও, নিগ্রোবটুর ছাপ পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ভারতে প্রাচীনকালে নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর মানুষ ছিল অথবা এসেছিল। কবে এসেছিল তাও বলা যায় না। আজ ভারতে তাদের আর কোন বিশিষ্ট গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব নেই। তারা অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে একদেহে লীন হয়ে গেছে। শুধু এখানে ওখানে ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক লক্ষণের মধ্যে এদের ঐতিহাসিক পরিচয়ের ছিটেফোঁটা দেখা যায়।

(৩) মঙ্গোলীয় (Mongoloid):

অরোমশ, বিরলশ্মশ্রু, চওড়া চোয়াল, চ্যাপ্টা নাক ও ভারি ভুরু—মঙ্গোলীয় আকৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ। মঙ্গোলীয়ের চোখই হলো প্রধান বৈশিষ্ট্য যাকে অনেকে বাদাম-আকৃতির চোখ' (almond-shaped eyes) বলে থাকেন।

ভারতের আদিবাসীদের কয়েকটি গোষ্ঠী মূল মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। এবং পূর্ব-বাঙলাতেই এই গোষ্ঠীর আদিবাসীরা থাকে। মূল মঙ্গোলীয়

বংশের মধ্যে দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দু'টি বিশিষ্ট উপবংশ কল্পনা করা যেতে পারে :—(১) আদি-মঙ্গোলীয় (Palae-Mongoloid) এবং (২) তিব্বতী-মঙ্গোলীয় (Tibeto-Mongoloid)।

আদি-মঙ্গোলীয়েরা বেশী পুরাতন নরবংশ এবং এদের আকৃতিতে মঙ্গোলীয় লক্ষণগুলি খুব পরিস্ফুট নয়। এদের মাথার গড়ন পরিণত মঙ্গোলীয়ের মত গোলাকার নয় বরং মাঝারী থেকে শুরু করে লম্বা গড়নের (Dolichocephalic)। আসামের আদিবাসীদের মধ্যে আদি-মঙ্গোলীয় শোণিতেরই আধিক্য। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তবাসী অনেক গোষ্ঠীও আদি-মঙ্গোলীয় বংশের মানুষ। চট্টগ্রামের চাক্‌মা জাতিও পূর্ব-মঙ্গোলীয় উপবংশের মানুষ, যদিও খুলির আকৃতি ঠিক আসামের আদিবাসীদের মত নয়। চাক্‌মাদের মাথা ছোট ও চওড়া (Brachycephalic)।

তিব্বতী-মঙ্গোলীয়দের মধ্যেই মঙ্গোলীয় লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। সিকিম ও ভুটানের অধিবাসীরাই এই গোষ্ঠীর খাঁটি নিদর্শন। হিমালয়ের উত্তরে বহুদূরবিস্তৃত অঞ্চলে এবং এদিকে নেপালেও তিব্বতী-মঙ্গোলীয়ের ছাপ ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতের আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের জন্য যে কয়েকটি মূল নরবংশের পরিচয় দরকার, তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। নিগ্রোবটু, প্রায়-অস্ট্রেলীয় এবং মঙ্গোলীয়—এই তিন মূল নরবংশের শোণিত ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর দেহ গঠন করেছে। যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তিন মহাদেশবাসী এই তিনটি নরবংশের মানুষ ভারতভূমিতে স্থান গ্রহণ করে আবার নানা ভৌগোলিক ব্যবধানে ভিন্ন-ভিন্নভাবে বিভিন্ন হয়ে নানা গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিকতার কোন যোগাযোগ রাখতে পারে নি। প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্নভাবে সামাজিক পরিণতি লাভ করেছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীই হলো অন্তর্বিবাহচারী (Endogamous) অর্থাৎ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ আচার সম্পন্ন করে থাকে। এক একটি গোষ্ঠী আবার বিভিন্ন গোত্রে (clan) বিভক্ত এবং সগোত্রে বিবাহ আবার নিষিদ্ধ

অর্থাৎ গোত্র হিসাবে আদিবাসীরা হলো বহির্বিবাহচারী (Exogamous)—একই গোত্রের দুই নরনারীর মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। গোত্রের নাম সাধারণতঃ আদিপিতারূপী কোন টোটেমের (জীব বৃক্ষ ইত্যাদি) নাম অনুসারেই হয়ে থাকে।

নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো নরবংশই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী, এ বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিত একমত। দক্ষিণ ভারতে এমন কতগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যাদের 'পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের নিদর্শন' বলা যায়। নীলগিরি পাহাড় এবং নন্নামালাই পাহাড় এবং পূর্ব মহীশূরের অরণ্য অঞ্চলে কুরুম্বার, কালিকার, ইরুলার ও ইয়ানাডি প্রভৃতি গোষ্ঠী অতি প্রাচীন মানুষের শরীরের ধাঁচ আজও তাদের আকৃতির মধ্যে বজায় রেখে চলেছে।

ভারতের প্রায়-অস্ট্রেলীয় নরবংশের গোষ্ঠীগুলি এবং নিগ্রোবটু নরবংশের গোষ্ঠীগুলির উভয়ের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে আকৃতিগত সামঞ্জস্য আছে এবং অসামঞ্জস্যও আছে। দৈহিক উচ্চতা, মাথার গড়ন, চওড়া চ্যাপ্‌টা নাক, পুরু ঠোঁট এবং কৃষ্ণ বর্ণ—এই কয়টি লক্ষণ উভয়ের মধ্যেই আছে।

কিন্তু প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের কপাল এবং ভুরু নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু-সুলভ ছেলেমানুষী গড়নের মত নয়। প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নিগ্রোবটুদের মত হাল্কা ধরণের নয়। উভয়ের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট পার্থক্য হলো—প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের মাথার চুল আংটি-পাকানো কোঁকড়া (Frizzly) নয়। প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের চুল ঢেউ-খেলানো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুঞ্চিতও (curly) বটে, কিন্তু স্প্রিংয়ের মত আংটি পাকানো (spirally coiled) নয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের থেকে ভারতের প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের দৈহিক লক্ষণের একটা ছোট পার্থক্য আছে—অস্ট্রেলীয় আদিমেরা রোমশ চেহারার, ভারতের প্রায়-অস্ট্রেলীয়েরা সাধারণতঃ রোমবিরল। কতগুলি ভারতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আবার রোমশতাও দেখা যায়।

শিক্ষাসমস্যার বাস্তব রূপ

ভারতের আড়াই কোটি আদিবাসী আধুনিক শিক্ষার (Education) ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর সমাজ। শুধু শিক্ষার কথাই বা বলি কেন, সাক্ষরতা (Literacy) বলতে যা বোঝায় তাও এদের মধ্যে অতি অকিঞ্চিৎ। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা বা উদ্যোগ সরকারী তরফে হয় নি। হেলাফেলা করে দু'এক ক্ষেত্রে সামান্য কিছু চেষ্টা হয়েছে। বেসরকারীভাবে অর্থাৎ খৃস্টান মিশনারী এবং কয়েকটি দেশীয় সেবাসমিতির উদ্যোগে অঞ্চলবিশেষে কতগুলি স্কুলের প্রতিষ্ঠা অবশ্য হয়েছে, কিন্তু এই সব জ্ঞানের প্রদীপ এত অল্পসংখ্যক যে তাতে আদিবাসীর মনের অন্ধকার দূর করতে পারে নি, পারা সম্ভবও নয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, অশিক্ষার সমস্যাটা সমস্ত ভারতবাসীরই সমস্যা। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষার বারি আকণ্ঠ পান করবার সুযোগ এযাবৎ পেয়েছে—এটা সত্য নয় এ বিষয়ে তারা আজও তৃষিত হয়েই আছে। আদিবাসীদের সম্পর্কে বলা যায়, অন্যের তুলনায় এ বিষয়ে তারা সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত—প্রায় নির্জলা উপবাসী।

১৯৩১ সালের ৭৬,১১,৮০৩ জন আদিবাসীর লিখনপঠনক্ষমতা সম্বন্ধে হিসাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে মাত্র ৪৪,৩৫১ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সাক্ষরতার হার হলো শতকরা ০'৫৮ মাত্র ১৯৩১ সনের একটা হিসাব :

প্রদেশ	যত সংখ্যক আদিবাসী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়	যত সংখ্যক লিখনপঠনক্ষম লোক পাওয়া যায়	শতকরা
(১) আসাম	৯,৯২,৩৯০	১৪,০৯৪	১'৪
(২) বাঙ্গলা	৫,২৮,০৩৭	৩,৮৭৪	০'৭
(৩) বিহার-উড়িষ্যা	২০,৪৮,৮০৯	১১,৮৩৪	০'৫
(৪) মধ্য-প্রদেশ	১৩,৫১,৬১৫	৬,৭৬৯	০'৫

১৯২১ সালের সেন্সাসে হিসাব পাওয়া গিয়েছিল—প্রতি হাজারে কত্‌কারি গাষ্ঠীর লোকের মধ্যে ৩ জন এবং প্রতি হাজার ভীলের মধ্যে ৪ জন লিখনপঠনক্ষম পুরুষ আছে।

ঐ সালের সেন্সাসে কয়েকটি অতি অনগ্রসর হরিজন শ্রেণীর সাক্ষরতার হিসাব পাওয়া যায়—মহরদের মধ্যে হাজার করা ২৩ জন এবং ভাঙ্গিদের মধ্যে হাজার করা ৬৫ জন লিখনপঠনক্ষম। হরিজন সমাজের তুলনাতেও আদিবাসী সমাজ কত নিরক্ষর, তার প্রমাণ এই হিসাবের মধ্যেই রয়েছে।

ভীল সমাজ খুবই হিন্দুত্বপ্রাপ্ত এবং কৃষিপ্রবণ গোষ্ঠী। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তারা অতি অবনত ভাঙ্গি হরিজনদের চেয়ে লিখনপঠনক্ষমতায় গুণ বেশী অবনত। তাই অমৃতলাল ঠক্কর লিখেছেন—"১৯২৪ সালে মধ্য ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে কোন দেশীয় রাজ্যে, যে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ভীলদের দ্বারা অধ্যুষিত, সেখানেও আমি দেখেছি যে, ভীলেদের মধ্যে প্রতি ১৩ হাজারে ১ জন মাত্র লিখনপঠনক্ষম অর্থাৎ সাক্ষরতার পরিমাণ হলো শতকরা শূন্য।"

আদিবাসী অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে ব্যয় মঞ্জুর করেন, তা অতি নগণ্য। জিলার স্কুলগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার যে ব্যবস্থা আছে, তা স্কুলের সংখ্যা হিসাবে করা হয় না। জিলা হিসাবে একটা নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। কোন জিলায় যদি অনেকগুলি নতুন স্কুলের পত্তনও হয়, তবে সেই অনুপাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবার রীতি নেই। কাজেই কোন জিলায় স্কুলের সংখ্যা বাড়লে নির্দিষ্ট আর্থিক সাহায্যের পরিমাণও বেশী করে ভাগ হয়ে যায় ও প্রত্যেকের ভাগ্যে যা পড়ে সেটা খুবই কম। সাইমন কমিশন মন্তব্য করেছিলেন—'বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়া সব প্রদেশে একটা রীতি দেখা যাচ্ছে—জিলা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে জিলার শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট করতে পারেন, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সেই পরিমাণের সঙ্গে অনুপাত রেখে জিলা কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। যে জিলা নিজস্ব আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষার জন্য বেশী খরচ করতে পারে, তাকেই প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট

আনুপাতিক হিসাবে বেশী সাহায্য দিয়ে থাকেন। যে জিলার আর্থিক সামর্থ্য কম এবং সেই অনুসারে শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থও কম, সেই জিলা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আনুপাতিক হিসাবে কম সাহায্য পায়। এইভাবে, অনগ্রসর অঞ্চলগুলি বস্তুতঃ তাদের দারিদ্র্যের অপরাধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কম সাহায্য পাচ্ছে।"

এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থাসম্পন্ন বিহার-উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টও কমিশনের কাছে এক মেমোরেণ্ডামে বলেছিলেন—"প্রদেশের সাধারণ অধিবাসীদের তুলনায় আদিবাসীরা ১৯২১ সালে যতখানি লিখনপঠনক্ষম ছিল, বর্তমানে (১৯২৯ সালে) আদিবাসীরা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় রয়েছে। প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণভাবে যে প্রসার হয়েছে, তাতে আদিবাসীরা তাদের প্রাপ্য অংশের কিছু কমই লাভ করেছে। মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে তারা উচিত প্রাপ্যের অনেক কম পেয়েছে।"

মধ্য স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজ—এই তিনটি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের মধ্যে আজও প্রসার লাভ করে নি। আসামের খাসি ও ছোটনাগপুরের মুণ্ডা এবং ওঁরাওদের মধ্যে অবশ্য কিছুসংখ্যক লোক আছেন যাঁরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।

আসামের আদিবাসী সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

আসামের আদিবাসী সমাজ ভারতের অন্যান্য অংশের আদিবাসী থেকে ভাষায় ও চেহারায় পৃথক। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভব এই গিরিবাসী সমাজকে 'কালি প্রজা' (Black Race) বলা যায় না। এদের দেহের বর্ণ কালো নয়, সুগৌরও নয়; বরং পীতাভ বলা যেতে পারে। এদের শরীরের গঠন মজবুত, এরা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী; মনের দিক দিয়ে সাধারণত আনন্দপ্রবণ ও নির্ভীক।

আসামের ভৌগোলিক শরীরের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে, তার মধ্যে তিনটি অস্থিরেখার মত তিনটি সুবিস্তৃত গিরিভাগ আছে। (১) ব্রহ্ম সীমান্তসংলগ্ন গিরিশ্রেণী—সিংফো (কাচিন), নাগা, কুকি ও লুসাই গোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত। (২) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুর্মা উপত্যকার মধ্যবর্তী গিরিশ্রেণী—গারো, খাসি ও ডিমাসা (পাহাড়ী কাছাড়ী) প্রভৃতি গোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত। (৩) তিব্বত-সীমান্তসংলগ্ন হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালু—মিশ্‌মি, আবোর, মিরি, দাফলা ও আকা প্রভৃতি গোষ্ঠী দ্বারা অধ্যুষিত। এ ছাড়া (৪) আসাম উপত্যকার নওগাঁ ও শিবসাগর জিলার মধ্যবর্তী অনুচ্চ গিরিশ্রেণী—মিকির গোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত।

আসামের আদিবাসী বা উপজাতির সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আরম্ভ হয়। ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে তার অনেক আগেই বৃটিশ-সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। ভারতের অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলের সঙ্গে আসামের আদিবাসী অঞ্চলের আর একটা ঐতিহাসিক পরিণামের তারতম্য আছে। ভারতের অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থা প্রবেশ করার যে পথ পেয়েছে, আসামের পার্বত্য উপজাতির সংসারে প্রবেশ করতে সে রকম সুগম পথ পাওয়া সম্ভব হয় নি। এই অঞ্চল যেমন ভৌগোলিক অর্থে দুর্গম, এই অঞ্চলের উপজাতির মনস্তত্ত্বও তেমনি দুর্গম। এমন কি কোন

কোন অঞ্চলে এখন পর্যন্ত কোন বৃটিশ বা ভারতীয় সার্ভেয়ারের অথবা মিলিটারী শাসন অফিসারের পদচিহ্ন পড়ে নি।

অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলের মত আসামের আদিবাসী অঞ্চলও আংশিক বা সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলরূপে খাস গভর্ণরী শাসনের অধীন। প্রধানত গোষ্ঠীগত লোকাচার ও রীতির অনুশাসনকেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের "ম্যাজিস্ট্রেট" কানুন হিসাবে গ্রহণ ক'রে এই উপজাতীয় সমাজের ওপর একটা শিথিল শাসন-ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আসামের বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক শাসনিক ও সামাজিক পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল।

(১) **বলিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল** : উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে ভুটান, দক্ষিণে সমতল আসাম, পশ্চিমে সুবনসিরি অঞ্চল। পূর্বে সুবনসিরি অঞ্চল বলিপাড়া অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, ১৯৪৩ সালে পৃথক করা হয়। বলিপাড়া পলিটিক্যাল অফিসারের পরিচালনাধীন। এই অঞ্চলের উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তিব্বতীয় সংস্কৃতি খুবই প্রসারলাভ করেছে। বর্তমান তিব্বতের প্রচলিত তন্ত্রপ্রধান বৌদ্ধধর্মই স্থানীয় উপজাতিদের ধর্ম। পরিচ্ছদেও তিব্বতীয় রীতি। প্রধান উপজাতির নাম মোন্‌বা। তিব্বতীদের প্রাধান্য খুব বেশী। উত্তর বলিপাড়া সেদিন পর্যন্ত একরকম তিব্বতীদের দখলেই ছিল। মোন্‌বা, খোওয়া, সেনজিত্‌হোনজি প্রভৃতি উপজাতি তিব্বতী সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। সিলুং, লামাই এবং নিস্থ (দাফলা) ইত্যাদি কয়েকটি উপজাতি গোষ্ঠীগত বিশিষ্ট ধর্ম অনুসরণ করে।

(২) **সুবনসিরি (সুবর্ণ শ্রী?) অঞ্চল** : অঞ্চলের অধিকাংশই বিদেশীর পক্ষে অগম্য হয়ে আছে এবং ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত তথ্য জানা যায় না। আসামের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। সুবনসিরি উপজাতি ব্যবসার সম্পর্কে তিব্বতের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছে। আপাতানি নামে এই অঞ্চলের একটি প্রধান উপজাতির সম্পর্কে কিছু বিবরণ

সম্প্রতি জানা গেছে ; কারণ তারা সমতলের সঙ্গে একটা সামান্য সম্পর্কের সূত্র গ্রহণ করেছে। লবণ ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস সংগ্রহের জন্য আপাতানি সমাজের লোক শীতকালে সমতলে এসে থাকে। আপাতানিদের গ্রামগুলি বৃহৎ ও জনবহুল ; একটি গ্রামে হাজারখানেক গৃহও দেখা যায়।

(৩) **সদিয়া সীমান্ত অঞ্চল ঃ** সুবনসিরি নদী থেকে সুরু করে তিরাপ সীমান্ত অঞ্চলের উত্তর সীমা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের পশ্চিমার্ধে আবর উপজাতির বাস। কিছু কিছু তিব্বতী সংস্কৃতিসম্পন্ন (Tibetanised) মেম্বা উপজাতিও এই অঞ্চলে আছে। আবর-অধ্যুষিত অঞ্চলকে বৃটিশ সরকারী ভাষায় সিয়াং উপত্যকা সাব-এজেন্সী আখ্যা দেওয়া হয়েছে (Siang Valley Sub-Agency)। শাসন ব্যাপার জনৈক অ্যাসিস্টেণ্ট পলিটিক্যাল অফিসারের অধীন। আবরদের গ্রামগুলি বৃহৎ ; এদের স্বভাব যুদ্ধপ্রিয়। সিয়াং উপত্যকার মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা পেয়ে তিব্বতী কর-সংগ্রাহকের (Tax-Collector) দল এ অঞ্চলে পূর্বে খুবই বেশী তৎপর ছিল, বর্তমানে আসাম গভর্ণমেণ্ট এই অনধিকার প্রবেশ অনেকখানি রুদ্ধ করতে পেরেছেন।

এই অঞ্চলের পূর্বার্ধে প্রধানত মিশমি উপজাতির বাস। এ ছাড়া সামান্য-সংখ্যক তিব্বতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন মাইয়ি উপজাতি পূর্বাংশে আছে, আর আছে সমতল এলাকার সামান্যসংখ্যক শান (Shan) উপজাতির লোক, যাদের স্থানীয় ভাষায় বলে হকামপ্তি (Hkampti)। মিশমি সমাজ চারিদিকে ছড়ানো ছোট ছোট গ্রামে থাকে। দিবাং উপত্যকায় ইদু মিশমি নামক গোষ্ঠীর সামাজিক পরিচয় খুব কমই জানা যায়। এদের মধ্যে গোষ্ঠীবিরোধ খুবই প্রবল, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর সঙ্ঘর্ষ প্রায়ই হয়ে থাকে এবং সেই কারণে সামাজিক ঐক্যও সম্ভব হয় নি। পূর্বাঞ্চলের মিশমিদের সঙ্গে আসামের কিছু যোগাযোগ আছে, কারণ এই অঞ্চলের লোহিত উপত্যকা তিব্বত ও আসামের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যপথ। প্রতি বৎসর তিব্বতী সদাগরের শত শত বোঝাবাহী ভৃত্য আসামে আসে ও পণ্যদ্রব্য বহন করে তিব্বতে নিয়ে যায়।

(৪) **লখিমপুর সীমান্ত অঞ্চল :** এই ক্ষুদ্র 'বহির্ভূত' অঞ্চল আসামের অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের মত নয়। লখিমপুরের পাহাড়ী এলাকার ও সমতল এলাকার সমাজ ও সমস্যা একই রকম। লখিমপুর জিলার ডিপুটি কমিশনারই এই সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। অধিবাসী প্রধানত কাছাড়ী উপজাতি। এ ছাড়া আছে মিরি উপজাতি।

(৫) **তিরাপ সীমান্ত অঞ্চল :** বর্মার সীমান্তসংলগ্ন এই অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো—এর ভৌগোলিক পূর্ব সীমানা এখন পর্যন্ত অনির্দিষ্ট হয়েই আছে। বর্তমান ভারত গভর্ণমেণ্ট নাগা উপজাতির সমস্ত গোষ্ঠীকে আসামের অধিবাসীরূপে অন্তর্ভুক্ত করে সমস্ত এলাকার একটা সীমা সুস্থির করবার পরিকল্পনা করেছেন, যাতে বর্মার সঙ্গে সীমান্তরেখা নিয়ে কোন অস্পষ্টতা না থাকে। তিরাপ সীমান্ত অঞ্চলের প্রধান তিনটি উপজাতি হলো :

(ক) চিংপ কাচিন—এরা বর্মার পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসে এখানে বসতি করেছে। ধর্মে বৌদ্ধ এবং পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে বর্মার কাচিনদেরই মত।

(খ) ইয়োগলি, লোংচাং ইত্যাদি উপজাতি—এরা নাগা গোষ্ঠীর দূরাপসৃত কয়েকটি শাখা। এরাও কাচিন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত।

(গ) কোনিয়াক নাগা—নাগা উপজাতি সমাজের মধ্যে এই কোনিয়াক গোষ্ঠীই হলো সবচেয়ে প্রধান ও শক্তিশালী গোষ্ঠী। ৭০ বছর আগে কোনিয়াক নাগাদের অঞ্চল একবার সার্ভে করা হয়েছিল। এদের নিজস্ব একটা সুগঠিত গোষ্ঠীশাসন-পদ্ধতি আছে। গোষ্ঠীপতিরা আংগ নামে পরিচিত। আংগের ওপরে আবার বড় আংগ আছেন, তেমনি সহকারী আংগও আছেন। অতীতে আহম রাজাদের সঙ্গে কোনিয়াক নাগা সমাজ অনেক যুদ্ধ ও সন্ধি করেছে। এদের গ্রামগুলি বৃহৎ; গৃহরচনা ও গৃহসজ্জায় এদের শিল্পরুচি আছে।

তিরাপ সীমান্ত অঞ্চল একজন পলিটিক্যাল অফিসারের পরিচালনায় আছে।

(৬) **নাগা পাহাড় :** নাগা পাহাড়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগা উপজাতি বাস করে। অঞ্চলের শেষ দক্ষিণে থাডো কুকি গোষ্ঠীর বাস। নাগা সমাজে যদিও

গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বই স্বীকৃত, কিন্তু তবুও গোষ্ঠীগত শাসনব্যবস্থায় কিছুটা গণতান্ত্রিকতা আছে। অঞ্চল ডেপুটি কমিশনারের পরিচালনাধীন। *

(৭) **উত্তর কাছাড় পাহাড়ঃ** যদিও এই অঞ্চল ভৌগোলিকভাবে নাগা পাহাড়েরই অংশ, কিন্তু শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য এই অঞ্চলকে পৃথকভাবে কাছাড় জিলার ডেপুটি কমিশনারের পরিচালনায় রাখা হয়েছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা হলো :

(ক) জেমি নাগা, থাডো কুকি—এরা পাহাড়ের পূর্বাঞ্চলে থাকে।

(খ) ডিমাসা কাছাড়ী—এরা মধ্য অঞ্চলে থাকে। অতীতে আহমদের চাপে কাছাড়ী নামে আখ্যাত গোষ্ঠী আসাম উপত্যকা ছেড়ে কাছাড়ে চলে যায়। কাছাড় পাহাড়ের ডিমাসা কাছাড়ীরা স্থানচ্যুত হয় নি। ডিমাসা কাছাড়ীরা হিন্দুসংস্কৃতিসম্পন্ন এবং ধর্মেও এদের হিন্দুত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে।

(গ) পশ্চিমে বিভিন্ন কুকি গোষ্ঠীর বাস, কিছু আরলেং (মিকির) গোষ্ঠীও আছে।

(৮) **লুসাই পাহাড়ঃ** এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত লুসাই নামে অভিহিত, যারা উপজাতি হিসাবে কুকি সমাজেরই বিভিন্ন গোষ্ঠী, নিকটবর্তী চিন পাহাড়ের (বর্মার অন্তর্গত) অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। অধিকাংশ খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যাও বেশী। এ অঞ্চলেও গোষ্ঠীপতিদের মারফৎ শাসনব্যবস্থা চালিত হয়ে থাকে। আসামে যে-কোন উপজাতি অঞ্চলের তুলনায় লুসাই পাহাড়ের উপজাতিদের মধ্যে সামাজিক সংহতি সবচেয়ে বেশী।

(৯) **গাড়ো পাহাড়ঃ** প্রধান অধিবাসী গারো।

(১০) **খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ঃ** প্রধান আদিবাসী খাসি।

* নাগা জাতীয় পরিষদ (Naga National Council) বর্তমান নাগা সমাজের বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কয়েকজন ইংরাজী-শিক্ষিত নাগা নেতার পরিচালনায় এই পরিষদ নাগাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন।

(১১) **মণিপুর দেশীয় রাজ্য ঃ** মণিপুরের জনবহুল উপত্যকায় মণিপুরীদের বাস। চারদিকে উপজাতি-অধ্যুষিত পাহাড়ের বৃত্ত। উপত্যকাবাসী মণিপুরীদের সঙ্গে এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের কোন সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য নেই। সমগ্র মণিপুর রাজ্যের আট ভাগের সাত ভাগ হলো পাহাড়ী অঞ্চল। উপত্যকাবাসী মণিপুরীদের তুলনায় পাহাড়ী উপজাতিরা সংখ্যায় অল্প, অর্থাৎ পাহাড়ীরা সমগ্র রাজ্যের জনসংখ্যায় পাঁচ ভাগের দু'ভাগ মাত্র। উপত্যকাবাসী খাস মণিপুরী সমাজ হলো হিন্দু, শিক্ষিত ও উন্নত সমাজ। পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা নাগা গোষ্ঠী এবং কুকি গোষ্ঠী—যারা হয় খৃস্টান নয় গোষ্ঠীগত ধর্মাচারী।

১৯১৮ সালে কুকি বিদ্রোহ হয়। তারপর থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের পাহাড়ী এলাকায় শাসনদায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মণিপুর দরবারের হাতে ছেড়ে না দিয়ে, দরবারের সঙ্গে সমভাবে পরিচালনার জন্য নিজ প্রতিনিধি (পলিটিক্যাল অফিসার) নিয়োগ করেন।

অতীতকাল থেকেই একটা প্রথা চলে আসছে—বলিপাড়া পাহাড় অঞ্চলের উপজাতিরা সমতলবাসী গ্রামগুলির উপর কতকগুলি ক্ষমতার ও দাবীদাওয়ার অধিকারী ছিল। আহম রাজারাও উপজাতিদের এই অধিকার মেনে নিয়েছিলেন। আসাম ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হওয়ার পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও উপজাতিদের এই প্রাচীন অধিকার স্বীকার করে নেন এবং এই সমস্ত অধিকারের বিনিময়ে মূল্য হিসাবে বাৎসরিক বৃত্তি দেবার চুক্তি অথবা সন্ধি করেন। এই বৃত্তির নাম 'পোষা'। উপজাতিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বাৎসরিক 'পোষা' পেয়ে থাকে। ওদিকে তিব্বত গভর্ণমেণ্ট আবার বলিপাড়া পাহাড়ী অঞ্চলকে তাঁদের অধিকারভুক্ত এলাকা বলে দাবী করতে থাকেন। এ বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও তিব্বত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মন-কষাকষির অনেক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। ১৯১৪ সালে তিব্বত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ব্রিটিশ (ভারত) গভর্ণমেণ্টের চুক্তি হয়ে একটা মধ্যবর্তী সীমারেখা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়, যার নাম ম্যাকম্যাহন লাই (McMahon Line)। কিন্তু তিব্বতীরা এই লাইনের মর্যাদা প্রায়ই উপেক্ষা

করে থাকে এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের এলাকায় এসে অনধিকার প্রবেশ ও অনধিকার চর্চাও করে। ব্রিটিশ ভারত গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে সতর্কতার জন্য এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে রক্ষীবাহিনী বসিয়েছেন।

সুবনসিরি এলাকায় কতকগুলি নিস্থ (দাফ্‌লা) উপজাতির গ্রামও 'পোষা' পেয়ে থাকে। সদিয়া সীমান্ত অঞ্চলে আবর উপজাতিরা পূর্বে প্রায়ই আক্রমণ করতো। আবরদের সায়েস্তা করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বার বার শাস্তিমূলক অভিযান (Punitive Expedition) করেন। সিয়াং উপত্যকায় গত ত্রিশ বছর ধরে স্থায়ীভাবে আসাম রাইফেল্‌স্‌ বাহিনীকে রাখা হয়েছে। এর দ্বারা যেমন একদিকে আবরদের সংযত করা হয়েছে, অপরদিকে তিব্বতী কর-সংগ্রাহকদের আনাগোনাও বন্ধ করা হয়েছে। লোহিত উপত্যকাতেও তিব্বতীদের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করার জন্য রক্ষীবাহিনী রাখা হয়েছে।

তিব্বত সীমান্তসংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে বলা হলো। এ ছাড়া বর্মা সীমান্তসংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলের সমস্যার ইতিহাস কতকটা একই রকমের। বর্মার দিক থেকে অতীতে পর পর আহম, শান ও কাচিনেরা এসে আসামের পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে। শানেরা সতের শতাব্দীতে প্রবেশ করে ও সদিয়া এবং তিরাপ অঞ্চলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। কাচিনেরা মাত্র গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে আসে এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র নাগাগোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে।

আহম রাজত্বকালে কোনিয়াক নাগারাও কতগুলি বিশেষ দাবী আদায় করতো। নাগারা যেন সমতলের গ্রামগুলির ওপর লুঠ ও আক্রমণ না চালায় তার জন্য আহম রাজারা নাগাদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করে একটা চুক্তি করেছিলেন। এই বৃত্তির নাম 'খত'। খত প্রথা অনুসারে নাগারা আহম রাজাদের কাছ থেকে সমতল অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি লাভ করতো, ঐ জমির চাষী প্রজার কাছ থেকে নাগারা খাজনা আদায় করে নিত। এই প্রাচীন খত প্রথাটা মাত্র কয়েক বৎসর আগে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক আর্থিক বৃত্তিতে পরিণত করেছেন।

আসাম ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হবার পরেও আংগামি নাগারা সমতল অঞ্চলে তাদের ঐতিহ্যগত আক্রমণের অভ্যাস বজায় রেখে চলেছিল। ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোহিমাতে একটি শাসনকেন্দ্র কায়েম করেন। আংগামি নাগারা এই শাসনকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার ও তাঁর কর্মসঙ্গী সকলকেই হত্যা করে। এর পর আংগামি নাগাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয় ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভাল করেই প্রতিশোধ তুলে নেয়।

আও নাগারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে মুণ্ডশিকার প্রথা বর্জন করেছিল। ব্রিটিশ অনুরক্ত এই আও গোষ্ঠীকে পূর্বদিক থেকে এসে চাং উপজাতি গোষ্ঠী আক্রমণ করে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আওদের সুরক্ষার জন্য উদ্যোগ করেন এবং সেই থেকেই মোকোকচুং সাব-ডিভিসনের উৎপত্তি। তারপর থেকে নাগা পাহাড়ের পূর্বাঞ্চলে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শাসন ক্রমবিস্তারিত হয়ে চলেছে।

প্রাচীন কাছাড়ী রাজশক্তি লুপ্ত হয়ে যাবার পর উত্তর কাছাড় পাহাড়ের উপজাতীয়দের ওপর নাগা উপজাতীয়দের আক্রমণ চলতে থাকে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট উত্তর কাছাড় পাহাড়কে দখলে আনবার পর এই আক্রমণের ইতিহাসও শেষ হয়েছে।

লুসাই পাহাড়ের লুসাইদের পূর্বপুরুষেরা বর্মার চীন পাহাড় থেকে এসেছিল (১৭৫০—১৮৫০)। স্থানীয় উপজাতীয়েরা যদিও আগন্তুক লুসাইদেরই সমগোত্র ছিল, কিন্তু নবাগত লুসাইরা তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে থাকে। লুসাইরা ক্ষান্তিহীনভাবে কাছাড়, ত্রিপুরা রাজ্য ও চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের ওপর হানা দিতে থাকে। ১৮৯০—৯৫ সালে লুসাইদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান করা হয় এবং সমস্ত লুসাই পাহাড় অঞ্চলটিকে ব্রিটিশ দখলে আনা হয়।

আসামের আদিবাসীদের সম্বন্ধে যেটুকু ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যের উল্লেখ করা হলো, তার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঘটনা হিসাবে এবং সমস্যা হিসাবে, আসামের আদিবাসীর জীবন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীর জীবন থেকে কতকগুলি ব্যাপারে পৃথক।

(১) আসামের মানচিত্রে অঙ্কিত এবং সরকারীভাবে ঘোষিত সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত এই অঞ্চলগুলিকে ভারতের অন্যান্য বহির্ভূত অঞ্চলের মত বস্তুত সমগ্রভাবে ব্রিটিশ ভারত গভর্ণমেণ্টের বিশেষ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয় নি। অঞ্চলগুলির কোন কোন অংশে বিশেষ শাসন-ব্যবস্থা (অর্থাৎ খাস গভর্ণরী শাসন) প্রচলিত হয়েছে, কোন কোন অংশে উপজাতীয়েরা নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা নিয়েই রয়েছে। ব্রিটিশ-শাসিত ও গোষ্ঠীগত শাসিত এলাকার মধ্যে কোন সীমারেখা স্থিরীকৃত নেই।

(২) কাছাড়ী সমাজ ছাড়া আসামের উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দুত্বপ্রাপ্তির (Hinduisation) আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং উত্তর অঞ্চলে তিব্বতীয়ত্ব ও একেবারে পূর্বাঞ্চলের বর্মীত্বের প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে দেখা যায়।

(৩) ভারতের অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলে সমতলবাসীকে (অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয়) যে কারণেই হোক্ আদিবাসীর ওপর মহাজনী ও জমিদারী করে বস্তুত শোষক শ্রেণী (Exploiter) হিসাবে পরিণত হতে দেখা গেছে। আসামের আদিবাসী সমাজের উপর সমতলবাসী সাধারণ ভারতীয় ও হিন্দু এতটা অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি।

(৪) আসামের উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক হানাহানির (Inter-tribal Feuds) ব্যাপার এখনও যেন সামাজিক ঐতিহ্য বা লোকাচারের মত রয়ে গেছে। ভারতের ছোটনাগপুর, মধ্যভারত বা মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি আদিবাসী অঞ্চলে ঐ রকম গোষ্ঠীগত অন্তর্যুদ্ধ হয় না।

আদিবাসী সমাজে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব

পুরাণের আর্য রাজারা মাঝে মাঝে এক একজন প্রতাপশালী কিরাত রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, এ কাহিনী আমরা শুনেছি। সুতরাং ঐ কিরাত রাজার যে একটা রাজত্বগোছের কিছু ছিল, তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি। মহাভারতে অনেক অনার্য রাজত্বের সংবাদ পাওয়া যায়।

ভারতের আদিবাসী সমাজে প্রাচীনকালে 'রাজা' ছিল এবং আজও যে নেই তা নয়। অপেক্ষাকৃত নিকট অতীতের ইতিহাসেও দেখতে পাই, বহু আদিবাসী রাজবংশ (Dynasty) এক একটা পার্বত্য অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রজাশাসন করেছে। ঐশ্বর্যে ও সম্পদে সমতল অঞ্চলের রাজাদের তুলনায় এই আদিবাসী রাজবংশগুলি যদিও সমান নয়, কিন্তু তার জন্য তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা তুচ্ছ হয়ে যায় না।

আদিবাসী রাজা, রাজাত্মীয়, গোষ্ঠীপতি সর্দার ইত্যাদি নিয়ে প্রাচীনকালে একটা অভিজাত আদিবাসী সমাজ (Aristocracy) ছিল। আজও সেই অভিজাত সমাজ লুপ্ত হয় নি, বরং বলতে পারা যায় নতুন রূপ গ্রহণ করেছে, যেমন প্রাচীন ভারতীয় অভিজাত সমাজের পুরাতন রূপ বদ্‌লে গিয়ে আধুনিককালে নতুন রূপ গ্রহণ করেছে।

কারা এই আদিবাসী অভিজাত সমাজ? ভীল সর্দার, নাগা সর্দার, গন্দ রাজা, বিঁঝোয়ার ও ভুইয়া জমিদার, কোবুকু ভদ্রলোক, সাঁওতাল ও ওঁরাও নেতা, শিক্ষিত মুণ্ডা অফিসার—শিক্ষায় সম্পদে ও রুচিতে এই আদিবাসী অভিজাত সমাজ প্রাচীন অভিজাত সমাজেরই নব কলেবর। কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের (Native States) অধিপতি আদিবাসী মানুষ। শরণগড়ের গন্দ রাজাকে আপনি আজ দেখতে পাবেন, তিনি প্রাসাদবাসী, আধুনিক আসবাবে ও বিলাসোপকরণে তাঁর প্রাসাদ পরিপূর্ণ। তাঁর প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে বসে আজ আপনি আলডুস হাক্সলি, বার্নাড শ' ও মালিনওস্কির গ্রন্থ পড়তে পারেন। তিনি একজন

সুদক্ষ ক্রিকেট ও টেনিস খেলোয়াড়। * শরণগড়ের গন্দ রাজা নিজেকে খাঁটি গন্দ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তাঁর গৃহ গোষ্ঠীগত পবিত্র টোটেম জীব কচ্ছপের মূর্তি দ্বারা বিচিত্রিত। তাঁর আধুনিক প্রাসাদের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে গোষ্ঠীদেবতার পূজা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে এমন অনেক সম্পন্ন ও শিক্ষিত লোকও আছেন যাঁরা পারিবারিক জীবনে আধুনিক বিলাতী আদব কায়দা গ্রহণ করেছেন। আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট ও যোগ্য নেতা দেখা যাচ্ছে। আসামের প্রাক্তন মন্ত্রিসভায় কাছাড়ী আদিবাসী শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম মন্ত্রী ছিলেন। মিস্ মেভিস ডান (Miss Mavis Dunn)—শিক্ষিতা খাসিয়া মহিলা, ইনিও আসামের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। বহু শিক্ষিত খৃস্টান ওঁরাও ধর্মযাজকের ব্রত গ্রহণ করেছেন। রাঁচীর ওঁরাও আদিবাসী রায়সাহেব বন্দীরাম তাঁর স্বসমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান নেতা।

এ ছাড়া সরকারী চাকুরীতে এবং উচ্চ রাজকর্মচারীর পদেও অনেক আদিবাসী আছেন—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মুন্সেফ, সাব-ডেপুটি, পুলিস অফিসার ইত্যাদি। আধুনিক কলেজে শিক্ষিত আদিবাসী অধ্যাপনাও করছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করছেন শিক্ষিত আদিবাসী নেতা। অনেক আদিবাসী স্কুল-টীচারও আছেন।

লেখাপড়া শিখে হাজার হাজার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত দশটা-পাঁচটা অফিসে কেরাণীগিরি করছেন, এমন আদিবাসীও অনেক রয়েছেন। আর আছে—সাধারণ পুলিস, তশীলদার, মোটর ড্রাইভার, মিস্ত্রি, পিয়ন, দোকান-কর্মচারী ইত্যাদি। ছোটনাগপুরের খৃস্টান আদিবাসী মেয়েরা দলে দলে নার্সের কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহ করছে। পরধান গোষ্ঠীর আদিবাসী স্টেশন মাস্টারের কাজ করছেন দেখা যায়। কলকাতার ময়দানে হকি টুর্নামেণ্টে ভারতের বিখ্যাত টীমগুলি প্রতিযোগী আদিবাসী টীমের শক্তি ও দক্ষতার আস্বাদ অনেকবার পেয়েছে। রাঁচী-

* The Aboriginals—Verrier Elwin.

হাজারীবাগের হকি ভারতবিখ্যাত এবং এই খেলা আদিবাসীদের কাছে একপ্রকার জাতীয় খেলা (National Game) হয়ে উঠেছে। ঠিক আধুনিক হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রকম তিনটি অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়, আদিবাসী সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ভোগসুখের সুবিধায় উন্নত হয়ে সেইরকম তিন ভাগে ভাগ হয়েছে—অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী এবং এঁরা সকলেই 'ভদ্রলোক'।

বর্তমান ভারতের বৃহত্তর সংস্কৃতির সম্পর্কে (Culture Contact) পড়েই আদিবাসী সমাজের মধ্যে এইসব নূতন ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে সন্দেহ নেই। এঁদের সমস্যাকে 'আদিবাসী সমস্যা' বললে ভুল হবে, এঁরা ভারতের বিরাট ভদ্রলোক শ্রেণীরই (Middle Class) একটা অংশবিশেষ এবং এঁদের অভাব অভিযোগ ও দাবী বস্তুত ভারতের সাধারণ মধ্যশ্রেণী ভদ্রলোকের অভাব, অভিযোগ ও দাবীর মতই, গুণে ধর্মে একই।

এর পর বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রোপেত ভারতবর্ষের খনি কারখানার দিকে লক্ষ্য করা যাক্। এখানেও ভারতের আদিবাসীকে দেখতে পাই, আধুনিক মজুরের রূপে। টাটানগরের কারখানায় যারা কলকব্জার সঙ্গে কাজ করে, ময়ূরভঞ্জের প্রান্তরে লৌহপ্রস্তর কুড়োয়, ঝরিয়া ধানবাদ ও গিরিডির কয়লাখনির অভ্যন্তরে যারা মাল কাটে আর টব বোঝাই করে, তাদের মধ্যে হাজার হাজার আদিবাসীর শ্রমস্বেদাক্ত মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। পাব্লিক ওয়ার্কসের নতুন সড়কে যারা খোয়া ভাঙছে, ছোটনাগপুরের ছোট ছোট রেলস্টেশনে বাবুসাহেবদের বোঝা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আর আনছে, মাটি খুঁড়ছে আর গাছ কাটছে—সেই নিছক গতর-খাটা দিনমজুর (unskilled labour) হাজার হাজার কুলি ও কামিনের মধ্যে শত শত আদিবাসী নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর আছে :—

"নদীয়ামে আইল বান
পার কর ভগবান
স্বামীর সাথে আসাম চলি যাব"

নৃত্যপরা সাঁওতালী মেয়ের গলায় এই বাঙলা ভাষার ঝুমুর গান আধুনিক সাঁওতাল সংসারের আর একটা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যি সত্যি হাজার হাজার সাঁওতাল মেয়ে স্বামীর সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও আসামের চা-বাগানে মজুরের কাজ করতে চলে গেছে।

সুতরাং, আদিবাসী সমাজ ভারতের বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সংঘাতে পড়ে শুধু যে একটি ক্ষুদ্র ভদ্রলোক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে তা নয়, এদের মধ্যে একটি আধুনিক মজুর শ্রেণীরও উদ্ভব হয়েছে—খনি ও কারখানার কর্মকুশল শ্রমিক (skilled abour), গতরখাটা শ্রমিক (unskilled labour) এবং খামার শ্রমিক (plantation labour)। এ বিষয়ে আদিবাসী শ্রমিকের সমস্যাও ভারতের অন্যান্য সাধারণ শ্রমিকের সমস্যার মতই। সাধারণ ভারতীয় শ্রমিককে যে ব্যবস্থায় জীবিকা অর্জন করতে হয়, তাতে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হানি হয়েছে। আদিবাসী শ্রমিকের সম্বন্ধেও একথা খাটে। আধুনিক মজুর জীবনে আদিবাসী তার গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারছে না।

ভারতের দরিদ্র হিন্দু শ্রমজীবীর সঙ্গে আদিবাসী শ্রমজীবীর একটা মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু শ্রমজীবী পেটের দায়ে ভারত ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে কুণ্ঠিত নয়। মালয়ের রবার বাগান, মরিসাসের আকের ক্ষেত ও চিনির কল, ফিজি, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপিন, ত্রিনিদাদ—কোথায় না গরীব হিন্দু সস্তা মজুর (Cheap Labour) হিসাবে রপ্তানী হয়েছে? কুখ্যাত গিরমিটিয়া প্রথায় (Indentured Labour) ভারতের বাইরে যেসব দরিদ্র ভারতীয় মজুরী করতে গিয়েছিল, তারাও হিন্দু, আদিবাসী নয়।

এই ব্যাপার থেকে একটা ধারণা করা যায় যে, ভারতের প্রাচীনতম সন্তান এই আদিবাসী সমাজের অন্তশ্চেতনায় একটা যেন শিশুসুলভ মায়ের-আঁচলধরা মনোভাব লুকিয়ে আছে, যার জন্যে তারা ভারতের মাটি ছেড়ে দেশান্তরে নতুন মাটির দিকে চলে যেতে প্রলুব্ধ হয় না। হয়তো এটা ধারণা মাত্র, এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। হয়তো এটা তাদের একটা গোষ্ঠীগত প্রকৃতি মাত্র। কিন্তু যাই

হোক্, আদিবাসীরা যে অপরিচিত বিদেশে জীবিকার জন্য চলে যেতে উৎসাহী নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং এই মনস্তত্ত্বের মধ্যে তাদের দেশবোধ বলে যে একটা সত্যসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, সেটাই বড় কথা। বড়জোর বলা যায়, এই দেশবোধ একটা সজ্ঞান সংস্কার নয়। অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার করে নিতে হবে যে, সাধারণ দরিদ্র হিন্দুজনসাধারণের মনে দেশবোধ যতটা সত্য হয়ে উঠেছে, আদিবাসী সমাজের দেশবোধ, অজ্ঞাতসারে হলেও, তার চেয়ে কম সত্য নয়।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে যে ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভবের কথা বলা হলো, সেই শ্রেণীর মধ্যে একটা অংশের মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, সেটা প্রীতিকর নয়। বৃহত্তর ভারতের প্রতি একটা বৈরীভাব এঁদের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা আদিবাসী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারণ এঁরা মনে প্রাণে ও আচরণে 'ভারতীয় ভদ্রলোক' ছাড়া আর কিছু নন। শিক্ষায় ও সম্পদে এঁরা উন্নত। স্বসমাজের প্রতি কোন সেবা বা গঠনমূলক কাজের আদর্শ এদের নেই। স্বসমাজের দরিদ্র জনসাধারণ এঁদের কাছে একটা 'ভোটে'র ভাণ্ডার মাত্র। আদিবাসী সমাজের এই অংশ, যদিও সংখ্যায় এঁরা নগণ্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি ছাড়া আর কিছু প্রচার করতে পারেন নি। এই ভেদবুদ্ধি শেষ পর্যন্ত 'পৃথক ঝাড়খণ্ডের' দাবীতে এসে পৌছেছে।

এই মনোবৃত্তি শুধু যে কয়েকজন শিক্ষিত আদিবাসী নেতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই তা নয়, এটা বর্তমান সমস্যাগ্রস্ত ও পরশাসনপীড়িত ভারতেরই একটা রাজনৈতিক কম্‌প্লেক্স, যা কয়েকজন অত্যন্ত ধনী হরিজন অর্থাৎ অ-বর্ণহিন্দু নেতার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে, যা অনেক মুসলমান নেতার মধ্যে অধঃপতনশীল জেদ-রূপে দেখা দিয়ে পাকিস্থান সম্ভব করে তুলেছে।

আদিবাসী সমাজের যে অল্পসংখ্যক কয়েকজন শিক্ষিত নেতা নিখিল ভারতীয় জাতীয়তাকে শ্রদ্ধা করতে পারছেন না, তাঁদের মনোভাব আমরা বুঝতে পারি। এটা ব্যক্তিগত অভিমানের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় কিয়ৎকালের মধ্যেই হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা শিক্ষিত ও সম্পন্ন ভদ্র-

শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাঁরা তাঁদেরই স্বসমাজের ওপর মোড়লী করে একসঙ্গে ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও স্বার্থোন্নতি দ্বারা আত্মপুষ্টি করেছিলেন। সেই সুখের শ্রেণীশাসনের অধ্যায় ও আভিজাতিক প্রতিপত্তি ঐতিহাসিক কারণেই ভেঙ্গে পরিবর্তিত হতে চলেছে। ইংরাজাধীন ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজই এই প্রতিপত্তিশালী মধ্যশ্রেণী সবচেয়ে আগে সৃষ্টি করেছিল এবং হিন্দুসমাজই সবচেয়ে আগে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এ অবস্থা চলতে পারে না। এই উপলব্ধিই হিন্দুকে বৃহত্তর জাতীয়তা বা ভারতীয়তার আদর্শে চালিত করেছে। কয়েকজন সম্পন্ন ও শিক্ষিত আদিবাসী একটা ক্ষুদ্র আভিজাতিক শ্রেণী হয়ে দেখা দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু বড় দেরীতে দেখা দিয়েছেন। কারণ ইতিমধ্যেই শ্রেণীপ্রতিপত্তির অপ্রিয় অধ্যায়কে পেছনে ফেলে গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ভারতবর্ষে শুরু হয়ে গেছে। নতুন আদিবাসী, অ-বর্ণহিন্দু ও মুসলমান অভিজাত এবং মধ্যশ্রেণী (Middle Class) সেইভাবে এগিয়ে যেতে চান না। হিন্দু অভিজাত ও মধ্যশ্রেণী অনেক দিন আগে থেকেই যে অপকর্মটি করে আসছিলেন (অর্থাৎ সমাজের উপর তাঁদের শ্রেণীগত প্রতিপত্তি), এই সব পাকিস্থান ও ঝাড়খণ্ডের দাবীদার সাম্প্রদায়িক নেতারা সেই অপকর্মটি করবার সুযোগ চাইছেন। এবং এটাকেই তাঁরা গণতান্ত্রিক দাবী বলে মনে করছেন। একটা সম্পন্ন শ্রেণী হয়ে স্বসমাজের ঘাড়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের কাঁঠাল ভাঙবার সুযোগ পাওয়া চাই। তাঁদের এ সুযোগ না দিয়ে ভারতবর্ষ যদি জাতীয় সাধারণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তবে সেই ইতিহাসকে তাঁরা খুসী মনে গ্রহণ করতে পারেন না। পৃথক ঝাড়খণ্ড হলে আদিবাসী সমাজের এই নবোদ্ভূত ক্ষুদ্র মধ্যশ্রেণীটি শাসক শ্রেণীতে (Ruling Class) উন্নীত হতে পারবে, এই সাধের স্বপ্ন কয়েকজন শিক্ষিত আদিবাসীকে ব্যাকুল করে তুলেছে। বৃহত্তর ভারতের গণতান্ত্রিক জাতীয়তার মধ্যে থাকলে এ স্বপ্ন সফল হবার আশা নেই। মিঃ জিন্না, ডাঃ আম্বেদকর এবং মিঃ জয়পাল সিং, এ তিন নেতার মনোবৃত্তি একই প্রতিক্রিয়াপ্রবণ মধ্যশ্রেণীর আধিপত্যবিলাসের আকাঙ্খার দ্বারা গঠিত।

সাম্প্রতিক কালে, অর্থাৎ বস্তুত গণপরিষদে যোগদান করার পর ডাঃ আম্বেদকর ও মিঃ জয়পাল সিংয়ের মনোবৃত্তির মধ্যে একটু পরিবর্তনের হাওয়া যেন লেগেছে মনে হয়। ভারতের প্রতি মিঃ জিন্না যে রকম বহিরাগত অভিযানকারীর (Invader) মত মনোভাব দেখিয়েছেন, ডাঃ আম্বেদকর ও অন্যতম আদিবাসী নেতা মিঃ জয়পাল সিং সেরকম 'বৈদেশিকতা' দেখাতে পারেন নি। অন্তত এই দুই নেতা কংগ্রেসবিরোধী হয়েও রাগের মাথায় তাঁদের জাতীয়তাবোধ বিসর্জন দেন নি। আশা করা যায় আদিবাসী সমাজের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে অল্পসংখ্যক যাঁদের মন এখনো সংশয়াতুর হয়ে আছে, তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন। আদিবাসী জনগণের মনোভাব মোটামুটি অনাবিল আছে, গত নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে প্রায় শতকরা নব্বইটি ভোট দিয়ে আদিবাসী সমাজের জনসাধারণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, অন্য বিষয়ে অনগ্রসর হলেও জাতীয়তাবোধ অথবা ভারতীয়তাবোধ তাঁদের চেতনা স্পর্শ করেছে।

মিঃ এল্‌ুইনের 'ন্যাশনাল পার্ক থিওরী'

সাম্প্রতিক কালে নৃতাত্ত্বিকদের ওপর একটা থিওরীর বড়ই প্রকোপ হয়েছে। রিভার্স (Rivers) নামক বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মেলানেসিয়ার আদিম অধিবাসীদের বংশাবনতির কারণ সম্বন্ধে তাঁর লেখার মধ্যে এই মতবাদ প্রচার করেন যে—উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে মেলানেসিয়ার আদিম অধিবাসীদের জনসংখ্যা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে লুপ্ত হতে চলেছে। তার পর থেকেই নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই মতবাদের ধুয়া প্রবল হয়ে ওঠে—সভ্যতার সংস্পর্শ (culture-contact) আদিম জাতির পক্ষে একটা অকল্যাণের ব্যাপার।

ভারতের আদিবাসীদের শুভাশুভ নিয়ে যেসব ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তাঁদের অনেককে এই সভ্যতা-সংস্পর্শ থিওরীটা খুব জোরে স্পর্শ করেছে। ভারতের আদিবাসীদের সম্বন্ধে এঁরা বলেন, উন্নত সভ্যতার দ্বারা 'আক্রান্ত' হওয়ার ফলেই আদিবাসীরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, মনোবল হারিয়েছে ও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলছে। এঁদের প্রস্তাব, ভারতের আদিবাসীর গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে একেবারে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখা উচিত, যাতে কোন বাইরের বিজাতীয় 'উন্নত' সংস্কৃতির প্রভাব আদিবাসীর সংসারে প্রবেশ না করে। য়ুরোপীয় নৃতাত্ত্বিকদের অধিকাংশই এই প্রসঙ্গে হিন্দু-সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই এক হাত নিয়েছেন। দু'এক জন দুঃসাহস করে খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে মিঃ ভেরিয়ের এলুইন (Mr. Verrier Elwin) নামক নৃতাত্ত্বিক ভদ্রলোক এই থিওরী নিয়ে বড় বেশী মুখর হয়ে উঠেছেন। তাঁর গর্ব, তিনি দশ বৎসর ধরে গন্দ সমাজে বাস করছেন, সেজন্য তাঁর মতন অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি ক'জনেরই বা আছে? তিনি এরই মধ্যে ভারতের আদিবাসীদের সম্বন্ধে অনেকগুলি ছোট বড় গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন। প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি প্রমাণ

করবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতের আদিবাসী সমাজ সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। আদিবাসী সমাজকে তাদের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখবার জন্য তিনি এক পরিকল্পনাও বিবৃত করেছেন—ন্যাশনাল পার্ক (National Park) পরিকল্পনা।

যেসব আদিবাসী উন্নত সভ্যতাকে পরিহার করে দূরে সরে থাকতে পেরেছে তাদের সম্বন্ধে মিঃ এলুইন একটা বর্ণনা দিয়েছেন।

"খাঁটি আদিবাসীরা ('true aboriginals') অর্থাৎ যেসব আদিবাসী সভ্যতার দূষিত সংস্পর্শে আসে নি, তারা নিরীহ ও সুখী মানুষ। স্বাভাবিক আনন্দের ঐশ্বর্যে ভরপুর······তাদের জীবন স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন (free and happy)। মাথার ওপর বোঝা নিয়ে আদিবাসী নারী হয়তো ক্ষণিকের জন্য পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নীচের শোভাময় দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে থাকে······পুরুষেরা কাঠ কাটে, মেয়েরা পাতা কুড়োয়, বৃদ্ধেরা মাদুর ও ডালা তৈরী করে, ছেলেরা মাঠে মাঠে পাখী আর ইঁদুর তাড়া করে বেড়ায়।······হঠাৎ বাঁশীর রবে সুর উথ্‌লে ওঠে, কুঞ্জতরুর আড়ালে আড়ালে প্রেমিকার গান প্রেমিককে আহ্বান করতে থাকে। ······সন্ধ্যে হয়ে আসে। ঘরে ফিরে সকলে মহুয়ার চাটুনি আর পেট ভরে টাট্‌কা তালের রস খেয়ে শরীর জুড়িয়ে নেয়। তারপর নৈশ ভোজন। গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে আসে, শুধু মাঝে মাঝে গ্রামের ঘুমঘরে (Dormitory) কিশোর-কণ্ঠের কলরব এবং আগুনের চারিদিকে বসে বৃদ্ধদের বিশ্রম্ভালাপের চাপা ধ্বনি শোনা যায়। এই প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যেও এক একটা উত্তেজনার অধ্যায় আসে, হাতি ও বাঘের সঙ্গে সংঘর্ষ। বৎসরগুলি বিবাহের উৎসবে ও নৃত্যে মাতোয়ারা।······ছেলেমেয়েরা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে, চুলে ফুল গুঁজে দল বেঁধে নাচে, প্রবীণেরা দেবতার তুষ্টি বিধান করে"—(The Aborignals P. 19)।

খাঁটি পাহাড়ী আদিবাসীর সংসারের যে রূপ মিঃ এলুইন বর্ণনা করেছেন, সেটা কোন আধুনিক মেঘদূতের কাব্যময় বিবরণের অংশ বলে মনে হবে।

বর্ণনাটির প্রতি ছত্রে মধু ক্ষরন্তি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এমন মধুময় আদিবাসী গ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এভাবে বর্ণনা করা নৃতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাজে না, এটা সখের টুরিস্টের মত অতিরঞ্জিত অলঙ্কারবহুল বর্ণনা। যেসব আদিবাসী পাহাড় ও অরণ্যের দুর্গম নিভৃতে বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত জীবন যাপন করছে, তাদের জীবনে কোন সমস্যাই নেই—এমন অভিমত মিঃ এলুইনের আত্মপ্রসন্নতা মাত্র।

স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবন (Free Life) বলতে তিনি কি বোঝেন? গোষ্ঠী-গত সর্দারের শাসন কি নিতান্তই অটোক্রাসি-বর্জিত? গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের রীতিনীতি কি সত্যই বিশুদ্ধ সাম্যবাদ অথবা গণতন্ত্র? আর শুধু হাসি কলরবই কি কোন সমাজের সুখ নির্ণয়ের একটা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি? মাঠে মাঠে ইঁদুর তাড়া করে বেড়াবার অবাধ অধিকারই কি ব্যক্তিস্বাধীনতার (Civil Liberty) চরম উদাহরণ?

আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে যেসব আদিবাসী দূরে সরে রয়েছে, তাদের সমাজে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ অবশ্যই আছে যা ভারত-সভ্যতা-প্রভাবিত আদিবাসীদের মধ্যে নেই। কিন্তু আবার এর উল্টোটাও সত্য। ভারত-সভ্যতার সংস্পর্শে যেসব আদিবাসী এসেছে তারাও এমন কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ অর্জন করেছে যা মিঃ এলুইনের আনকোরা আদিবাসীদের মধ্যে নেই।

তবুও যেসব আদিবাসী ভারত-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেবেই মিঃ এলুইন শঙ্কাকুল হয়েছেন। তাঁর মতে এই শ্রেণীর আদিবাসী সমাজেরই মনোবল ভেঙ্গে গেছে ও ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়েছে। মিঃ এলুইন আদিবাসীর এই বিনষ্ট মনোবলের একটা নামও দিয়েছেন—স্নায়বিক হানি (loss of nerve) অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে একটা ঔদাসীন্য। আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। বেঁচে থাকার যে একটা অর্থ আছে, সে সম্বন্ধে চিন্তার অভাব। মিঃ এলুইনের মতে উন্নত বিজাতীয় সংস্কৃতির সংঘাতে পড়ে গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এদের জীবন যেন ভূমিকাভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তার ফলেই মনের এই শোচনীয় দশান্তর ঘটেছে।

সুতরাং মিঃ এলুইন বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবী করেছেন। এই দাবীর বিষয়গুলিই হলো এলুইন ভাষ্যের এক একটি সূক্ত এবং ন্যাশনাল পার্ক থিওরীর ভিত্তি। মিঃ এলুইন চাইছেন :

(১) আদিবাসীর 'ঝুম' চাষের অধিকার।

আদিবাসীদের এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার পদ্ধতি এখনো গ্রহণ করে নি। জঙ্গলের একটা অংশ আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে, তারপর সেই ভস্মাচ্ছাদিত জমির ওপর আলগোছে শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হলো ঝুম চাষ। আশ্চর্যের বিষয়, এই অতি ক্ষতিকর এবং স্থূল কৃষিপদ্ধতিকেই মিঃ এলুইন আদিবাসীর সকল উন্নতির মূলাধার বলে মনে করেন। তিনি বলেন, ঝুম চাষ হলো আদিবাসীদের একটা ধর্মগত সংস্কার। আদিবাসীরা ধরিত্রী মাতার বুক লাঙ্গল দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চায় না। লাঙ্গল-প্রথা তাদের কাছে ভয়ানক একটা নিষ্ঠুর প্রথা।

কিন্তু জঙ্গল হলো একটি রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সম্পদ এবং এই জঙ্গলও একটা অনন্ত রাজ্য নয়, নষ্ট করলে একদিন ফুরিয়ে যাবে নিশ্চয়। কয়েক মণ জওয়ার, ভুট্টা বা ধান উৎপন্নের জন্য এক একটা শাল-সেগুনের জঙ্গলকে ছাই করে ফেলতে হবে, এই প্রথা বর্তমান জগতে চলতে পারে না। ঝুমচাষী আদিবাসীর পক্ষেও এভাবে জঙ্গল লোপ করা মঙ্গলকর নয়। কিন্তু মিঃ এলুইন আদিবাসীর প্রাচীন মনের একটা সংস্কারের মর্যাদা রাখতে গিয়ে, এক একটা খাণ্ডবদাহন করেই কয়েক মণ জওয়ার পেতে চান। আদিবাসীদের ঝুম চাষ প্রথার ফলে ভারতের জঙ্গলের কি ক্ষতি হয়েছে, তা ভারত গভর্ণমেন্টের সরকারী রিপোর্টে এবং বহু বিশিষ্ট য়ুরোপীয় নৃতাত্ত্বিকের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

ফরসাইথ (Forsyth) বলেন—"যত পাহাড়ী উপজাতি আছে তার মধ্যে বৈগারা হলো জঙ্গলের সবচেয়ে ভয়ানক শত্রু। হাজার হাজার বর্গমাইল শালের বনকে তারা ঝুম চাষের জন্য নিঃশেষে ধ্বংস করেছে।......আঠা (Gum) নেবার জন্য তারা সর্বত্র বড় বড় গাছগুলি ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।......লাক্ষার গুটি

সংগ্রহের জন্য তারা একটু কষ্ট করে গাছের ওপর চড়তেও চায় না, গাছগুলিকেই কেটে মাটিতে নামিয়ে ফেলে।"

অথচ মিঃ এলুইন এই বৈগাদেরই ধর্মগত সংস্কারের চ্যাম্পিয়ন। বহু আদিবাসী গোষ্ঠী আছে যারা পূর্বে ঝুম প্রথায় অভ্যস্ত ছিল পরে লাঙ্গল-প্রথা গ্রহণ করেছে। কিন্তু উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করে তারা অবনত হয়েছে, মিঃ এলুইন কোনভাবেই তা প্রমাণ করতে পারেন না। চট্টগ্রামের চাক্‌মারা পূর্বে ঝুমচাষী ছিল, বর্তমানে তারা লাঙ্গল গ্রহণ করেছে, উড়িষ্যার শবর ঝুম চাষ ছেড়ে দিয়ে উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এর ফলে তাদের কোনই অবনতি হয় নি। এ বিষয়ে মিঃ এলুইন দুর্বল যুক্তি নিয়ে প্রবল তর্ক করেছেন। আবার একথাও স্বীকার করেছেন যে, সব আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে নয়, কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে (দৃষ্টান্ত—বৈগা) ঝুম চাষ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি। তাঁর বক্তব্য—

"To many of the tribesmen this is more than a form of agriculture, it is a way of life."

অর্থাৎ অনেক আদিবাসীর কাছে ঝুম চাষ নিছক একটা চাষের পদ্ধতি নয়, এটা তাদের জীবনচর্যার পদ্ধতি। মন্তব্যটি বিচিত্র। অর্থনৈতিক উন্নতি যে সামাজিক মনেরও উন্নতি সম্ভব করে, মিঃ এলুইন বোধ হয় এই সরল বৈজ্ঞানিক সত্য স্বীকার করেন না। ঝুম চাষ না করে লাঙ্গল-প্রথা গ্রহণ করলে তাঁর প্রিয় বৈগাদের ভাণ্ডারে বরং একটু বেশী পরিমাণ ফসল আসবে। কিন্তু এরই ফলে বৈগাদের জীবনচর্যার পদ্ধতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, এরকম বিচিত্র ধারণা বোধ হয় মিঃ এলুইন একাই পোষণ করেন। ঝুম চাষ হলো, কুসংস্কার অজ্ঞতা আলস্য ও অপরিণামদর্শিতার পদ্ধতি। এ পদ্ধতি কোন আদিবাসীর জীবনচর্যার পদ্ধতি (way of life) হতে পারে না।

মিঃ এলুইন যতই বলুন, ঝুম চাষ আদিবাসীদের জীবনচর্যার পদ্ধতি নয়। এ পদ্ধতি তারা সুযোগ পেলে সহজেই ছেড়ে দেয় ও নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে।

বালাঘাট জেলায় যেসব খালসা গ্রাম ও জমিদারী অঞ্চল আছে সেখানে ঝুম চাষ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু জেলার অন্যান্য স্থান থেকে বৈগারা এই বন্য অঞ্চলে বসতি করার জন্য ছুটে আসে না। (১)

মহীশূরের কতগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী, গুজরাটের কোলি গোষ্ঠী, থানা জিলার ঠাকুর গোষ্ঠী, খান্দেশের ভীলেরা—এঁরা সকলেই আগে ঝুমচাষী ছিল, কিন্তু বর্তমানে লাঙ্গল-চাষী হয়ে গেছে।

মিঃ এলুইনের মত মিঃ গ্রীগসন ঝুম চাষকে আদিবাসীর জীবনেরই একটা পদ্ধতি বলে যদিও মনে করেন নি, কিন্তু তিনিও ঝুম চাষকে ক্ষতিকর পদ্ধতি নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ঝুম চাষ ক্ষতিকর কি না, এ সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক বা ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর বিজ্ঞতাকে আমল না দিয়ে, সত্যিকারের উদ্ভিদবিজ্ঞানীর অভিমতকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

(ক) উড়িষ্যার কনজারভেটর অব ফরেস্ট মিঃ নিকলসনের অভিমত: "ঝুম চাষের ফলে জঙ্গলের নিদারুণ ক্ষতি হয়।" (২)

(খ) ডাঃ এন. এল. বোর (N. L. Bore), দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের বোটানিস্ট: "মানুষের যত রকম প্রথা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কদর্য হলো ঝুম চাষ প্রথা।……এর ফলে শুধু বনের উদ্ভিজ্জ সম্পদ নষ্ট হয় তা নয়, মাটির উর্বরাংশও ক্ষয় হতে থাকে (erosion of soil)"। (৩)

(গ) ডাঃ হাটন: "সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে বেওয়ার প্রথা (ঝুমচাষ —shifting cultivation) আর্থিক উন্নতির বিরোধী এবং সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। অবশ্য অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণে অতি সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ অঞ্চলে ঝুম চাষের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।" (৪)

(১) The Aboriginal Problem in the Balaghat District—Grigson.
(২) Report of the Partially Excluded Areas Committee, Orissa.
(৩) ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯তম অধিবেশনে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ
(৪) Modern India & The West—O' Malley.

শরৎচন্দ্র রায় ছোটনাগপুরের বিরহোর এবং কোরোয়াদের বিষয়ে অবশ্যই এই মন্তব্য করেছেন যে, তারা পূর্বে ঝুম চাষে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু সরকারী জঙ্গল বিভাগের আইন অনুসারে জঙ্গল পুড়িয়ে ঝুম চাষ নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে এবং মনোবল নিতান্ত অবনত হয়ে গেছে। তারা যেন জীবন সম্বন্ধে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে ('loss of interest in life')। মিঃ এলুইন বারংবার শরৎচন্দ্র রায়ের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর 'স্নায়বিক হানি' (loss of nerve) থিওরীকে সমর্থনের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু বিরহোর ও কোরোয়াদের মধ্যে জীবন সম্বন্ধে যে উৎসাহহীনতা দেখা যাচ্ছে, সেটা ঝুম চাষ বর্জনের জন্য হয় নি। তারা একেবারেই চাষ বর্জন করে প্রায় প্রস্তরযুগের অধম মানুষের মত ক্ষুধার্ত যাযাবরে পরিণত হয়েছে। চাষ বর্জন করাটাই হলো এই অধোগতির প্রধান কারণ, চাষের ঝুমত্ব বর্জন করাটা প্রধান কারণ নয়। বিরহোর ও কোরোয়ারা ঝুম প্রথা বর্জন করে লাঙ্গল প্রথা গ্রহণ করলে নিশ্চয় 'জীবন সম্বন্ধে উৎসাহহীনতা' দেখা দিত না। গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাটাও একপেশে হয়েছে। বিরহোরদের ঝুম যেমন বন্ধ করা হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের লাঙ্গল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করিয়ে নেবার কোন সরকারী ব্যবস্থা হতো, তবে এই দুটি গোষ্ঠীকে হতভাগ্য হতে হতো না। সরকারী ব্যবস্থায় শুধু দমনের কাজটুকুই পালিত হয়, গঠনের দিকে কিছুই করা হয় না। কাজেই পরিবর্তনের ব্যাপারটাও অর্ধপথে থেমে থাকে।

সভ্য-সংস্পর্শের (culture-contact) ফলে আদিম উপজাতির বংশবিনাশ হয়, ভারতবর্ষের আদিবাসীর অতীত ও বর্তমানের দিকে তাকিয়ে রিভার্স সাহেবের এই থিওরী সমর্থন করা যায় না। আসামের খাসি সমাজ প্রভৃতি যেসব আদিবাসী উপজাতি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে, তাদের জনসংখ্যার হ্রাস হয় নি। হিন্দুভাবাপন্ন আদিবাসী সমাজেরও বংশ বিনাশ হয় নি। এ প্রসঙ্গে ডাঃ ডি. এন. মজুমদারের একটা মন্তব্য বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি সিংভূমের কোলহান অঞ্চলের হো সমাজ সম্বন্ধে বলেছেন—'আগের তুলনায় হো সমাজ

বর্তমানে বেশী অল্পায়ু ও দুর্বলদেহ হয়েছে, কিন্তু পূর্বপুরুষের তুলনায় বর্তমানে বংশবৃদ্ধির হার বেশী (multiplying faster than their ancestors)"। (৫)

কোন শ্রেণী বা উপজাতির বিনাশ অথবা জনসংখ্যার হ্রাস যে ভারতবর্ষে আদৌ হয় নি, তা নয়। হিন্দুসমাজের অনেক অবনত জাতের (caste) মধ্যে বংশাবনতি দেখা যায়, সেটা অর্থনৈতিক কারণেই হয়েছে। ভারতের কোন আদিবাসী গোষ্ঠীরও যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, তবে সেটা মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণেই হয়েছে।

(২) **আদিবাসীর মদ্যাসক্তি অবাধ হয়ে থাকুক্।**

মিঃ এলুইন গভর্ণমেণ্টের আবগারী নীতি পছন্দ করেন না, কারণ তার দ্বারা গভর্ণমেণ্ট আদিবাসীদের একটা জাতীয় অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। আদিবাসীরা চিরকাল নিজের ঘরের তৈরী মদ্য পান করে এসেছে। গভর্ণমেণ্টের আবগারী নীতি বস্তুত মদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাকে গভর্ণমেণ্টেরই একচেটিয়া (State Monopoly) করে দিয়েছে।

আদিবাসীদের মদ্যপানের অভ্যাস সংযত হোক্, মিঃ এলুইন তা স্পষ্ট ক'রে কামনা করেন না। আদিবাসীদের পানোন্মত্ততার এবং তার ফলে তাদের যেসব নৈতিক ও শারীরিক হানি হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে মিঃ এলুইন নীরব। তিনি আদিবাসীদের মদ্যাসক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করতে পারেন নি। তাঁর দুঃখ, আবগারী বিভাগ আদিবাসীর মদ্যপানের স্বাধীনতায় বাধা দিচ্ছে।

ভারতীয় সমাজ সংস্কারকেরা মদ্যপান বর্জন সম্পর্কে যে আন্দোলন করেন, মিঃ এলুইন সেটা একটা অত্যাচার বলেই মনে করেন। বাদলশা ভাই নামে জনৈক ভীল সমাজ সংস্কারক তাঁর স্বসমাজ থেকে মদ্যাসক্তির পাপ বর্জন করার জন্য প্রচারকার্য করেছিলেন। মিঃ এলুইন তাঁর ওপর খুবই খাপ্পা হয়েছেন। কংগ্রেস ও জাতীয় নেতারা মাদক বর্জনের জন্য যে প্রচারকার্য করেন, মিঃ এলুইন তাতেও বিরক্ত।

(৫) A Tribe in Transition—D. N. Majumdar.

আদিবাসীদের উৎসবে পানোন্মত্ততা বড় বেশী দেখা যায়। এদের উৎসবের দিনগুলিও হিন্দুর উৎসবের মত পঞ্জিকাবিহিত তিথি নক্ষত্র বা তারিখ দ্বারা নির্দিষ্ট নয়। অধিকাংশই ঋতু-উৎসব (seasonal festival), একবার আরম্ভ হলো তো চলতেই থাকলো। যাতে এই ধরণের উৎসবের আতিশয্যে আদিবাসীরা মাত্রাহীন পানোন্মত্ততার গ্রাসে না পড়ে, তার জন্যে বে-সরকারী সমাজসংস্কারক এবং সরকারী কর্তৃপক্ষও সাধারণত দুটি উপায় প্রস্তাব করে থাকেন। হয় উৎসবের দিনগুলি সুনির্দিষ্ট করা হোক্, নয় উৎসবের সময় মদের দোকানগুলি বন্ধ করা হোক্। একদিন বা দু'দিনের মধ্যেই যদি উৎসব সমাপ্ত হয় তবে পানোন্মত্ততাও এক বা দু'দিনের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যায়। মিঃ এলুইন আদিবাসীদের পানোন্মত্ততা সংযত করার এই দুটি পন্থার কোন পন্থাই গ্রাহ্য করতে রাজী নন। তাঁর বক্তব্য হলো, আদিবাসীদের 'প্রাণের উৎসাহ' যতদিন পর্যন্ত সজীব থাকবে ('as long as the spirit moves him') ততদিনই সে তার দশেরা আর ফাগ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে থাকুক। তিনি উৎসবের দিন সীমাবদ্ধ করতে চান না, কারণ তাতে আদি-বাসীদের প্রাণের উৎসাহ সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। মিঃ এলুইনের প্রস্তাবে বস্তুত এই দাবীই করা হচ্ছে যে, উৎসবপরায়ণ আদিবাসী দিনরাত্রি মদ্যপান করে চলুক যতক্ষণ পর্যন্ত মদের হাঁড়িতে তার চুমুক দেবার শক্তি আছে। আদিবাসী দরদী মিঃ এলুইন যে আদিবাসীর জন্যে এই ধরণের প্রগল্ভতার সুপারিশ করতে পারেন, এটাই আশ্চর্য। পানোন্মত্ততা শেষ পর্যন্ত উৎসবপরায়ণ আদিবাসী নরনারীর যৌনশুচিতাকে কি ভাবে নষ্ট করে থাকে, দশ বৎসরের অভিজ্ঞ আদিবাসীতত্ত্ববিশারদ মিঃ এলুইনের পক্ষে সেই তথ্য না জানার কথা নয়। কিন্তু তিনি এবিষয়ে নীরব।

পূর্বে সাঁওতালদের 'সোরাই' উৎসবও কোন দিন তারিখের মধ্যে বাঁধা ছিল না। কিন্তু সাঁওতাল সমাজ বর্তমানে সোরাই উৎসবের সময় সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। এর ফলে সাঁওতাল সমাজের প্রাণের উৎসাহ যে আদৌ সংক্ষিপ্ত হয়নি, সেকথা মিঃ এলুইনের জানা উচিত।

(৩) শিক্ষার প্রসারে আদিবাসীর ক্ষতি হয়।

আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে যে রীতিতে শিক্ষার প্রচার হচ্ছে, মিঃ এলুইন সেটা পছন্দ করেন না। বর্তমান শিক্ষা আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত সংহতি, ঐতিহ্য ও রুচি বিনষ্ট করছে বলেই তিনি মনে করেন। আধুনিক স্কুলে শিক্ষালাভ করে আদিবাসীরা বিজাতীয় (হিন্দু) সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান ভারতে সাধারণ ভারতবাসীর জন্য যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত, সেটা যে ত্রুটিপূর্ণ সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। বর্তমান স্কুল আদিবাসীর ছেলেকে যেমন অপদার্থে পরিণত করে থাকে, ভারতীয় কৃষকের ছেলেকেও তাই করেছে। সমস্যাটা সমগ্র ভারতের জাতীয় সমস্যা। কিন্তু এর জন্যে মিঃ এলুইনের কল্পনা অনুসারে আদিবাসীর শিক্ষাপদ্ধতিকে সমগ্র ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে তৈরী করতে হবে, এমন কোন্ যুক্তি আছে? আদিবাসীর গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির সৌন্দর্যগুলি যাতে নষ্ট না হয়, অবশ্যই তাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সেদিক দিয়ে বিশেষ রীতি কিছু কিছু থাকবে। কিন্তু মিঃ এলুইনের মত আদিবাসীর প্রত্যেকটি প্রাচীন কুসংস্কারকে চিরস্থায়ী করার জন্য নিশ্চয় কোন শিক্ষাপদ্ধতি গৃহীত হতে পারে না। পৃথিবীর আকার গোলকের মত, কোন্ শক্তির আকর্ষণে পাকা আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে, গৌতম বুদ্ধ কে ছিলেন এবং হিমালয় পর্বত নামে যে একটা পর্বত আছে—আদিবাসী ছেলেকে এই তথ্য জানালে তার 'গোষ্ঠীগত সংহতি' ('tribal solidarity') নষ্ট হয় না, 'স্নায়বিক হানি'ও (loss of nerve) হয় না।

মিঃ এলুইন অভিযোগ করেছেন—আধুনিক স্কুলগুলিতে আদিবাসী ছেলেরা পড়তে এসে শহুরে শিক্ষিত অ-আদিবাসী শিক্ষকের হাতে পড়ে। এই শিক্ষকেরা আদিবাসী ছেলেকে 'অসভ্য' বলেই মনে করেন। আদিবাসী ছেলেরা স্কুলের অন্যান্য ছেলের সঙ্গে নাকিসুরে বিজাতীয় দেবতার স্তোত্র পাঠ করতে শেখে। তাদের নিজ দেবতার কথা ভুলে যায়। স্কুলে হিন্দু খৃস্টান ও মুসলমান পরবের ছুটি

আছে, কিন্তু আদিবাসী পরবের জন্য ছুটি দেওয়া হয় না। আদিবাসী ছেলেরা ভারতীয় লিবারাল নেতা ও ইংরাজ বড়লাটের জীবনী পাঠ করে, কিন্তু গন্দ রাজাদের ইতিহাস পড়ে না। বিদেশী (হিন্দী) ভাষায় শিক্ষালাভ করতে হয়।

মিঃ এলুইনের বক্তব্যের অনেকখানিই সত্য। কিন্তু তার জন্যে আদিবাসীকে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখা অথবা হিন্দু ইত্যাদি উন্নত জাতির সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন প্রমাণিত হয় না। প্রয়োজন শিক্ষার সংস্কার। গন্দ রাজাদের ইতিহাস না পড়লে আদিবাসী ছেলের শিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি ভারতীয় লিবারাল নেতাদের জীবনী পাঠ না করলেও তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকবে। দুটোরই প্রয়োজন আছে। মিঃ এলুইন গন্দ রাজাদের ইতিহাসকেই আদিবাসী ছেলের কাছে একমাত্র ইতিহাসরূপে উপস্থিত করতে চান। এটাই তাঁর বক্তব্যের মূলগত ভ্রান্তি, এবং এখানেই আমাদের আপত্তি।

(৩) পরিচ্ছদ ধারণের অভ্যাস—ধুতি শাড়ি জামা।

মিঃ এলুইন চান না যে, আদিবাসীরা সাধারণ ভারতীয়ের মত (অথবা য়ুরোপীয়ের মত) ধুতি শাড়ি বা কোটপ্যাণ্টালুন ইত্যাদি আধুনিক পরিচ্ছদ পরিধান করে। তিনি আদিবাসীকে চিরন্তন কৃষ্ণচর্মের নগ্নতায় সজ্জিত ('the eternally dressed nakedness of the brown skin') দেখতে চান। তিনি দুঃখ করেছেন—জঙ্গলের জীবন থেকে মুরিয়া আর ওঁরাও ছেলেরা যখন প্রথম প্রথম আসে তখন তাদের দেখতে কি সুন্দর! কোঁকড়া চুল, গলায় উজ্জ্বল হার বা হাঁসুলী, চুলে পালক ও ফুল গোঁজা! কিন্তু স্কুল মাস্টার মশাই তার চুলের পালক ও ফুল তুলে ফেলেন, তার কোঁকড়া চুলকে ছেঁটে ছোট করে দেন আর গলার অলঙ্কারকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন। এর ফলে আদিবাসী ছেলের মাথায় দেখা দেয় একটা গোল টুপি, গায়ে একটা নোংরা কোট ও নোংরা খাকি হাফপ্যাণ্ট।

আদিবাসীরা কাপড় পরে, এই সভ্য পরিচ্ছদ তাদের সংস্কৃতির পক্ষে নাকি ক্ষতিকর এবং এর ফলে আদিবাসীদের মধ্যে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, মিঃ এলুইন এই যুক্তি দেখিয়েছেন।

নোংরা কাপড় পরলে এবং স্নান শৌচ ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষার (Hygiene) প্রাথমিক নিয়মগুলি পালন না করলে চর্মরোগ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? আদিবাসীদের মধ্যে যদি চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে, তবে সেটা নোংরা কাপড় পরার জন্যই হয়েছে। কাপড় নামক সভ্য পরিচ্ছদটিকে এর জন্য প্রধান অপরাধী মনে করা উচিত নয়। আদিবাসী সমাজের মধ্যে যারা শিক্ষিত হয়ে ভারতের সাধারণ ভদ্রলোকের মত স্নান ও কাপড় কাচার নিয়মিত আচরণটি পালন করেন, তাঁদের মধ্যে চর্মরোগ আছে কি? আসামের খৃস্টান ও খাসিয়া সমাজ য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে চর্মরোগ কি খুবই প্রবল?

জুয়াং নামে অতি অনগ্রসর আদিবাসী গোষ্ঠীর মেয়েরা গাছের পাতা দিয়ে তৈরী পোষাকে অঙ্গ আচ্ছাদন করে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে একটা লজ্জাবোধের সংস্কার তাদের মধ্যে আছে। দৈহিক নগ্নতা আদিবাসীদের একটা সাংস্কৃতিক ভিত্তি নয়। শুধু লজ্জাবোধের সংস্কারই নয়, শীতাতপের আক্রমণ থেকে শরীর রক্ষা করার প্রয়োজনও আদিবাসীরা অনুভব করে, নইলে শীতের সময় অগ্নিকুণ্ডের পাশে তাদের রাত কাটাবার প্রয়োজন হতো না। গৃহ নামে জিনিসটাও একটা পরিচ্ছদ, শীতাতপ থেকে শরীর বাঁচাবার উপায়। আদিবাসীরা গৃহেই বাস করে। সভ্যতার নিয়মে যারা গৃহী হয়েছে, তারা পরিচ্ছদও ধারণ করবেই। শীতকালে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোলে আদিবাসীর স্বাস্থ্য বেশী নষ্ট হবে, না ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে সারারাত ধোঁয়ার মধ্যে ঘুমোলে বেশী স্বাস্থ্যহানি হবে? মিঃ এলুইন হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইবেন না, কারণ আদিবাসীর প্রত্যেকটি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে তিনি জীবনচর্যার পদ্ধতি (way of life) বলে প্রমাণ করবার জন্যই ব্যস্ত।

মিঃ গ্রীগসন বলেন—"পাহাড়ী মারিয়ারা সমতলবাসী (হিন্দু) জনসমাজের সংস্পর্শে এসে স্নান, কেশচর্যা ইত্যাদি দৈহিক পরিচ্ছন্নতার নীতি শিক্ষা করেছে এবং তাদের পুরাতন সংস্কার ছেড়ে দিয়েছে। (১)

ডাঃ হাটনের (Hutton) আপত্তি হলো—আদিবাসী সমাজকে 'অকালে সভ্য পরিচ্ছদ' ('premature civilised clothing') পরিধান করানো উচিত নয়। এই অভিমতের মধ্যে কিছুটা যৌক্তিকতা আছে। যেক্ষেত্রে আদিবাসীর উপযুক্ত পরিমাণ জামাকাপড় কেনবার সামর্থ্য নেই, যেক্ষেত্রে আদিবাসীর মনে সাধারণ স্নান শৌচ ও বস্ত্র-প্রক্ষালনের 'হাইজিন' সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই—সেক্ষেত্রে হঠাৎ কাপড় পরিয়ে দেওয়ার অবশ্য কোন অর্থ হয় না। এরকম করলে নগ্নদেহ আদিবাসীকে বিড়ম্বিত করাই হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমস্যাটা ঠিক কাপড়-পরার সমস্যা নয়—শিক্ষা এবং আর্থিক সমস্যা। কিন্তু যেহেতু আদিবাসীরা বর্তমান অবস্থায় অশিক্ষিত এবং আর্থিক অভাবে পীড়িত, সেই হেতু কি তাদের কাছে নগ্নতার আদর্শকে চিরন্তন করে রাখতে হবে?

১৮৭২ সালে উড়িষ্যায় জনৈক পলিটিক্যাল এজেণ্ট এক দরবার আহ্বান করেন এবং সেখানে জুয়াং মেয়েদের পল্লব-পরিচ্ছদ বর্জন করার জন্য আবেদন করেন। এজেণ্ট সাহেব নিজের টাকা খরচ করে কতকগুলি ম্যাঞ্চেস্টার শাড়ী কিনে এনেছিলেন। জনৈকা মহিলা এক একটি জুয়াং মেয়ের পাতার পোষাক ফেলে দিয়ে ঐ শাড়ী পরিয়ে দেন। পাতার পোষাকগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। রিজলি সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন— 'এইভাবে একটা বিচিত্র প্রাচীন প্রথার নিদর্শন, (পাতার পোষাক) সেদিন শেষ হয়ে গেল' ('Thus ended a picturesque survival')। (২)

কিন্তু সত্যই কি শেষ হয়েছে? রিজলি সাহেবের মন্তব্য সত্য নয়। সেদিনের অগ্ন্যুৎসবে কয়েকটি জুয়াং মেয়ের পাতার পোষাক ভস্মীভূত হয়েছিল

(১) Maria Gonds of Bastar—Grigson

(২) People of India—Risley.

সত্য, কিন্তু তারপর? তারপর আবার তারা পাতার পোষাক পরেছে এবং আজও পরে আছে। তাদের আর শাড়ী পরবার সুযোগও হয় নি, সামর্থ্যও নেই। ঘটনা থেকে এইটুকু সত্য প্রমাণিত হয় যে, জুয়াং মেয়েরা শাড়ী পরতে চায়, যদি পাওয়া যায়। চিরন্তন নগ্নতাবাদী মিঃ এলুইনের থিওরী সত্য নয়।

মধ্য প্রদেশে চন্দা জিলায় জনৈক ফরেস্ট অফিসারকে বাঘে আক্রমণ করে। একজন মারিয়া গন্দ ফরেস্ট অফিসারকে রক্ষা করে। এই সাহস ও মানবতার পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট ঐ গন্দ যুবককে অ্যালবার্ট মেডাল উপহার দেন। গভর্ণর মেডালটি নিয়ে গন্দ যুবকটির পরিচ্ছদে পিন দিয়ে এঁটে দেবার জন্য হাত তুলেই দেখেন যে, মেডাল পরিয়ে দেবার কোন উপায় নেই, কারণ গন্দ যুবকটির গায়ে কোন পরিচ্ছদ ছিল না, মাত্র একটা নেংটি। (৩) অবশ্য, এই ঘটনার কথা স্মরণ করেও মিঃ এলুইন বোধ হয় তাঁর নগ্নতাবাদ পরিত্যাগ করতে চাইবেন না।

(৪) হিন্দী ভাষার প্রভাব।

হিন্দী ভাষা শিক্ষা করে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক অধঃপতন হচ্ছে, মিঃ এলুইনের এই আর একটা অভিযোগ। মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় একটি ভাষা শিক্ষা করা সাংস্কৃতিক উন্নতির পদ্ধতিরূপেই প্রত্যেক সভ্যদেশে স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয় একটি ভাষায় শিক্ষিত হতে পারলে মাতৃভাষারই ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। কিন্তু মিঃ এলুইন বলেন, হিন্দী ভাষা শিক্ষা করে গন্দদের নাকি 'একটা নিজস্ব কাব্য ও রূপকথার জগৎ' ('a whole world of poetry and legend') নষ্ট হয়ে গেছে। হিন্দী স্কুলে পড়ে গন্দ ছেলে নাকি গোষ্ঠীর আদিপুরুষ লিংগোর সুন্দর গাথাগুলি আবৃত্তি করতে পারে না, আর আদিবাসী নরনারী তাদের নিজস্ব মনবিমোহন দাদারিয়া সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে অশ্লীল তামাসার চর্চা করে।

গন্দদের রূপকথাগুলি এমন কি গোষ্ঠীর মহাপুরুষ লিংগোর গাথাও হিন্দুভাবে ভরপুর, একথা মিঃ এলুইন জেনেও বোধ হয় চেপে গেছেন। তা ছাড়া আর একটা কথা। লিংগোর গাথাটি কি সত্যিই এমনই উচ্চ সাহিত্য যার তুলনায়:

(৩) Census Report, C. P. & Berar. 1931.

হিন্দী কাব্য একেবারে তুচ্ছ? মোটেই নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, হিন্দী কাব্য গীতিকা সঙ্গীত এবং রূপকথার ঐশ্বর্যের তুলনায় গন্দি লোক-সঙ্গীত এবং রূপকথা কিছুই নয়। সুতরাং হিন্দী ভাষা শিক্ষা করে গন্দদের কাব্য-সাহিত্য অবনত হবে, এটা একটা নিছক অপবাদ প্রচারের জবরদস্তি মাত্র।

(৫) হিন্দুসংস্পর্শ ও আদিবাসীর গোষ্ঠীগত শিল্পকলা।

গন্দ সমাজের অবস্থা দেখে মিঃ এলুইন মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দুসংস্পর্শের ফলে গন্দেরা শিল্পকলাহীন হয়েছে। আদিবাসীদের আলঙ্কারিকতার প্রতি আকর্ষণ ও সুন্দর শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা ('love of decoration and power to create beautiful things') নষ্ট হয়ে গেছে।

মিঃ এলুইনের এই উক্তি বস্তুতঃ তাঁর চরম অজ্ঞতার দৃষ্টান্তরূপে ধরা যেতে পারে। হিন্দু-সংস্কৃতি কি শিল্পে বা কারুকলায় একেবারে রিক্ত? না, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার আধার? জলের সংস্পর্শে এসে কেউ পুড়ে যায় না, এবং শিল্পোন্নত হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসলে কেউ শিল্পরুচিহীন হয় না। যেসব গন্দ হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে নি তারা, অর্থাৎ পাহাড়ী গন্দেরা, মস্ত বড় শিল্পকলার ওস্তাদ হয়ে রয়েছে কি? ফরসাইথ ও ডাল্টন বলেছেন, পাহাড়ী গন্দদের শিল্পকলা অত্যন্ত স্থূল এবং তারা এ বিষয়ে নিতান্ত অনগ্রসর। (১)

মিঃ এলুইন জোর করে একটা প্রাচীন শিল্পকলাময় গন্দ-সংস্কৃতি কল্পনা করে নিয়েছেন, সেই কারণে তাঁর সমস্ত অভিযোগগুলিই অলীক। হিন্দু-সংস্পর্শের

(১) "Their art is of the rudest character...suited, in fact, to the mental calibre of a people scarcely yet emerging from mere fetishism"—Forsyth.

"The hill Gonds appear to be very backward in arts. An artisan of their own race is rarely met with, but like other tribes they have availed themselves of the services of low Aryan craftsmen who live with them, accommodate themselves to Gond habits of impurity, and in return for scanty means of subsistence do all the weaving and pottery required."—Dalton (Descriptive Ethnology of Bengal).

বিরুদ্ধে আতঙ্ক প্রচার করার প্রেরণা তাঁকে মনগড়া অভিযোগের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। হিন্দু-সভ্যতায় প্রভাবিত রাজগন্দেরা প্রাচীন রীতির গহনা বর্জন করার জন্য আন্দোলন করেছিল। মিঃ এলুইন এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, হিন্দুত্বের প্রভাবে গন্দসমাজে শিল্পবোধ অবনত ('deterioration in artistic sense') হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুরা কত অলঙ্কারপ্রিয় এবং হিন্দু নরনারীর পরিচ্ছদে কি বর্ণপ্রাচুর্য, বেশভূষার পদ্ধতিতে কি সৌন্দর্য আছে, সেটা মিঃ এলুইন নিশ্চয় জানেন। হিন্দু-সভ্যতা খুবই বিচিত্র ও রঙীন সভ্যতা। এর প্রভাবে কেউ বেরঙা হয়ে যায় না। গন্দদের প্রাচীন পদ্ধতির অলঙ্কারগুলি যেমন স্থূল, তেমনি ভারি ও কারুশোভাহীন ছিল। (২) রাজগন্দেরা গহনা নামে পরিচিত এই স্থূল ধাতুর বোঝা বর্জন করে সত্যিকারের কারুশ্রীসম্পন্ন হাল্কা ধাতুর গহনা গ্রহণের জন্য আন্দোলন করেছিল তাতেই মিঃ এলুইন ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং ব্যাপারটাকে গন্দদের সৌন্দর্যবোধের (Aesthetic Sense) ওপর আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন।

(৬) আদিবাসীর নৃত্য ও সঙ্গীতের সমস্যা

এলুইন বলেন, শিক্ষিত হওয়ার ফলে আদিবাসীর নৃত্য ও সঙ্গীতের অধঃপতন হচ্ছে। তাঁর মন্তব্য হলো—"শিক্ষার সবচেয়ে ভয়ানক ফল হলো আদিবাসীর নৃত্য ও সঙ্গীতের ওপর প্রতিক্রিয়া" ('Perhaps the most harmful result of education is its effect on singing and dancing'.—The Aboriginals.)

খৃস্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সঙ্গীত নৃত্যের বিরুদ্ধাচার করেছেন, একথা সত্য। কিন্তু যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী হিন্দুত্ব লাভ করেছে এবং যারা আংশিকভাবেও হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্পর্শে বা প্রভাবে এসেছে, তাঁদের মধ্যে

(২) "Quantity rather than quality is aimed at; and both arms and legs are usually loaded with tiers of heavy rings···Ear and nose rings and heavy necklaces of coins or beads are also common."—Forsyth.

ৃত্য ও সঙ্গীত বিনষ্ট হয় নি, বিনষ্ট হবার কারণও নেই। হিন্দু নিজেই অত্যন্ত সঙ্গীতপরায়ণ, বারমাসে তের পার্ব্বণে সে গান গায়। হিন্দুর প্রতি কুটীরে ব্রতের ছড়ার আবৃত্তি। বহুশ্রেণীবিন্যস্ত হিন্দুসমাজের বহু শ্রেণীর মধ্যে নৃত্যের চর্চা আজও সামাজিক আচাররূপে রয়েছে। হিন্দু তার কীর্তনে নাচে, হিন্দু মেয়েরা তার ব্রত উৎসবে নৃত্য করে। হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর অনেকের মধ্যে অতি দরিদ্রও তার নাচগান বন্ধ করতে পারে নি। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকনৃত্য সুপ্রসিদ্ধ। আদিবাসীর মত ঝুমুর গান ও নাচ হিন্দুসমাজের বহু শ্রেণীতেও সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে রয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষিত হিন্দুসমাজের মধ্যেও নৃত্য-চর্চার প্রসার হয়ে চলেছে। নটরাজের ভক্ত হিন্দুর মধ্যে সামাজিকভাবে নৃত্যবিরোধিতার গোঁড়ামি নেই। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা অথবা হিন্দুর সংস্পর্শ, কোনটাই আদিবাসীকে নৃত্যচর্চায় নিরুৎসাহ করে না। তবুও মিঃ এলুইন এই সম্পূর্ণ কাল্পনিক অভিযোগ প্রচার করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

(৭) ফৌজদারী আইন ও আদিবাসীর সংস্কৃতি

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধি আদিবাসীর সংস্কৃতিকে বিড়ম্বিত করেছে বলে মিঃ এলুইন অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিমত, ভারত-বর্ষের অন্যান্য সভ্য সমাজের জন্য যে আইন খাটে, আদিবাসীর জন্য সে আইন খাটে না, ফৌজদারীই হোক্ আর দেওয়ানীই হোক্।

উত্তরে বলা যায়, দেওয়ানী আইন (Civil Laws) সম্বন্ধে মিঃ এলুইনের এই যুক্তি যতখানি খাটে, ফৌজদারী আইন সম্বন্ধে ঠিক ততখানি খাটে না। আদিবাসীদের জন্য ভূমিসংক্রান্ত, সম্পত্তিঘটিত ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক ঐতিহ্য এবং লোকাচারের দিকে লক্ষ্য রেখে অবশ্যই দেওয়ানী আইনের কিছুটা রকমফের হতে পারে এবং সেটাই বিধেয়। কিন্তু অপরাধ (crime) নামে কথিত কোন হিংস্র আচরণকে কোন ধর্ম বা সংস্কৃতির অজুহাতে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মানুষ তার প্রাচীন সংস্কারকে চিরস্থায়ী ক'রে উন্নত হয় নি, প্রাচীন সংস্কারকে পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত করে ও পরিবর্তন বা বর্জন করে সে তার সভ্যতার

প্রগতি অব্যাহত রেখেছে। আদিবাসী সমাজ মানবিক সভ্যতার এই সাধারণ নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু মিঃ এলুইন বস্তুতঃ সেই রকমেরই দা· করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর এক একটা মন্তব্য শুনলে হতভম্ব হতে হয়। জায়গায় ("The Aboriginals" দ্রষ্টব্য) তিনি মন্তব্য করেছেন :

"কেউ অস্বীকার করবে না যে, আদিবাসীদের জীবনে নানারকম স্থূল কুসংস্কার ও কুপ্রথা আছে। দৃষ্টান্ত, কোন কোন নাগাসমাজ য়ুরোপের অতি অগ্রসর জাতিগুলির মত মুণ্ডশিকার ও নরবলির চর্চা করে। একমাত্র পার্থক্য হলো বেচারা আদিবাসী দেবতার নামে একটি দুটি নরবলি করে থাকে, আর বড় বড় নেশনগুলি সাম্রাজ্য ও সভ্যতার নামে লক্ষ লক্ষ নরবলি করে।"

মিঃ এলুইনের এই মন্তব্যের মধ্যে যে ধরণের যুক্তি ও বিদ্রূপ পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ হয় ভদ্রলোকের কি সত্যিই নৃতাত্ত্বিক বা সমাজবিজ্ঞানীর উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে ? নাগাসমাজের নরবলি প্রথা আর য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির যুদ্ধবিগ্রহ, এই দুই ব্যাপারের পিছনে কি একই রকম মনস্তত্ত্ব রয়েছে ? এত শিথিল উক্তি কোন নৃতাত্ত্বিকের পক্ষে শোভা পায় না। যে কুসংস্কারের প্রভাবে নাগা মুণ্ডশিকার করে, য়ুরোপের নেশনগুলি নিশ্চয় সেই কুসংস্কারের প্রেরণায় যুদ্ধ করে না। যুদ্ধ ব্যাপারটাকে যদি মুণ্ডশিকার বলে ধরে নেওয়া হয়, তবুও মিঃ এলুইনের মন্তব্যের কোন অর্থ হয় না। নাগার মুণ্ডশিকার চর্চা এবং য়ুরোপীয় নেশনগুলির মুণ্ডশিকার চর্চার মধ্যে উদ্দেশ্যের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। নাগার মুণ্ডশিকার এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, দুটোই গর্হিত ব্যাপার, কিন্তু তা বলে দুটোই একই ব্যাপার নয়।

আদিবাসীদের মধ্যে আর একটা হিংস্র প্রথা পূর্বে খুবই প্রবল ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে—ডাইনী পোড়ানো। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ফৌজদারী আইন এই প্রথা দমন করেছে। মিঃ এলুইনের মতে এটাও আদিবাসীর সামাজিক অধিকারে হস্তক্ষেপের ব্যাপার। তিনি বলেন, শিক্ষিত সমাজেও ডাইনী সংস্কার

আছে। আমরাও তর্কের খাতিরে স্বীকার করি—আছে। কিন্তু তার জন্যে ডাইনী পোড়ানো কাজটাকে একটা সামাজিক সদাচার বলে গ্রহণ করতে হবে?

জোর-করে-মেয়ে-ধরে-নিয়ে বিয়ে করা (marriage by capture)—এই আসুরিক বিবাহপদ্ধতির বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন কেন বাধা দেয়, এটাও এলুইন সাহেবের আর একটা ক্ষোভ। আদিবাসী সমাজের প্রতি দরদের আধিক্যে ভদ্রলোকের যুক্তি ও মন্তব্যগুলি অপলাপে পরিণত হয়েছে। নরবলি, মুণ্ডশিকার, ডাইনী পোড়ানো ইত্যাদি হিংস্র প্রথাগুলির বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে কোন প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত তিনি নারাজ। তিনি বরং স্পষ্টভাবে উল্টো কথাই বলেছেন:

"The aboriginals were faced with a serious crisis when British administrators insisted on the cessation of such obviously evil practices as human sacrifice, head hunting and murder for witchcraft."

ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা যখন মুণ্ডশিকার, নরবলি, ডাইনী পোড়ানো প্রভৃতি কুপ্রথাগুলি বন্ধ করার জন্য জোর চেষ্টা আরম্ভ করে, তখন আদিবাসীরা একটা মস্ত সঙ্কটে পড়েছিল।

কিসের সঙ্কট? মিঃ এলুইনের মতে বোধ হয়—আদিবাসীর সভ্যতার সঙ্কট। এই সব হিংস্র কুপ্রথাগুলিকেও হয়তো তিনি আদিবাসীর জীবনচর্যার পদ্ধতি ('way of life') বলে মনে করেন। নইলে সঙ্কটের কথা আসে কোথা থেকে?

(৮) আদিবাসী অঞ্চলে আধুনিক সড়ক—আদিবাসী সংস্কৃতির হানি।

আদিবাসী অঞ্চলে রেল, পুল ও সড়কের আবির্ভাবে মিঃ এলুইন ব্যথিত হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে বৈগাদের সঙ্গে কয়েক বছর মেলামেশা করে ভদ্রলোক বৈগাদের একটি কুসংস্কারকে ভালবেসে ফেলেছেন। লাঙ্গল দিয়ে মাটি চাষ করার মত, রেল সড়ক হলে ধরিত্রী মাতা ব্যথা পাবেন—মিঃ এলুইন বোধ হয় বৈগাসুলভ এই মনোভাবের আধিক্যের আপত্তিটা তুলেছেন।

মিঃ এলুইনের বক্তব্য, আদিবাসী অঞ্চলে রেল, পুল, সড়ক, ইত্যাদি আদিবাসীদের সামাজিক সংহতি (Tribal Solidarity) নষ্ট করে। অর্থাৎ, রেল বা সড়ক বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, যার ফলে উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শ ও প্রভাব আদিবাসী সমাজের ওপর উপদ্রবের মত দেখা দেয় ও তাদের গোষ্ঠীগত সামাজিক সংহতিতে ভাঙন ধরে। তিনি বলেছেন—

"The souls of the people are soiled and grimy with the dust of passing motor buses."—

অর্থাৎ সড়ক দিয়ে ধাবমান মোটরবাসের ধূলোয় আদিবাসীর সত্তা মলিন ও বিরস হয়ে গেছে। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় এ ধরণের কাব্যময় হেঁয়ালি দিয়ে কোন তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। ধাবমান মোটরবাসের ধূলোয় লোকের সত্তা সব দেশেই মলিন হয়, তার জন্য কোনও সামাজিক সংহতি ভেঙে পড়ে না। সড়ক ও মোটরবাসের আনাগোনা ধূলোয় যদি কোন সমাজের সংহতি ভেঙে পড়ে তবে বুঝতে হবে সেই সমাজটি নিজেই নিতান্ত ঠুন্‌কো হয়ে আছে এবং সত্তাটিও নেহাৎ কাঁচা। ভঙ্গুর বলেই এত সহজে ভেঙে যায়।

কিন্তু মিঃ এলুইনের অভিযোগটি মূলতঃ সত্য নয়, সড়কের জন্যে কোনও আদিবাসী সমাজ ভেঙে পড়ে নি। তিনি বলতে পারেন, সড়ক হলে আদিবাসী অঞ্চলে বাইরের ব্যবসায়ী ও মহাজনের আবির্ভাব সহজ হয়ে পড়ে এবং তার ফলে আদিবাসীদের আর্থিক শোষণও সহজ হয়। এভাবে বিচার করলে, কিছুটা সত্য কথা বলা হয়। কিন্তু যারা আর্থিক শোষণ করে থাকে, সেই সব মহাজনের পন্থা শুধু পাকা সড়কই নয়, নিতান্ত মেঠো বা বুনো হাঁটুরে পথে তারা আনাগোনা করার যোগ্যতা রাখে। এ বিষয়ে সড়কহীনতা আদিবাসীর পক্ষে সার্থক রক্ষাকবচ নয়। সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চল সুন্দর পাকা সড়কে সমাকীর্ণ, কিন্তু এই অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের সত্তা দুর্গম জঙ্গলের অধিবাসীর সত্তার চেয়ে বেশী মলিন হয় নি। মিঃ এলুইন সোজা বলে ফেলেছেন—আসাম সীমান্তে মণিপুর পর্যন্ত যে নতুন কার্ট রোড (Cart Road) তৈরী হয়েছে, তার ফলে বেশ্যাবৃত্তি বেড়ে

গেছে। পৃথিবীতে অনেক জায়গায় বেশ্যাবৃত্তি আগের তুলনায় বেড়েছে, কিন্তু সেখানে কোন নতুন সড়ক হয়েছে দেখা যায় না। খোয়া পাথর আর পীচঢালাই সড়ককে বেশ্যাবৃত্তির কলঙ্কের জন্যে দায়ী করা উচিত নয়। সড়কে ঠিকমত চলতে না জানলে অবশ্য অনেক কলঙ্ক হবারই কথা। কোন কোন আদিবাসী অঞ্চলে এরকম ব্যাপার হয়তো হয়ে থাকবে, কিন্তু সে জন্য পথের দোষ না দিয়ে পথচলার রীতিকেই দোষী করা উচিত। বেশ্যাবৃত্তির মূল অর্থনৈতিক কারণটি অনুসন্ধান না করে, একটা সড়ককে তার জন্যে দায়ী করলেই সেটা ঠিক আদিবাসী-দরদ হয়ে ওঠে না, এবং কোন যুক্তিও হয় না।

(৯) গোষ্ঠীগত প্রথাকে আইনে পরিণত করা

মিঃ এলুইন মনে করেন, ভারতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন আদিবাসীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয়। আদিবাসীদের মামলা বিচারের পদ্ধতিও (Judiciary) ভিন্নভাবে গঠিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আদিবাসীদের মনে সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, দেনা ইত্যাদি বিষয়ে যে ধারণা ও সংস্কার আছে, সেটা ঠিক সাধারণ ভারতীয়ের ধারণা বা সংস্কারের মত নয়। আদিবাসীদের বিবাহপ্রথাও ভিন্ন ধরণের, যৌননীতি ও রুচি ভিন্ন ধরণের—সুতরাং এসব ব্যাপারে ভারতীয় আইন অথবা সভ্য জাতির উপযোগী কোন আইন আদিবাসীদের পক্ষে উপযোগী নয়।

সুতরাং, তাঁর মতে আদিবাসীদের সামাজিক প্রথাগুলিকেই বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত (Codification of Customs) করতে হবে। তাঁর প্রস্তাব, একদল নৃতাত্ত্বিককে নিয়োগ করে আদিবাসীদের প্রথা সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করে, সেগুলিকে আইনে পরিণত করা হোক্।

মিঃ এলুইনের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্য যেসব উদাহরণ আমরা পেয়েছি তাতে তাঁর পক্ষে এই ধরণের দাবী করা বিস্ময়ের কিছু নয়।

প্রথাকে মানুষের চেয়ে বড় বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের পক্ষেই এ ধরণের প্রস্তাব করা সহজ। প্রথার জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই প্রথার সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু প্রথাকে যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, তবে সমাজের দেহ ও প্রাণকেই স্তব্ধ করে রাখা হবে। প্রথা বিধিবদ্ধ হলে গোষ্ঠীগত পঞ্চায়েৎ শাসনের পদ্ধতিও নিতান্ত যন্ত্রবৎ (Mechanical) হয়ে যাবে। গোষ্ঠীগত সর্দারও বর্তমানে যতখানি ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তখন তাঁর পক্ষে সে স্থযোগও থাকবে না। কেন না বিধিবদ্ধ প্রথাগুলি তাঁর ওপরেও সার্বভৌম হয়ে উঠবে, এটা আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির বিরোধী ব্যাপার হয়ে উঠবে।

এলুইন ভাষ্যের যতগুলি স্থত্র বিবৃত করা হলো, তার সকলগুলির মধ্যে মূলতঃ একটি দাবীই রয়েছে। সেটা হলো—আদিবাসীকে আধুনিক সভ্য সংস্পর্শ (culture contact) থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীগত প্রথা সংস্কার ও রীতি-নীতিকে কোনভাবে পরিবর্তন না করে, যেমন ছিল তেমনই অবস্থায় চিরকালের মত সাজিয়ে রাখা। এই দাবীই শেষ পর্য্যন্ত ন্যাশন্যাল পার্ক দাবীতে পরিণত হয়েছে।

ন্যাশনাল পার্ক

পরিকল্পনাটি হলো—অরণ্য ও পাহাড় অঞ্চলে এক একটা স্থবিস্তৃত এলাকা আদিবাসীর উপনিবেশের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এই এলাকার মধ্যে আদিবাসীরা তাদের চিরপুরাতন পদ্ধতিতে অবাধে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। কোন স্কুল বা সড়ক এখানে হতে পারবে না। কোন মিশনারী আসতে পারবে না। আবগারী আইন, জঙ্গল আইন, ভূমি আইন—কোন কিছুই থাকতে পারবে না। আদিবাসীরা অবাধে ঝুম চাষ করবে এবং সর্দারের দ্বারা পরিচালিত হবে। বর্তমান বস্তার রাজ্যে আদিবাসীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট এলাকায় যে ধরণের উপনিবেশ করা হয়েছে, মিঃ এলুইন তার সঙ্গে কতকটা সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ বস্তার মডেল অনুসারে এই ন্যাশনাল পার্ক পরিকল্পনা প্রচার করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো—আদিবাসীরা এইভাবেই নির্দোষ ও স্থখী জীবন যাপন করুক, যতক্ষণ না বর্তমান সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক যুগ এদের ক্ষতি না করে উন্নতি করবার ঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করার মত যোগ্যতা ও জ্ঞানলাভ করে—

"Innocence and happiness for a while till civilisation is more worthy to instruct them and until a scientific age has learnt how to bring development and change without causing despair.''

উটোপিয়া (Utopia) নামে একটা কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য বা সব-পেয়েছির দেশ আছে। এই উটোপিয়ার পরিকল্পনার মধ্যে যতই অবাস্তবতা থাকুক, এটা একটা চরম সুখী জীবন ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই গঠিত। এক্ষেত্রে, কল্পিত আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি হলো পজিটিভ, নীচ থেকে উর্ধে।

মিঃ এলুইনের ন্যাশনাল পার্ক পরিকল্পনা হলো একটি বিশুদ্ধ নেগেটিভ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা গঠিত—উর্ধ থেকে নীচে, বর্তমান ছেড়ে অতীতে, পরিবর্তনের বদলে চিরস্থিরতা, গতি ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধতা। সুতরাং মিঃ এলুইনের পরিকল্পনাকে অবাস্তব উটোপিয়ার সঙ্গেও তুলনা করা উচিত হবে না। এটা হলো তার বিপরীত —অবাস্তব অথচ অধোমুখী—ঝুটোপিয়া।

ভারতের আদি সন্তান দুঃখী আদিবাসীকে নিয়ে এক একটি সখের নৃতাত্ত্বিক মিউজিয়াম তৈরী করার এই পরিকল্পনা সখের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আদিবাসীর ভাষা

মহীশূর রাজ্যের সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (১৯৩৩) সালের রিপোর্টে বলেন যে, সেখানকার আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত ভাষা লুপ্ত হতে চলেছে এবং আদিবাসীরা নূতন ভাষা (স্থানীয় সাধারণ ভাষা) গ্রহণ করেছে।

মধ্যভারত এজেন্সীর সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১৯৩১ জানিয়েছেন—"যদিও মধ্যভারতে বহুসংখ্যক আদিবাসী আছে, কিন্তু এই সব গোষ্ঠীর অনার্য ভাষা লুপ্ত হয়ে আর্যভাষা প্রচলিত হয়েছে। এ ব্যাপারটা নতুন নয়, বহুদিন আগে থেকেই এই ভাষা-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হয়ে আসছে। রেওয়া রাজ্যের কোল, বৈগা ও মুণ্ডা, বুন্দেলখণ্ডের সোঁর, মালব ও গোয়ালিয়রের সাহারিয়া—এই সব আদিবাসী গোষ্ঠীদের বর্তমানে কোন নিজস্ব ভাষা নেই। তারা স্থানীয় আর্যভাষা গ্রহণ করেছে। ভীলদের কোন নিজস্ব ভাষা ছিল কি না জানি না। হয়তো কোন কালে এরা মুণ্ডারি ভাষায় কথা বলতো, কিন্তু বর্তমানে এদের ভাষা সম্পূর্ণভাবে আর্যভাষার রূপ গ্রহণ করে ফেলেছে। ...রেওয়ার গন্দেরা যে ভাষায় কথা বলে সেটা বস্তুতঃ স্থানীয় বাঘেলি ভাষারই একটা অপভ্রংশ। নর্মদা উপত্যকার অল্পসংখ্যক কোরকু যারা আছে, তারা নিজস্ব ভাষা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে মাল্‌বি ভাষা গ্রহণ করেছে।"

বরোদা রাজ্যের সেন্সাস কমিশনার (১৯৩১) জানিয়েছেন—স্থানীয় ডুব্‌লা তালবিয়া প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভীলি ভাষা ছেড়ে দিয়ে গুজরাটি ভাষা গ্রহণ করেছে। * ডুব্‌লা তালবিয়ারা গুজরাটি ভূস্বামীদের অধীনে মজুরি করে। কিন্তু যেসব গোষ্ঠী আর্থিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্ব-নির্ভর, তারা গোষ্ঠীগত ভাষা হারায় নি—দৃষ্টান্ত চোটরা গোষ্ঠী।

* ভীলদের বর্তমান ভাষা হলো ভীলি অর্থাৎ হিন্দী ভাষারই একটা অপভ্রংশ। বহু অতীতে ভীলেরা তাদের গোষ্ঠীগত ভাষা ছেড়ে দিয়ে হিন্দী ভাষা ধরেছিল। দেখা যাচ্ছে যে, এখন আবার ভীলি ভাষা ছেড়ে দিয়ে ভীলেরা অনেকে নতুন কোন প্রাদেশিক ভাষা গ্রহণ করছে।

পূর্ব ভারতের বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে আদিবাসীরা হলো জনবহুল সমাজ। এদের মধ্যে ভাষা-লুপ্তির ব্যাপার কমই হয়েছে। আর একটা কথা, এই অঞ্চলের বহু আদিবাসী গোষ্ঠী হিন্দু-সংস্কৃতির দ্বারা খুবই প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুর ভাষা (আর্য ভাষা) গ্রহণ করেনি, গোষ্ঠীগত ভাষাকে পরিত্যাগ করে নি। দেখা যাচ্ছে যে, যেসব অঞ্চলে আদিবাসীরা জনবহুল সমাজ হিসাবে আছে এবং যেখানে তারা আর্থিক বিষয়ে কিছুটা উন্নত বা আত্মনির্ভর, সেখানে তাদের গোষ্ঠীগত ভাষাকে তারা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। যেখানে তারা সংখ্যায় অল্প, সেখানেই তাদের ভাষার সজীবতাও টিঁকে থাকতে পারে নি।

একটা ব্যাপারে আদিবাসীরা ভারতের সমতলবাসী জনসাধারণের থেকে বিশিষ্ট। সেটা হলো তাদের দ্বিভাষিতা (Bilingualism)। অধিকাংশ আদিবাসী যারা নিজস্ব গোষ্ঠীগত ভাষায় কথা বলে, তারা স্থানীয় সমতল অঞ্চলের আর একটা সাধারণ (Non-Aboriginal) ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা রাখে। একটি গোষ্ঠীগত জাতীয় মাতৃভাষা এবং একটি শহরবাজারের বিজাতীয় ভাষা— আদিবাসীর মুখে দ্বিভাষিতার ব্যাপার দিন দিন বেড়ে চলেছে।

শুধু কি দ্বিভাষিতা? মধ্যপ্রদেশের সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেছেন—"দক্ষিণ চন্দা জিলায় একজন গন্দ শিকারীকে দেখেছি, যিনি হিন্দী, তেলেগু, মারাঠি ও গন্দ ভাষায় সমান দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আদিবাসী পুরুষ ও নারী সকলেই দ্বিভাষী। সেওনি জেলায় দেখেছি যে, গন্দ পরিবারের কোলের ছেলেও দুটো ভাষায় কথা বলতে পারে।"

আদিবাসীদের ভাষা-পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি কিভাবে হয়ে আসছে ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ার্সনের (Sir George Grierson) একটি মন্তব্য থেকে তার ধারণা হতে পারে। তিনি লিখেছেন—"মধ্যপ্রদেশে নিহাল নামে একটি আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে। এরা পূর্বে মুণ্ডারি ভাষায় কথা বলতো। পরে এরা দ্রাবিড় প্রভাবে আসে এবং তার ফলে এদের ভাষা মুণ্ডা ও দ্রাবিড় ভাষা মিশিয়ে একটা

মিশ্র ভাষা হয়ে ওঠে। এরপর আবার এরা আর্যভাষার প্রভাবে আসে এবং বর্তমানে এরা প্রায় একটা আর্যভাষা গ্রহণ করে ফেলেছে।”

বিহার-উড়িষ্যার সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (১৯৩১) বলেন—বিহার ও উড়িষ্যার আদিবাসীদের মাতৃভাষা অক্ষুণ্ণ আছে, যদিও দ্বিভাষিতা এদের মধ্যে খুবই প্রবল। মাত্র ভূমিজদের মধ্যে এবং তুরীদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ভাষার হানি দেখতে পাওয়া যায় যারা গোষ্ঠীগত ভাষা ছেড়ে স্থানীয় সাধারণ ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করছে।

বাঙলার সেন্সাস রিপোর্টে (১৯৩১) মন্তব্য করা হয়েছে: এই অঞ্চলে মুণ্ডারি-ভাষী লোক অনেক আছে, কিন্তু এক্ষণে তারা বস্তুত গোষ্ঠীগত পরিপার্শ্বের বাহিরেই রয়েছে (‘out of environment’)। সেই কারণে বাঙলার মুণ্ডারীভাষীদের মধ্যে ভাষা-লুপ্তি কিছুটা ঘটেছে। মাল্‌তু ভাষারও হানি হয়েছে। দ্রাবিড়ীয় কুরুখ অর্থাৎ ওঁরাও ভাষার হানি হয় নি। তিব্বতী-মঙ্গোলীয়ভাষী আদিবাসীদের ভাষাও অক্ষুণ্ণ আছে।

আসামের সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (১৯৩১) স্থানীয় আদিবাসীর ভাষার সজীবতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

“We can say definitely that the indigenous hill languages are as vigorous as ever and show no sign of erosion.”

“আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, পাহাড়ী আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি আগের মতই সজীব হয়ে আছে, ধ্বংস হয়ে যাবার কোন লক্ষণ দেখা দেয় নি।”

আসামের আদিবাসীদের মধ্যে দ্বিভাষিতা বেড়ে চলেছে। আসামের সেন্সাস রিপোর্টে (১৯৩১) বলে; আসামের আদিবাসীদের পক্ষে বাঙলা বা হিন্দুস্থানী শেখবার কোন সুযোগ নেই। অসমীয়া ভাষাও খুব কম আদিবাসীই জানে। কিন্তু একাধিক গোষ্ঠিগত ভাষায় কথা বলতে পারে, এ রকম আদিবাসীর সংখ্যা অনেক।

"There are small villages where the children grow up fluent in five languages each of which would puzzle a Dutchman to learn a little in two years."

অর্থাৎ ছোট ছোট অনেক গ্রাম আছে, যেখানে আদিবাসীরা ছেলেবয়স থেকেই এমন পাঁচটি বিভিন্ন (আদিবাসী) ভাষায় অবাধে কথা বলতে পারে, যার একটির সামান্য কিছু শিখতেও কোন ডাচ্ ভদ্রলোকের পক্ষে দু'বছর সময় লাগবে।

ভাষা-বিভাগ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষাগত পরিচয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে একটা শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে।

মূলভাষা—অস্ট্রিক

(১) খাসি শাখা	আসাম
(২) মুণ্ডারি শাখা	
(ক) খেড়োয়ারি (সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, ভূমিজ, অসুর, কোরোয়া)	আসাম, বাঙলা, বিহার উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ
(খ) কোরকু	মধ্যপ্রদেশ, বেরার
(গ) খারিয়া	বিহার, উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ
(ঘ) শবর	মাদ্রাজ
(ঙ) গড়াবা	মাদ্রাজ

মূল ভাষা—তিব্বতী-চীন

(১) হিমালয় শাখা	
(ক) মুরমি	বাঙলা, সিকিম

(খ) মগরি	বাঙলা, আসাম, সিকিম
(গ) লেপ্‌চা (রোং)	বাঙলা, সিকিম
(২) উত্তর আসাম শাখা	
(ক) আবোর	আসাম
(৩) বোড়ো (Bodo) শাখা	
(ক) বোড়ো (সমতলবাসী কাছাড়ী ভাষা)	আসাম
(খ) গারো	আসাম
(গ) টিপ্‌রা (ম্রুং)	বাঙলা, আসাম
(৪) মিকির শাখা	
(ক) মিকির	আসাম
(৫) নাগা শাখা	
(ক) আংগামি	আসাম
(খ) সেমা	আসাম
(গ) আও	আসাম
(ঘ) তাংখুলা	আসাম
(ঙ) নাগা (unclassed)	আসাম
(৬) কুকি-চিন শাখা	
(ক) মণিপুরী	আসাম
(খ) থাডো	আসাম
(গ) লুসাই	আসাম
(ঘ) কুকি	আসাম, বাঙলা

মূল ভাষা—দ্রাবিড়

(১) অর্ধদ্রাবিড় শাখা (Intermediate Group)

(ক) কুরুখ বা ওরাঁও	বিহার, উড়িষ্যা
(খ) মাল্‌তু	বিহার, উড়িষ্যা
(গ) গন্দি	মধ্যপ্রদেশ, মধ্য-ভারত এজেন্সি, বেরার
(ঘ) কন্ধি বা কুই (খন্দ)	মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা
(ঙ) কোলামি	মধ্যপ্রদেশ, বেরার

মূল ভাষা—হিন্দ্‌-য়ুরোপীয়
(Indo-European)

(১) পূর্ব-হিন্দী শাখা

(ক) ভীলি	বোম্বাই, মধ্য-ভারত এজেন্সি, রাজপুতনা

দক্ষিণ ভারতের অতি অনগ্রসর আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির ভাষার ঐতিহাসিক পরিচয় এখনো সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। এরা মানুষ জাতিরই প্রাচীনতম নিদর্শন। ডাঃ হাটন ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলেছেন :

"ভারতের আদিবাসীদের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জ্ঞান লাভ করেছি, তার মধ্যে একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ভালভাবে হয় নি। মুণ্ডারি ভাষা অতীতে কখনো ভারতের শেষ দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল কি না, তা বলা অসম্ভব। ভারতে যে ভাষাতাত্ত্বিক সার্ভে (Linguistic Survey) হয়েছিল, তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতকে ধরা হয় নি।......সুতরাং দক্ষিণ ভারতের কাডার, কুরুমান, পুলিয়ান, পানিয়ান প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীদের ভাষার পরিচয় এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।"

ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস

আদিবাসীদের ধর্ম কি? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুধর্মের মতই আদিবাসীদের ধর্ম বহু মত-বিশ্বাস-প্রথা-সংস্কার নিয়ে গঠিত। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মমত-বৈচিত্র্যের মত আদি-বাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীরও ধর্মে ধর্মে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য।

বর্তমান আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস এবং হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস —উভয়ের ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমরা এমন কতগুলি তথ্যের সম্মুখীন হই, যেগুলি বস্তুতঃ মানুষ জাতিরই ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস। নৃতাত্ত্বিক যেমন বর্তমান মানবজাতির বিভিন্ন দৈহিক গঠন ও রূপের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে সুপ্রাচীনকালের কয়েকটি মূল নরবংশের ধারা আবিষ্কার করেছেন, তেমনি বর্তমান সভ্য মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কতগুলি ধর্মবিশ্বাসের ধারা আবিষ্কার করা যায়। মূল নরবংশগুলির দেহের শোণিতের মত এই মূল ধর্মবিশ্বাসের ধারাগুলিও যুগ যুগ ধরে দেশ হতে দেশান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। এক ধারার সঙ্গে অন্য ধারার মিলন ও মিশ্রণ হয়ে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস বস্তুতঃ মানুষজাতির সেই মূল ধর্মবিশ্বাসের ধারাগুলিরই নিদর্শন। মানুষ জাতির ধর্মবিশ্বাসের শৈশবরূপ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মূল সংস্কারগুলি মানুষের মনীষার দ্বারা মার্জিত হয়ে অথবা একটা সভ্য পরিচ্ছদ ধারণ করে আজও সভ্য-সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আদিবাসীদের সম্বন্ধে বলা যায় যে, ঐ একই ধর্মসংস্কার তাদের মনের ওপর আদিম রূঢ়তা নিয়ে রয়ে গেছে, বিবর্তনের পথে বেশী অগ্রসর হতে পারে নি।

বর্তমান ভারতের হিন্দুধর্মকে অনেকে আর্যধর্ম বলে থাকেন। কিন্তু তার চেয়ে আর্য-প্রভাবিত ধর্ম বললে বোধ হয় সত্য কথাটা বলা হয়। আর্য আগমণের পূর্বেও ভারতবর্ষে মানুষ ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল। আর্যেরা এসে ভারতের সেই বনিয়াদী ধর্মকে বিনষ্ট করতে পারে নি এবং আর্যধর্ম নিজেও

বিনষ্ট হয় নি। আর্যধর্ম ও অনার্যধর্মের সংমিশ্রণই হলো হিন্দুধর্ম—এক বিচিত্র ব্যাপক প্রসারণশীল ও আহরণপ্রবণ ধর্ম।

প্রায়-হিন্দুধর্ম (Proto-Hinduism)

ডাঃ হাটন একটা কথা ব্যবহার করেছেন—'প্রায়-হিন্দুধর্ম' (Proto-Hinduism) আর্য আগমনের পূর্বে ভারতের বহু বিভিন্ন সমাজ জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, সেইসব ধর্মবিশ্বাসগুলিকেই তিনি 'প্রায়-হিন্দুধর্ম' আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রায়-হিন্দুধর্ম বিশেষ একটা বিশ্বাস বা সংস্কার ছিল না—বহু বিভিন্ন বিশ্বাস বা সংস্কারের সমাবেশ।

আজ যে হিন্দুধর্মের মধ্যে সংস্কার ও বিশ্বাসের বহুত্ব আমরা দেখতে পাই, সেটা বস্তুতঃ প্রায়-হিন্দুধর্মেরই ঐতিহ্য। আর্যধর্ম ছিল বিশেষ একটা জাতিগত ধর্ম, স্বতরাং তার রূপ বিশেষভাবেই স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ছিল, তার মধ্যে বহুত্ব এবং বিভিন্নতার কোন প্রশ্রয় ছিল না। অধিকাংশ বিজ্ঞানী একমত যে বর্তমান হিন্দুর সমাজগত কাঠাম বা গঠন হলো আর্য স্টাইলের, কিন্তু বর্তমান হিন্দুর ধর্মগত কাঠাম বা গঠন হলো বেশী প্রাচীন, প্রাগার্য যুগের।

একটি থিওরী অনেক পণ্ডিত প্রচার করেছেন—আর্যেরা একটা উন্নত ধর্ম নিয়ে ভারতে এসেছিল। এ থিওরীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার অনেক যুক্তি আছে। আর্যেরা আসবার সময়েই একটা উন্নত ধর্ম সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, অথবা ভারতে বসতি করবার পর উন্নত ধর্ম সৃষ্টি করেছিল—এর মধ্যে কোন্‌টা সত্য? পণ্ডিতদের মধ্যে এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। ভারতে সিন্ধু সভ্যতার (মহেঞ্জোদাড়ো) নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার পর আর্য সভ্যতাকে ভারতের 'প্রথম' সভ্যতা অথবা 'উন্নততর' সভ্যতা বলে মেনে নিতে পারা যায় না।

আর্য আগমনের বহু পূর্বে ভারতে বিভিন্ন জাতি বা নরবংশের আগমনের প্রমাণ পাই। নৃতত্ত্বগত সূত্র অনুসারে আর্য অথবা আর্যভাষী জাতি হলো হিন্দ্-য়ুরোপীয় (Indo-European) নরবংশ। হিন্দ্-য়ুরোপীয়দের আগমনের

পূর্বেই, অতি দূর অতীতে, ভারতে নেগ্রিটো, প্রায়-অস্ট্রেলীয় ও মেডিটারেনীয়ান নামে কথিত নরবংশগুলির ভারত আগমনের প্রমাণ পাই। কোটি কোটি ভারতীয়ের বর্ণ, করোটি, চিবুক, কেশ ও নাসিকার রূপ গঠনের মধ্যে তার জীবন্ত সাক্ষ্য বর্তমান।

নেগ্রিটো, প্রায়-অস্ট্রেলীয় ও মেডিটারেনীয়ান নরবংশগুলি নিশ্চয় ধর্মহীন ছিল না। এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে বস্তুতঃ মানসিক সংস্কারই বুঝায়। সুপ্রাচীনকালের এই মূল নরবংশগুলির মানসিক সংস্কারগুলিই হলো মূল ধর্মবিশ্বাসের ধারা। আজকের দিনে রুচি অনুসারে বিচার করতে গেলে এই মূল ধর্মবিশ্বাসের রূপ নিতান্ত রূঢ় ও অমার্জিত মনে হবে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হলো, মানুষজাতির মানসিক ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অমার্জিত শিশু-ধর্ম বিবর্তিত হয়ে বর্তমানের উন্নত দর্শনে পরিণতি লাভ করেছে। পৃথিবীর যে সব জাতির মধ্যে মন বুদ্ধি ও চিন্তার এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছে তারাই উন্নত দর্শন বা ফিলসফির অধিকারী হয়েছে এবং তারাই 'সভ্য' জাতি। যেসব জাতির বুদ্ধি, মন ও চিন্তা বিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে পারে নি তারাই তাদের সেই শিশু-ধর্ম নিয়ে রয়ে গেছে এবং তারাই হলো নৃতাত্ত্বিকের ভাষায় আদিম (Aborigines) জাতি।

ভারতের আদিবাসী সমাজের দৈহিক রূপের ইতিহাস আলোচনা করে আমরা দেখেছি যে, তাহা প্রধানতঃ নিগ্রোবটু (Negrito) প্রায়-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid, ও মঙ্গোলীয় (Mongoloid) নরবংশের মানুস। সুতরাং এই তিন নরবংশের পুরাকালীন ধর্ম বা মনের সংস্কার যা ছিল, ভারতের আদিবাসী সমাজের ধর্ম প্রধানতঃ তাই দিয়ে রচিত।

মেডিটারেনীয়ান নরবংশ আর্য আগমনের পূর্বে ভারতে এসেছিল। প্রাগার্য যুগে ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা নামে যে একটি উন্নত সভ্যতা ছিল, তার মৌলিক উপাদান ও ভিত্তি হলো মেডিটারেনীয়ান মানুষের ধর্ম সংস্কার ও সভ্যতা।

সুতরাং আর্য আগমনের পূর্বে ভারতের মানুষ-সমাজের ধর্মগত রূপ কল্পনা করে আমরা পাই প্রধানত দুটি ধর্মের অস্তিত্ব—(১) মেডিটারেনীয়ান ধর্ম প্রধান দ্রাবিড় ধর্ম, এবং (২) নিগ্রোবটু ও প্রায় অষ্ট্রেলীয় ধর্ম-প্রধান আদিবাসী ধর্ম।

(১) নিগ্রোবটু নরবংশের ধর্মগত সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—বৃক্ষপূজা (বট, অশ্বত্থ বা ডুমুর গাছ), পাথর পূজা ও উর্বরতা-পূজা (Fertility cult)।

(২) প্রায়-অষ্ট্রেলীয় নরবংশের ধর্মগত সংস্কার হলো—টোটেম পূজা এবং কোন অদৃশ্য শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য কোপ-তুষ্টির (Propitiation) সংস্কার।

(৩) এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে মেডিটারেনীয়ান নরবংশের মানুষেরা যে ধর্ম নিয়ে আসে, তার প্রধান প্রধান সংস্কারগুলি ছিল—আত্মা-পদার্থে (Soul Matter) বিশ্বাস, উর্বরতা-পূজা, বলি দ্বারা কোপতুষ্টির প্রথা ও সাকার দেবতার (Personified Deity) কল্পনা। এই এশিয়া মাইনরের মানুষেরাই নিয়ে আসে লিঙ্গরূপী পাথর পূজার পদ্ধতি, যাজক বা পুরোহিত প্রথা, আকাশের নক্ষত্র ইত্যাদির রূপকথা ইত্যাদি। তাছাড়া, আর একটা ধর্মগত সংস্কার তারা নিয়ে আসে—এক মহা-মাতার (Great Mother) অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং জন্মান্তরে বিশ্বাস।

এই তিনটি নরবংশের মনের সংস্কারগুলির সমষ্টিকেই ডাঃ হাটন প্রায়-হিন্দুধর্ম (Proto-Hinduism) আখ্যা দিয়েছেন। প্রায়-হিন্দুধর্মের ভূমিকার উপর পরবর্তীকালে আর্যধর্মের সংস্কারগুলি উপস্থিত হয় এবং উভয়ের সংমিশ্রণেই হয় বর্তমান হিন্দুধর্ম।

কিন্তু এই সংমিশ্রণের ব্যাপার সমগ্র-সম্পূর্ণ (Total) ব্যাপার নয়। যে যে ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে যে আর্য এবং অনার্য সমাজের মধ্যে নবাগত আর্যধর্মের সংস্কার ও প্রায়-হিন্দুধর্মের অন্যান্য সংস্কারে সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ হয়েছে, সেটাই 'হিন্দুধর্ম'। অপরদিকে কোন কোন প্রায়-হিন্দুধর্মসম্পন্ন আদিবাসী অনার্য সমাজ এই সংমিশ্রণ

প্রক্রিয়ার বাহিরে পড়ে রইল এবং তারাই আজও তাদের আর্যপূর্বকালের সুপ্রাচীন ধর্ম নিয়ে রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে—

বর্তমান আদিবাসীর ধর্ম = অনার্য প্রায়-হিন্দুধর্ম।

বর্তমান হিন্দুধর্ম আর্য = ধর্ম + অনার্য প্রায় হিন্দুধর্ম।

বর্তমান হিন্দুধর্মের মধ্যে বর্তমান আদিবাসীর ধর্মের সংস্কারগুলি স্থানলাভ করেছে, কিন্তু বর্তমান আদিবাসীর ধর্মে আর্য-সংস্কারের স্থান নেই। অর্থাৎ ধর্মের দিক দিয়ে বর্তমান আদিবাসী এবং বর্তমান হিন্দু উভয়ের মধ্যে একটা মৌলিক মিল রয়েছে—উভয়ের মধ্যে প্রায়-হিন্দুধর্মের সংস্কার বর্তমান।

অমিলের মধ্যে এই যে, বর্তমান হিন্দুর মধ্যে উপরন্তু আর একটা সংস্কার রয়েছে—আর্যসংস্কার। বর্তমান আদিবাসীর মধ্যে আর্যসংস্কার নেই।

বর্তমান হিন্দুসমাজ ও আদিবাসী সমাজের মধ্যে এই মূলগত ঐতিহাসিক সাদৃশ্য ও ঐক্যের ভিত্তিটি দেখতে পেয়েও ডাঃ হাটন নিজেই আবার বিস্মিত হয়েছেন—হিন্দুধর্মের প্রতি আদিবাসীদের এত আকর্ষন কেন? এবং আদিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে কেন হিন্দু-সমাজে একটা না একটা জাত হিসাবে প্রবেশ করে আসছে? ভেরিয়েব এলুইদের মত বৈজ্ঞানিক (?) এইরকম বিস্মিত হতে পারেন কারণ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের ঐতিহাসিক পরিচয় তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু ডাঃ হাটন সব জেনে শুনেও আদিবাসীদের হিন্দুত্বপ্রীতিকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন নি, এটাই আশ্চর্য।

নিগ্রোবটু প্রায়-অস্ট্রেলীয় এবং এশিয়া মাইনর থেকে আগত মেডিটারেনীয়ান নরবংশের ধর্মগত সংস্কারের বিষয়গুলি আমরা লক্ষ্য করবো, কারণ এই নিয়েই হলো প্রায়-হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বর্তমান আদিবাসীর ধর্ম।

বৃক্ষপূজা, পাথরপূজা, মহামাতার কল্পনা, বলিদান প্রথা, দেবতুষ্টি বা দেবতার কোপশান্তি প্রথা, সাকার দেবতার কল্পনা, টোটেম পূজা, উর্বরতা পূজা, মৃত পূর্বপুরুষের পূজা……প্রধানতঃ এইগুলি হলো আর্যপূর্ব ভারতের

তথাকথিত প্রায়-হিন্দুধর্মের প্রধান সংস্কার ও আচার। প্রশ্ন উঠবে, প্রাচীন মানুষের এই ধর্মাচারের মধ্যে কি কোন দার্শনিক তত্ত্ব ছিল না?

ছিল। এই ধর্মাচার ও সংস্কারগুলির বিশ্লেষণ করে আমরা আদিম মনের একটি মূল জিজ্ঞাসার সূত্র পাই—সৃষ্টির রহস্য। মানুষ থেকে মানুষ জন্ম নিচ্ছে, পশু থেকে পশু, এবং বীজ থেকে শস্য। কেমন করে হয়, কিভাবে এই সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে? এটা হলো বস্তুতঃ মানুষের মনের কাছে প্রথম রহস্য, সুতরাং প্রথম প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে আমরা বিস্মিত বৈদিক ঋষির প্রশ্নটাও স্মরণ করতে পারি—কুতো ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

এই জিজ্ঞাসার সূত্রে একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলো—নিশ্চয় এমন কিছু একটা সারবস্তু আছে, যা সব জন্মশীল বস্তুর মধ্যে থেকে এই সৃষ্টিকার্য করিয়ে চলেছে। এই সারবস্তুটি কি?

আত্মাবস্তু ও উর্বরতাবাদ

এই সারবস্তুটিই হলো আত্মা-বস্তু (Soul-matter) বা জীবন-সার (Life-essence)। বৈজ্ঞানিকেরা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ভাষা থেকে একটি কথা গ্রহণ করে নিজেদের পরিভাষা করে নিয়েছেন—'মানা' (Mana)। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 'মানা' অর্থ হলো এই জীবন-সার বা আত্মাবস্তু।

আদিম মানুষের ফিলসফিতে 'মানা' বা আত্মাবস্তু বা জীবন-সার বা সত্তা স্বীকৃত হলো। এই বিশ্বাসের সূত্রে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তত্ত্ব এসে পড়লো। মানা বা জীবনসার থাকে বলেই মানুষ জন্তু বা বৃক্ষ নতুন মানুষ, নতুন জন্তু ও নতুন বৃক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। যার মধ্যে মানা বা জীবনসার নেই সে সৃষ্টি করতে পারে না, সে অনুর্বর। সকল উর্বরতার মূল হলো মানা বা জীবনসার অথবা আত্মাবস্তু। আদিম মনের মনীষার দ্বারা আর একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো—যাকে বলা যায় উর্বরতা থিওরী (Fertility theory)।

আদিম মানুষের ধর্মসংস্কারের দার্শনিকত্ব বলে যদি কিছু থাকে, তবে এই দুটি তত্ত্বই হলো তার প্রধান ভিত্তি—(১) মানা (জীবনসার বা আত্মাবস্তু) থিওরী এবং (২) উর্বরতা থিওরী।

এই থিওরী দুটি দ্বারাই আদিম মানুষের তথা বর্তমান আদিবাসী সমাজ ও হিন্দুসমাজের বহু ধর্মাচারের রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়।

পাথর পূজা

পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে পাথরের স্থান খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। প্রাচীন মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা পাথর পূজার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভাগ করেছেন। যথা, বৃহৎ প্রস্তর (Mega-lithic) সভ্যতা, একপ্রস্তর (Monolithic) সভ্যতা ইত্যাদি। অনুমান করা যায়, প্রথম প্রথম মৃত ব্যক্তির সমাধির ওপর একটি পাথর স্থাপন করে দেবার রীতি প্রচলিত হয়। মৃত ব্যক্তির মানা বা আত্মাবস্তু ঐ পাথরে আশ্রয় গ্রহণ করবে, এই সংস্কার থেকে প্রস্তরীয় সভ্যতার (Lithic-culture) উৎপত্তি। এর মধ্যে উর্বরতা থিওরী রয়েছে। মৃত ব্যক্তির মানা যদি অন্যত্র চলে যায় তবে সমাজ ও ভূমির উর্বরতা কমে গেল, এই ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই পাথর প্রতিষ্ঠার দ্বারা আত্মাবস্তুকে ধরে রাখার পদ্ধতিই একটা ধর্মাচারের রূপ গ্রহণ করে। আত্মাবস্তু সমন্বিত এই পাথর সাধারণ পাথর নয়, শ্রদ্ধেয় পবিত্র পাথর। এই প্রসঙ্গে তুলনা হিসাবে হিন্দুর প্রেতশিলার কথা মনে পড়বে। মেনহির (Menhir), ডোলমেন (Dolmen) ইত্যাদি বিভিন্ন গঠনের ও বিভিন্ন মূর্তির পাথরের যেসব নিদর্শন আজিও দেখা যায়, সে সবই আত্মাবস্তু ও উর্বরতা সংস্কারের প্রতীক এবং বস্তুতঃ লিঙ্গপ্রস্তরের প্রথম রূপ।

এই আত্মাবস্তু সমন্বিত পাথর উর্বরতার প্রতীক হিসাবে আরও সুস্পষ্ট হয়ে লিঙ্গ-প্রস্তর রূপ গ্রহণ করেছে। পাথরের দ্বারা উর্বরতা পূজার আরও স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় যোনি-লিঙ্গ প্রস্তরের কল্পনায়। মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত সিন্ধু-

সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে পাথরের তৈরী যোনি-লিঙ্গ পাওয়া গেছে। খাসিয়া আদিবাসী সমাজেও এই ধরণের প্রস্তর পূজার বিধি আছে, যেটা বস্তুত যোনি-লিঙ্গ পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি স্তম্ভাকার প্রস্তরের ওপরে আর একটি গোলাকার প্রস্তর স্থাপন করা হয়ে থাকে। মণ্ডী ও সুকেত ইত্যাদি নিম্নহিমালয়ের রাজপুত রাজ্যগুলিতেও এই প্রথা আছে। রাজপুতানা, কাথিয়াবাড় ও চম্বা রাজ্যের বহু রাজপুত সমাজে মৃতের সমাধিভূমির ওপর প্রস্তর স্থাপনের প্রথা আজও প্রচলিত।

পাথর পূজা একটি বহু প্রচলিত ধর্ম এবং পাথরের প্রতি একটা ধর্মীয় সংস্কার হিন্দুজনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। যে কোন অদ্ভুত গঠনের পাথর পাওয়া গেলেই সেটা একটা বিগ্রহ হয়ে উঠে। ১৯২৯ সাল ২৫শে এপ্রিল কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মামলার বিচার হয়—জয়পুর পাথরের মামলা।

জনৈক ব্যক্তি জয়পুর থেকে প্রাপ্ত একটা কালো রঙের শ্লেট-পাথর ১০ হাজার টাকায় আর এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করে। পাথরটির মহিমা সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল, এর পূজো করলে সন্তান লাভ হয় ('very efficacious in the matter of getting a son')। কিন্তু যে ব্যক্তি পাথরটি খরিদ করে সে ফল না পেয়ে বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।*

মোকদ্দমাঘটিত এই পাথরটির কেনাবেচার ইতিহাসেও দেখা যাচ্ছে যে, উর্বরতার সংস্কার রয়েছে, পাথরের কৃপায় সন্তান লাভ হবে এই সংস্কার।

প্রাচীন মানুষের প্রস্তরীয় (Lithic) সংস্কৃতি আর একভাবে আর একটা প্রথায় পরিণতি গ্রহণ করেছে। মৃতের সমাধির ওপর পাথর স্থাপন করা হতো আত্মা-বস্তুকে আশ্রয় দেবার জন্য। এই প্রথা আরও উন্নত হয়ে বৃষকাষ্ঠ ইত্যাদি মূর্তি-প্রতীক (Effigy) স্থাপনের প্রথায় পরিণত হয়। তখন শুধু আর পাথর

---

*The Religion & Folklore of Northern India.—Crooke.

নয়—মাটি, ধাতু ও কাষ্ঠের মূর্তিগত প্রতীক স্থাপনের প্রথা প্রচলিত হয়। অর্থাৎ আত্মা-পাথর ক্রমে আত্মা-মূর্তিতে (Soul Figure) পরিণতি লাভ করে। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা সমাজে এবং আসামের আদিবাসী সমাজে এইভাবে আত্মা-মূর্তি স্থাপনের প্রথা প্রচলিত আছে। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মালায়ালীরা ধাতুর তৈরী আত্মা-মূর্তি স্থাপন করে। মহীশূরের হাণ্ডি-যোগী সমাজ মাটির তৈরী আত্মা-মূর্তি স্থাপন করে। বর্তমান হিন্দুর মধ্যেও বৃষকাষ্ঠ কুশপুত্তলিকা ইত্যাদি মূর্তি-প্রতীকের প্রথা প্রচলিত আছে।

আত্মা-পাথর মূর্তি গ্রহণ করলো। দেখা যাচ্ছে যে, আত্মাবস্তু আর বস্তু মাত্র না থেকে সাকার মনুষ্যরূপ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আত্মাবস্তু প্রায় আত্মা-পুরুষ রূপ গ্রহণ করেছে। আদিবাসী গোষ্ঠীদের কল্পনায় আত্মা বলতে সাধারণতঃ এই ধরণের একটি ক্ষুদ্র পুরুষ বোঝায়, যার অধিষ্ঠান হলো প্রত্যেক মানুষের মাথায় ("Soul in a tribal sense is a manikin situated in the head"—Hutton)।

যে সংস্কার থেকে আত্মা-পাথর স্থাপনের প্রথা প্রচলিত হয়েছে, তা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ মৃতের আত্মাবস্তুকে নিজেদের কাছে ধরে রাখার চেষ্টা, যাতে নিজেদের উর্বরতা কমে না যায়। স্বভাবতঃ এই সংস্কার থেকে প্রাচীন মানুষের মনে মৃতের সম্বন্ধে ধারণা থেকে কতগুলি সংস্কার জন্মলাভ করে (Cult of the Dead)। এবং এর স্বাভাবিক পরিণতি হলো পূর্বপুরুষ পূজার (Ancestor Worship) প্রথা।

মৃতের প্রতি সংস্কার এবং পূর্বপুরুষ পূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো উর্বরতাবাদ। গঞ্জাম জেলার শবরেরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্যে একটা আত্মামূর্তি বা বৃষকাষ্ঠ তৈরী করে রাখে। ক্ষেত থেকে ফসল তোলার সময় এই বৃষকাষ্ঠ ফেলে দিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে একটি এক-প্রস্তর (Monolith) স্থাপিত হয়। দেখা যাচ্ছে যে, ফসল তোলার (Harvest) সম্বন্ধে সংস্কার আর মৃত ব্যক্তির

সম্বন্ধে সংস্কার—উভয়ের মধ্য একটা সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের শবরের মৃতদেহ ভূপ্রোথিত করার প্রথা আছে। তারা সারা বছরের মৃতদেহগুলিকে একটা জায়গায় ভিন্ন করে সরিয়ে রাখে। বীজ-বপনের সময় এলে সব মৃতদেহগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূপ্রোথিত বা সমাধিস্থ করা হয়। মৃতের আত্মা-বস্তু যথাসময়ে মাটির মধ্যে প্রবেশলাভ করলো, ফলে মাটির উর্বরতা বা শস্যপ্রসূতা নিশ্চয় বাড়লো। বীজ-বপনের পূর্বে মৃতের আত্মা-বস্তু দ্বারা ভূমিকে যেন উর্বর করে নেওয়া হলো—শবরের শব-সংস্কারের প্রথার মধ্যে এই উবরতার সংস্কার সুস্পষ্ট দেখা যায়।

ক্ষেতে শস্যের শিষ যখন দেখা দিয়েছে, ছোটনাগপুরের ওরাঁওরা সে সময় মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাধিস্থ করে না। ভিন্ন একটা জায়গায় সাময়িক-ভাবে পুঁতে রাখে। পরের বছর, ক্ষেতে শস্যের শিষ দেখা দেবার আগে মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাধিস্থ করা হয়। এটাও আত্মা-বস্তুকে অপচয় থেকে রক্ষা করার ও সার্থক করার সংস্কার। শস্যের শিষ যখন দেখা দিয়েই ফেলেছে তখন আত্মা-বস্তুকে মাটিতে মিশিয়ে অকারণ উর্বরতা প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নেই। বীজ বপনের সময়ই ভূমিকে উর্বর করার জন্য আত্মা-বস্তুকে ভূমিশ্রিত করা প্রয়োজন।

এটা হলো একটা দিক, মৃতের আত্মা-বস্তু ও ভূমির মধ্যে উর্বরতাগত সম্পর্ক। মৃতের প্রতি প্রাচীন মানুষের আর একটা সংস্কার হলো জলের সম্পর্কে। সাঁও-তালেরা মৃতের অস্থি দামোদরের জলে নিক্ষেপ করে, হিন্দুরা গঙ্গার জলে ফেলে, কাছাড়ীরা কপিলি নদীর জলে ফেলে এবং পানোয়ার আদিবাসী নর্মদার জলে মৃতের অস্থি নিক্ষেপ করে। রেংগামা নাগারা মৃতের সমাধির ওপর ক্ষুদ্র একটা জলাধার রচনা করে। প্রায় প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠী মৃতের সমাধির ওপর জল ছিটায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শবসংস্কারের সঙ্গে মাটির মত জলেরও একটা সম্পর্ক রয়েছে। এটাও যে উর্বরতাবাদের সংস্কার সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মাটির

মত জলকেও আত্মা-বস্তু দ্বারা উর্বর করার প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায়, বৃষ্টিকে আহ্বান করার প্রক্রিয়া, যাতে শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায় বা অক্ষুন্ন থাকে।

জলের সঙ্গে উর্বরতার সংস্কার খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। জল উর্বরতার প্রতীক। বৈদিক গর্ভাধানের অনুষ্ঠান দেখা যায় যে স্বামী হাতে দূর্বা নিয়ে স্ত্রীর নাকের ওপর জল ছিটিয়ে দেয়।

রাজা-পূজার সংস্কার

পূর্বপুরুষ-পূজার সংস্কার থেকে রাজা-পূজার সংস্কারের উদ্ভব স্বাভাবিক নিয়ম বলেই মনে হয়। রাজা সাধারণ জীব নহেন, বিশেষ শক্তিমান জীব। কি করে তিনি এত শক্তিমান? তিনি নিশ্চয় বিশেষ ও বেশী পরিমাণে আত্মা-বস্তু ধারণ করেন। তিনি বিগত পূর্বপুরুষদের আত্মা-বস্তুর উত্তরাধিকারী, তাই তিনি বিশেষভাবে শক্তিমান ও বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। রাজা-পূজা (deification of king) আর্য-সংস্কার নয়, ঋগ্বেদে রাজার সম্পর্কে দেবত্ব আরোপের সংস্কার পাওয়া যায় না। রাজা-পূজা হলো সুমেরীয় জাতির সংস্কার [ল্যাংডেন (Langden) নামে জনৈক বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিকের অভিমত]।

মাতৃদেবতার পরিকল্পনা

পূর্বে বলা হয়েছে যে এশিয়া মাইনর থেকে আগত মেডিটারেনীয়ান নরবংশ যেসব ধর্মসংস্কার নিয়ে আসে তার মধ্যে একটি হলো 'মহামাতার' (Great Mother) অস্তিত্বে বিশ্বাস। আত্মাবস্তু আসছে কোথা থেকে? কে এর প্রসূতি? সেই মহাপ্রসবিনী হলেন মহামাতা। এই মহামাতার কল্পনাই পরবর্তীকালে শক্তিতত্ত্বে পরিণত হয়েছে এবং এটা আর্যধর্মের সংস্কার নয়। রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন—শক্তি, বিষ্ণু ও শিবের কল্পনা মধ্যাবর্তবাসী আর্যদের চিন্তা থেকে সৃষ্ট হয় নি।*

* "These originates among a people of different ethnic origin from the midlandic Aryans"—Non Vedic Elements in Brahmanism.

মাতৃ-কল্পনার মধ্যেও উর্বরতাবাদ ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। জীব-প্রসবিনী শক্তির পূজা, যাঁর প্রসাদে শক্তি লাভ হবে। শক্তি অর্থই উর্বরতা, জীবসৃষ্টির ক্ষমতা।

মেডিটারেনীয়ান ধর্ম সংস্কারের এই মাতৃ-কল্পনাটি ভারতের অন্যান্য নরবংশ অর্থাৎ প্রায়-অস্ট্রেলীয় নরবংশজাত মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হয় এবং তাদের ধর্ম সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হয়। বৈগা সমাজের কথা আগে বলা হয়েছে—তারা পৃথিবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করে থাকে, সেইজন্য মাটিকে আঘাত করে লাঙ্গল-চাষ করতে চায় না। হিন্দুধর্মের মধ্যেও একটা সংস্কার রয়েছে। হিন্দুর অম্বুবাচীর তাৎপর্য হলো—আর্দ্রা নক্ষত্রে পৃথিবী রজস্বলা হয়ে থাকেন, সুতরাং সেইদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ, মাটিতে দাগ পর্যন্ত দিতে নেই, কারণ পৃথিবী ব্যথিতা হবেন। উর্বরতাবাদের সুস্পষ্ট উদাহরণ।

মেডিটারেনীয়ান জাতি মাতৃ-কল্পনার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আর একটা প্রথা ভারতে নিয়ে আসে—দেবদাসী প্রথা। দ্রাবিড় সভ্যতায় এই দেবদাসী প্রথা প্রবল হয়ে ওঠে। দেবদাসী প্রথাও উর্বরতাবাদ থেকে উদ্ভূত। অপরের কাছ থেকে আত্মা-বস্তু বা জীবন-সার আহরণ করে নিজ শরীরে সঞ্চারিত করা—এই হলো দেবদাসীর বহুপুরুষ পরিচর্যার দার্শনিক ভিত্তি। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পুরুষের শুক্রকেই সুস্পষ্টভাবে আত্মা-বস্তু বা জীবন-সারের প্রতীক রূপে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

পৃথিবীর বহু আদিমজাতির মধ্যে একটা প্রথা আজও প্রচলিত আছে—স্ত্রী বা আত্মীয়ার দ্বারা অতিথিকে সঙ্গম দান করবার প্রথা। এটাও অতিথির কাছ থেকে আত্মা-বস্তু বা জীবন-সার আহরণ করে উর্বরতা (তথা শক্তি) বৃদ্ধি করার সংস্কার। ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণতঃ এই সব প্রথা নেই, কয়েকটি অতি-অনগ্রসর গোষ্ঠীর মধ্যে আছে।

জীব-বলি ও নরবলি

জীব-বলি ও নরবলি—এ দুটোই উর্বরতাবাদের আচার। বলি আর্য-সংস্কারেরও একটা বড় বিষয়—গো-মেধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি। কিন্তু আর্য-সংস্কারের এই দুটি আচারই হিন্দুধর্মে স্থান লাভ করতে পারে নি। অশ্বমেধ আজ আর কোথাও নেই। দেখা যায়, আসামের গারোদের অশ্ব-বলির প্রথা রয়েছে। আদিবাসী গারো সমাজ প্রাচীন আর্যের কাছ থেকে এই প্রথা নিয়েছিল কিনা কে জানে? আর্য-সভ্যতার গো-বলির আদর্শ ভারতে স্থায়ী হতে পারে নি, কারণ আর্যপূর্ব ভারতের মেডিটারেনীয়ান-প্রভাবিত ধর্মে (যাকে প্রায়-হিন্দুধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে) গরু পবিত্র জীবরূপে মর্যাদা লাভ করেছিল। মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার নিদর্শনে 'শিব' এবং 'বৃষের' মূর্তিকে দেব-বিগ্রহরূপেই দেখতে পাওয়া যায়।

যাই হোক, বলি-প্রথা সকল ধর্মের মধ্যেই ছিল—ভারতে আগত প্রায়-অস্ট্রেলীয়, মঙ্গোলীয়, মেডিটারেনীয়ান এবং হিন্দ্-আর্য ইত্যাদি প্রত্যেকটি নরবংশের ধর্মাচারে বলি-প্রথা একটা প্রধান স্থান অধিকার করেছিল।

এই বলি-প্রথাও উর্বরতাবাদের সংস্কার থেকে উদ্ভূত। বর্তমান অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে এই সংস্কারের সঙ্গে তার একটা লজিকও পাওয়া যায়। 'নিহত জীব হত্যাকারীর মধ্যে প্রবেশ করে' এই হলো বলির দার্শনিক (?) ভিত্তি ("Killed enters the Killer")। জীবের আত্মা-বস্তু বা জীবন-সার হত্যাকারীর মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে হত্যাকারী শক্তিলাভ করে অর্থাৎ উর্বরতা লাভ করে।

আসামের নাগাসমাজের মুণ্ড-শিকার প্রথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শত্রু বধ করে একটি মুণ্ড নিয়ে না আসা পর্যন্ত কোন নাগা যুবক বিবাহের যোগ্য বলে গণ্য হয় না, কারণ সে উর্বরতা লাভ করে নি, সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা সে অর্জন করে নি। মারিয়া খন্দদের মধ্যে এতকাল যে নরবলির প্রথা ছিল তার মধ্যেও

উর্বরতার সংস্কারই প্রধান বিষয়। হিংসার বশে নয়, নরমাংস খাবার লোভে নয়—বিশুদ্ধ একটা জনকল্যাণের আদর্শ নিয়েই নরবলি দেওয়া হতো। অর্থাৎ ভূমি শস্যপ্রসূ হবে, সমাজ সন্তানপ্রসূ হবে ইত্যাদি আদর্শের জন্য নরবলি দিয়ে তার আত্মা-বস্তুকে গ্রহণ করা হতো।

নাগাদের মধ্যে নরমুণ্ড শিকারের (Head Hunting) প্রথা এখনো প্রচলিত রয়েছে।* অতীতে ভীলেরা শত্রুর মুণ্ড এনে গাছে ঝুলিয়ে রাখতো (Raiputana Census Report, 1931)। ১৮৮২ সালে খন্দেরা বিদ্রোহ করে, কারণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাদের 'মারিয়া' বা নরবলি প্রথা বন্ধ করে দেন। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিদ্রোহী খন্দেরা সরকার পক্ষের কয়েকজনকে হত্যা করে বিল্লাট নামক একটি গ্রামে গাছের ওপর মুণ্ড ঝুলিয়ে রেখেছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে নরবলির প্রথা বস্তুতঃ ফসল-পূজার রূপ গ্রহণ করেছে। ভূমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করা অর্থাৎ আত্মা-বস্তু দিয়ে মাটীকে উর্বর করার অনুষ্ঠান। যাকে বলি দেওয়া হলো, তার আত্মা-বস্তু মাটিকে উর্বর করে ফসল ফলিয়ে দেবে—এই উদ্দেশ্য। মারিয়া খন্দেরা নরবলি দিয়ে, তার মাংস টুকরো টুকরো করে ক্ষেতের ওপর এবং নিজেদের শস্য-ভাণ্ডারে ছড়িয়ে দিত।

খন্দদের নরবলি পদ্ধতি ছিল—একটা তাজা গাছের ফাটলের মধ্যে বলির মানুষটিকে চেপে মেরে ফেলা। বলির মানুষটির চোখ থেকে যত বেশী জল পড়বে, ততই বেশী বৃষ্টি হবে, এই বিশ্বাস।

আশ্চর্যের বিষয় জীব-বলির কয়েকটি বিশুদ্ধ বৈদিক পদ্ধতি ও আসামের নাগাদের জীব-বলির পদ্ধতির মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়, অথচ বর্তমান হিন্দুদের মধ্যে এ ধরণের জীব-বলির পদ্ধতি নেই। গারোদের অশ্ব-বলির কথা

* "আসামের নাগাসমাজের মধ্যে মুণ্ডশিকার প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল……কিন্তু ইতিমধ্যে ৪০টী এইরূপ ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে।……তদন্ত করার জন্য আসাম গভর্ণমেণ্ট একজন অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন।

—২৯শে মে ১৯৪৭, এসোসিয়েটেড প্রেস।

পূর্বে বলা হয়েছে। গৃহ্যসূত্রে যে 'শূলগাব' বা শূলবিদ্ধ করে গো-বলির অনুষ্ঠান দেখা যায়, বর্তমান আংগামি নাগাদের 'সেক্রেংগি' নামক বলির পদ্ধতিও তাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'পঞ্চশারদীয় শব' নামক যে বলির অনুষ্ঠান কথিত আছে, তার সঙ্গে নাগাদের 'টেহরেংগি' নামে বলির পদ্ধতির আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।

নরমাংস ভক্ষণ বা ক্যানিবালিজম্

অতি দূর অতীতে এবং অতি অসভ্য বন্য দশাতেও মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষের মাংস খেয়েছে, এমন প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঘ বাঘের মাংস খায় না—এটাই জীবজগতের প্রবৃত্তিগত নিয়ম। কিন্তু তবুও ক্যানিবালিজম্ নামে একটা কথা প্রচলিত আছে, মানুষ কর্তৃক মানুষ খাওয়ার প্রথা।

মানুষ মানুষের মাংস খায়—এ প্রথা পূর্বে ছিল এবং এখনো তার নানারকম রেশ নানা সমাজে আছে। কিন্তু এটা ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যাপার নয়। এটাও একটা ধর্মগত সংস্কার ও আচারের অনুষ্ঠান। বলিপ্রদত্ত মানুষের মাংস প্রসাদ হিসাবেই খাওয়ার নিয়ম ছিল। এটাও উর্বরতাবাদের সংস্কার। যার মাংস খাওয়া হচ্ছে, তার আত্মা-বস্তুটিও সঙ্গে সঙ্গে খাদকের সত্তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে —এই হলো থিওরী। এর ফলে শক্তি ও উর্বরতা লাভ হবে, এই বিশ্বাস।

লুসাইদের মধ্যে প্রথা ছিল—শত্রুকে হত্যা করে তার যকৃৎ জিহ্বা দ্বারা লেহন করা এবং শোণিতলিপ্ত বল্লমের ডগা থেকে রক্ত চাটা। থাডো কুকিদের মধ্যে প্রথা ছিল, শত্রু হত্যা করে শোণিতরঞ্জিত হাত না ধুয়ে, সেই হাতে খাবার খাওয়া। ইন্দোনেশিয়ার ও ওশেনিয়ার আদিম জাতিদের মধ্যে নরশোণিত পানের প্রথা আছে। ১৯৩০ সালে নাসিকের কুখ্যাত ডাকাত নানা ফেরারী ধরা পড়ে। মামলায় প্রকাশ পায় যে, সে হত্যা করার পর তার শোণিতলিপ্ত ছুরি কপালে ছুঁইয়ে তিলক পরতো এবং ছুরির ডগা জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করতো। এই সব আচরণের পেছনে ঐ এক মূল সংস্কার রয়েছে—আত্মা-বস্তুকে আহরণের

তি। নিহত ব্যক্তির শোণিত বা মাংস কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদরসাৎ করে তার 'ত্মা-বস্তুকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করা। কোন কোন রাজপুত রাজবংশের মধ্যে নো একটা প্রথা আছে, অভিষেকের সময় কোন ভীলের রক্ত নিয়ে তিলক রণ। যে ভীলের শরীর থেকে এই তিলকের জন্য রক্ত নেওয়া হয়, সাধারণের রণা, সেই ভীল অল্পকালের মধ্যে মারা যাবে। অর্থাৎ যার আত্মা-বস্তু বদলি য় যায়, সে আর কতদিন বাঁচবে ?

ক্যানিবালিজম্ হলো জীবন্ত মানুষের মাংস ভক্ষণ। কিন্তু আর একটি প্রথা খা যায় যেটা ক্যানিবালিজম্ গোছের ব্যাপার—মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ। াও আত্মা-বস্তু আহরণের সংস্কার থেকে উদ্ভূত। এ বিষয়ে অঘোরপন্থীদের চরণগুলি উল্লেখযোগ্য।

মৃতের দেহের মধ্যেও আত্মা-বস্তু থাকে, এ ধারণা থেকেই মৃতকে সৎকার রা সম্পর্কে নানারকম সংস্কারের উদ্ভব হয়। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা য়ছে। মৃতদেহকে বীজ-বপনের সময় সমাধিস্থ করার প্রথাও উল্লেখ করা য়ছে। মৃতদেহের অভ্যন্তরস্থ মানা বা আত্মা-বস্তু মাটিতে মিশে গিয়ে উর্বরতার ষ্টি করবে, এই হলো মূল বিশ্বাস। ভারতের অনেক আদিবাসীর মধ্যে এই শ্বাস থাকলেও, এই প্রথাটা মৃতের মাংস ভক্ষণে পরিণত হয় নি। এই প্রথা ং হিন্দুধর্মের অঘোরপন্থী সমাজের মধ্যে দেখা যায়। ১৯৩১ সালে বাঁকুড়ায় কটি মামলায় জনৈক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও জনৈক মহাব্রাহ্মণের কারাদণ্ডের আদেশ ।। এরা একটি মৃত শিশুর মাংস রান্না করে খেয়েছিল।

রাঁচীর আর একটি মামলার কথা জানা যায়—কয়েকজন ওরাঁও সমাধি কে এক য়ুরোপীয়ের মৃতদেহ খুঁড়ে নিয়ে চলে যায়। মামলায় জেরার সময়ে রা বলে যে 'সাহেবের হাড্ডি দিয়ে ভাল যাদুর কাজ হবে।' ওরাঁও-দের যুক্তি শ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, যেহেতু য়ুরোপীয় সাহেবদের শরীরে আত্মা-বস্তু শী অথবা উচ্চস্তরের, সেই হেতু তার হাড় দিয়ে উচ্চস্তরের যাদু সম্ভব হবে।

যাদুতন্ত্র

ম্যাজিক বা যাদুতন্ত্রের ভিত্তি হলো আত্মা-বস্তু ও উর্বরতার থিওরী। যার মধ্যে আত্মা-বস্তু নেই, অথবা কমে যাচ্ছে, তার মধ্যে আত্মা-বস্তু সঞ্চার করিয়ে দেওয়াই হলো যাদুতন্ত্র।

যাদুতন্ত্রের ভেতর দিয়ে মানুষ-জাতি তার প্রথম গুরু, যাজক বা পুরোহিতকে পেয়েছে। যাদুতন্ত্রের ভেতর দিয়েই মানুষ-জাতি তার প্রথম ডাক্তার লাভ করেছে। আর একটু পরিষ্কার করে বলা যাক্।

আত্মা-বস্তুর হানি এবং ক্ষয়, এই তো সকল ক্ষতির কারণ। আত্মা-বস্তু কমে গেলেই রোগ হয়, মৃত্যু হয়। আত্মা-বস্তুর হানি হলেই অনুর্বর হয়, সন্তান হয় না। আত্মা-বস্তুর হানি হলে বা কমতি পড়লে ক্ষেতে ফসল হয় না, বৃষ্টি পড়ে না। সুতরাং যেখানে আত্মা-বস্তুর প্রয়োজন, সেখানে তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মা-বস্তুকে আহ্বান ও সঞ্চার করাই হলো ম্যাজিক বা যাদু। যিনি এই অতি কল্যাণকর কাজ করতে পারেন, তিনিই তো গুরু।

আদিবাসী সমাজ যাদুতন্ত্রী সোখা বা ওঝারাই গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত।

যাদুতন্ত্রীর ঠিক বিপরীত হলো ডাইন ও ডাইনী। যাদু হলো পজিটিভ আদর্শ। এর বিপরীত একটা শক্তির কল্পনাও দেখা দিল, যার ফলে মড়ক লাগে, অকালে মৃত্যু হয়, ফসল হয় না ইত্যাদি। অর্থাৎ আত্মা-বস্তুকে লুপ্ত করে বা ক্ষয় করে দেওয়ার শক্তি। এই শক্তির প্রক্রিয়া হলো নেগেটিভ অর্থাৎ এটা একটা অপশক্তি। যারা এই অপশক্তির তন্ত্রে পারদর্শী তারাই হলো ডাইন ও ডাইনী।

আদিবাসী সমাজে এই আদিম সংস্কার প্রবলভাবে বিদ্যমান এবং যখনই সমাজে একটা খারাপ, ক্ষতিকর বা শোকাবহ ঘটনা হয়, তখনই সকলের সন্দিগ্ধ মনে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে—ডাইনের কাজ? কে এই ডাইন? তার সন্ধান দেবে কে?

গোষ্ঠীর সোখা, ওঝা বা দেবকলি ইত্যাদি নামে কথিত গুরুপদবাচ্য ব্যক্তিরাই বিষয়ে সন্ধান ও চূড়ান্ত রায় দিয়ে থাকেন। তাঁর বিচারে যাকে ডাইন বলে হয়, তাকে সমাজ থেকে নির্বাসিত করা হয়, না হয় পুড়িয়ে মেরে হয়।

বর্তমানে ডাইনী পুড়িয়ে মারার ঘটনা খুবই বিরল হয়ে এসেছে, কারণ ভারত ভর্ণমেণ্টের ফৌজদারী আইন এ বিষয়ে সোখার কর্তৃত্ব ও বিচারবুদ্ধির সম্মান পারে নি। ডাইনীতে বিশ্বাস শুধু আদিবাসী সমাজের সংস্কার নয়, বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে এই সংস্কার অল্পবিস্তর প্রচলিত।

টোটেম তত্ত্ব

সাধারণতঃ আদিম জাতিসমূহের মধ্যে টোটেম সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। জীব বা বৃক্ষ এক একটি গোষ্ঠীর টোটেম। টোটেমের নাম অনুসারে নাম হয়ে থাকে। কারও টোটেম ভালুক, কারও শূকর, কারও বাইসন ং কারও বা শালগাছ ইত্যাদি বৃক্ষই হলো বংশগত টোটেম। দেখা যাচ্ছে হলো একাধারে আদিম জাতির আদিপুরুষ এবং গোত্রের পরিচয়। যে র টোটেম ভালুক, তার কাছে ভালুক হলো পবিত্র জীব। ধারণা, কই তাদের আদিপুরুষ। ভালুকের কাছ থেকেই সে তার আত্মা-বস্তুকে য়েছে এবং তাদের আত্মা-বস্তুও ভবিষ্যতে ভালুকের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ রবে।

সৌরাস্ট্রের রাণারা হনুমান বংশীয় বলে দাবী করেন। তাদের পরিচ্ছদে জ ধারণের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল।

টোটেম সংস্কারের ইতিহাস আলোচনা করে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী জেমস্ জার একটা মূল কারণ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর এই থিওরী 'গর্ভ সংস্কার' ওরী ('Conceptional' Theory) নামে পরিচিত। নারী কি কারণে গর্ভবতী , এ সম্বন্ধে আদিম মানুষের মনে বাস্তবসম্মত ধারণা ছিল না। নরনারীর যৌন

সংশ্রবের ফলে যে নারী গর্ভবতী হয়, এ ধারণা এখনো অনেক আদিম জাতি
মধ্যে নেই। আসামের নাগাদের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে
ধারণা নেই। নারীর দেহাভ্যন্তরে আর একটি প্রাণময় শরীরের আবির্ভা
কি করে সম্ভব হলো? কোথা থেকে এই আত্মা-বস্তু আসে? এই প্রশ্ন থেকে
স্বভাবতঃ আদিম মনে একটা ধারণা জন্মলাভ করে। ধারণাটা হলো, কো
জীব বা বৃক্ষ থেকেই এই আত্মা-বস্তু নারীর শরীরে প্রবেশ করে। এইভাবে এ
একটি জীব বা বৃক্ষ আত্মা-বস্তুর আধার বলে কল্পনা করা হয় এবং এই সব জী
বা বৃক্ষই হলো এক একটি গোষ্ঠীর টোটেম। টোটেম জীবকে হত্যা ক
নিষিদ্ধ এবং টোটেম বৃক্ষের ফুল ফল বা পল্লব ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

জন্মান্তর—পুনর্জন্ম—আত্মা-বস্তুর অক্ষয়ত্ব

আত্মা-বস্তু ও উর্বরতাবাদের যে সকল উদাহরণ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ সংক্ষে
বিবৃত হলো, তার ভেতর থেকেই কতগুলি তত্ত্বের আভাষ আমরা দেখতে
পাচ্ছি। এ তত্ত্বগুলি হলো—

(১) আত্মা-বস্তুর দেহান্তর (transmigration of soul-matter)

(২) পুনর্জন্ম বা পুনর্দেহধারণ (Re-incarnation)

(৩) আত্মা-বস্তুর অক্ষয়ত্ব (Indestructibility of soul-matter)

নরবলি বা জীব-বলি এবং টোটেম সংস্কারের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যা
যে, আত্মা-বস্তু এক দেহ থেকে অন্য দেহে চলে যায়, এই বিশ্বাস আদিম মানুষে
মনে স্থান লাভ করেছিল।

ফ্রেজার সাহেবের গর্ভসংস্কার থিওরী অনুযায়ী টোটেম তত্ত্বের মূলক
হলো—আত্মা-বস্তু নতুন দেহ ধারণ করে মাতৃগর্ভ থেকে আবার ভূমিষ্ঠ হয়
এটা স্পষ্টতঃ পুনর্জন্মবাদের সংস্কার।

আদিবাসীদের মধ্যে ভুঁইয়া গোষ্ঠীর ধারণা হলো—নবজাত শিশুরা হ
মৃত আত্মীয়ের নতুন দেহ। লুসাইদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, মৃত ব্যক্তি জী

লের দেহ ধারণ করে তাদের চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুন্‌বি গন্দ গোষ্ঠীর ধ্যে একটা প্রথা আছে—কোন ব্যক্তির মৃত্যুর অল্প কিছুক্ষণ পরেই তারা াতের ধারে মাছ এবং পোকা অন্বেষণ করে। তাদের ধারণা মৃত ব্যক্তির াত্মা-বস্তু এই মাছ ও পোকার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

মানা, আত্মা-বস্তু ও জীবন-সার—আদিম মানুষের চিন্তায় কল্পিত এই 'সত্তা' ক দেহ থেকে অন্য দেহে বদলি হতে পারে, নতুন দেহ ধারণ করে জন্মলাভ রতে পারে। সুতরাং এই বিশ্বাসের মধ্যেই আর একটা তত্ত্ব স্বীকৃত হচ্ছে—াত্মা-বস্তু মরে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। এটাও বলি-প্রথা, ন্তু নরবলি নয়, জীব-বলিও নয়—আত্মবলি প্রথা।

আত্মবলি প্রথা

মিঃ ফরসাইথের পুস্তকে (Highlands of Central India) এ বিষয়ে তগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৮৮২ সালে জনৈক আদিবাসী যুবক মান্ধাতা হাড়ে একটা ৯০ ফুট উঁচু পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে মৃত্যুবরণ করে। লিটিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন ডাগলাস নিজে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে-লেন। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার উদ্দেশ্য ছিল—মৃত্যুবরণ করার পর কোন রাজবংশে পুনরায় জন্ম লাভ করবে। গিড়িচূড়া থেকে লাফিয়ে াত্মহত্যা করার প্রথা আমেরিকার কোন কোন আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে একটা াপক প্রথারূপে বর্তমান ছিল।

আত্মবলির প্রথাই আবার নানারকম কৃচ্ছ্রসাধনার রূপ গ্রহণ করেছে। নিজ হকে পীড়িত করার প্রথা ধর্মাচরণের রূপে বহু জাতির মধ্যে এবং বর্তমান দুসমাজের মধ্যেও রয়েছে। আত্মবলি বা আত্মনিগ্রহ প্রথার সঙ্গে সঙ্গে র একটা সংস্কারের উদ্ভব দেখতে পাওয়া যায়। পুণ্যের সংস্কার—আত্মবলি

দিলে বা আত্মনিগ্রহ করে এমন একটা শক্তি লাভ নিশ্চয় হয়, যার বলে উন্ন
জীব বা মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম লাভ হবে—এটা পুণ্যবলের সংস্কার ছাড়া আর কি ?

হিমালয় সংলগ্ন ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে একটি যাযাবর শ্রেণীর সাক্ষ্য
পাওয়া যায়, যাদের জীবিকা হলো দড়ি-নাচ (Rope Dancing)। কলকাত
সহরেও এরা দড়ি-নাচ দেখাতে মাঝে মাঝে আসে। এরা বেদা নমে পরিচি
এবং এরা আর একটা কৌশল দেখায় যেটা 'বেদুয়ার্ত' নামে পরিচিত—দড়ি
সাহায্যে উচ্চস্থান থেকে সবেগে নীচে নেমে আসা (Rope Sliding)।

বর্তমান এই দড়ি-নাচ ও দড়ি-নামা প্রথা দুটি, এক দল যাযাবর লোকে
জীবিকার বৃত্তিরূপে অবশ্য পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর একটা ঐতিহাসি
পরিচয়ও আছে। দড়ি-নামা প্রথাটি বস্তুতঃ প্রাচীন কালের উচ্চস্থান থে
লাফিয়ে আত্মহত্যার প্রথারই ভিন্ন একটা রূপ। এখনও ভারতের কোন কে
গ্রামাঞ্চলে, ক্ষেত্রে বীজবপনের পূর্বে বেদুয়ার্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বেদা দু
স্নান করে, নববস্ত্র পরিধান করে, ক্ষেতের ওপর ঘুরে আসে, তারপর অনুষ্ঠ
দেখায়—লম্বমান দড়ি ধরে উঁচু স্থান থেকে সবেগে নীচে নেমে আসে। তার
বেদার চুল এবং ঐ দড়ির টুকরো ক্ষেতের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দে
যাচ্ছে যে, বেদার চুল এবং নাচের দড়িকে যাদুপূত বস্তু বলে মনে করা হচ্ছে—য
মধ্যে উর্বরতা বিধায়ক গুণ আছে। বস্তুতঃ ক্ষেতকে শস্যপ্রসূ করার জন্যই
অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মধ্যে উর্বরতাবাদ, আত্মা-বস্তু এবং যাদুতন্ত্র—সব সংস্কা
গুলিরই সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। বেদা আত্মহত্যার অভিনয় করে যে শ
(পুণ্য ?) লাভ করলো তার জোরে সে আত্মা-বস্তুকে দড়ি ইত্যাদি বস্তুর ম
সঞ্চার করেছে এবং সেই যাদুপূত আত্মা-বস্তুসমন্বিত পবিত্র বস্তু ক্ষেতের ও
ছড়িয়ে দিয়ে উর্বরতা সাধন করা হলো।

নট নামে ভারতবর্ষে যে যাযাবর গোষ্ঠী আছে, তাদের পুরুষদের জীবিকা
দড়ি-নাচ এবং মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি। সুপ্রাচীন কালের শস্যোৎপাদন

। সকল উর্বরতা-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল নটদের মধ্যে যেন সেই অনুষ্ঠানগুলির ঐতিহ্য রয়ে গেছে।

নৃত্য—একটি উর্বরতা অনুষ্ঠান

নৃত্য প্রথমে যাদুতন্ত্র হিসাবেই দেখা দেয়। নৃত্য আত্মা-বস্তু আহরণ ও সঞ্চার করার একটি পদ্ধতি। প্রতি আদিম জাতির ফসল উৎসবের সঙ্গে নৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এই তত্ত্ব প্রমাণ করছে। নৃত্যও একটি উর্বরতা অনুষ্ঠান (fertility rite)। নৃত্যের দ্বারা আত্মা-বস্তুকে ভূমিতে শস্যে ও নিজ দেহে আহরণ ও সঞ্চার করা হয়।

নৃত্য সম্বন্ধে নাগাদের একটা সংস্কার উল্লেখযোগ্য। নাচের সঙ্গে উঁচু লাফ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো শস্যের শিষকে বাড়িয়ে তোলা। নাচ যত ভাল হবে ধান তত ভাল হবে। স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে শস্যবৃদ্ধির যাদু হিসাবে নৃত্য সামাজিক আচরণে পরিণত হয়েছে।

গন্দদের জন্তু-নৃত্যও উল্লেখযোগ্য। অরণ্যের জন্তুর মাংস গন্দদের একটা প্রধান খাদ্য, জীবন ধারণের উপাদান। সুতরাং হরিণ, নীলগাই, খরগোস ইত্যাদির গতিভঙ্গীর অনুকরণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে জন্তুর মুখোস পরিধান করে যে ধরণের নাচ প্রচলিত আছে, সেটাও উর্বরতাবাদের ম্যাজিক—অর্থাৎ জঙ্গলে জন্তু বৃদ্ধি করার অনুষ্ঠান।

শিকার-উৎসব

নৃত্য নামে যাদুতন্ত্রের অনুষ্ঠানটি ঋতু-উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে, তেমনি শিকারও যাদুতন্ত্রসম্মত ঋতু-উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে। রাজপুত সমাজের আহেরিয়া, বিহার অঞ্চলের জুড়শীতল, ছোটনাগপুরের বসন্তকালের শিকার, আংগামি নাগার সেক্রেংগি শিকার—এ সবই সামাজিক সমষ্টিগত শিকারের অনুষ্ঠান, বিশেষ ঋতুতে দলবদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঋতু-শিকারোৎসবের উদ্দেশ্য হলো—আগামী বৎসরের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। দলবদ্ধভাবে উৎসবের

রূপে শিকার করে বহু জন্তু বধ করা হয়। তার ফলে জন্তুর আত্মা-বস্তু সমাজের সকলের দেহে সঞ্চারিত হলো। বৎসরের আরম্ভেই জীবনকে নতুন শক্তিতে শক্তিমান করে তোলার উৎসব। ঋতু-শিকারোৎসব যে উর্বরতাবাদের যাদুতন্ত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হিন্দু সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের পরিণাম

১৯১২ সালে বিলাসপুরে জমিদারী অঞ্চলের জরিপ রিপোর্টে মিঃ উইলস্ (Mr. C. U. Wills) এই মন্তব্য করেছেন: "বিলাসপুরের জমিদারেরা বংশের দিক দিয়ে কাওয়ার গোষ্ঠীর আদিবাসী। ব্রিটিশ যুগে বৈষয়িক অবস্থায় উন্নত হয়ে আজকাল তারা নিজেদের কানোয়ার ক্ষত্রি বলে পরিচয় দেয়, উপবীত ধারণ করে এবং মোটামুটি হিন্দুধর্ম্মের রীতিনীতি মেনে চলে। .... পাইকরা কানোয়ার নামক গোষ্ঠী, জমিদারী অঞ্চলের উত্তর ভাগে বহু সংখ্যায় রয়েছে এবং এদের অবস্থা বেশ ভাল। হিন্দুধর্ম্ম আদিম অধিবাসীকে কতখানি সামাজিক সুরুচি, আত্ম-মর্য্যাদাবোধ, সংযম, মিতব্যয়িতা ও শ্রমকুশলতার শিক্ষা দিতে পারে, তার দৃষ্টান্ত পাইকরা কানোয়ার।"

নৃতত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, যিনি আদিবাসী অঞ্চলে হিন্দু জমিদারী পত্তনের কুফল সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, তিনি মন্তব্য করেছেন যে—"রাঁচী জেলায় পূর্ব পরগণাগুলিতে হিন্দুদের সংস্পর্শে আসায় মুণ্ডারা সভ্যতর অবস্থায় উন্নীত হতে পেরেছে।" (১)

জমিদারী প্রথা আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে এবং জমিদারেরা প্রধানতঃ হিন্দু। এই কারণে আদিবাসীদের দুঃখের কারণটাকে সোজাসুজি 'হিন্দু-আক্রমণ' বলে যাঁরা মন্তব্য করেন. তাঁদের বিচার ঠিক হয় না। হিন্দু সান্নিধ্যের ফলে আদিবাসী সমাজের অন্য যে সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছে, তার মর্য্যাদাও অনেক সমালোচক উপলব্ধি করতে পারেন না।

কোল্হানের হো সমাজ সম্বন্ধে ১৯১০ সালে ও' ম্যালি (O' Malley) লিখেছেন: "হো সমাজ নিজেদের গোষ্ঠীগত ধর্মমত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়িয়ে আছে এবং খুব কম সংখ্যক হো খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।......অপর দিকে

(1) Mundas and Their Country......S. C. Roy.

হিন্দুধর্মের দিকে একটা আগ্রহের ভাব এদের মধ্যে দেখা যায়, বিশেষ করে 'জাত' প্রথার (Caste) প্রতি। একদল হো ব্রাহ্মণকে উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলে সম্মান দিয়ে থাকে।...বিগত সেন্সাসে অনেক হো নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। হিন্দু দেবদেবীর প্রতি এরা বিশ্বাস পোষণ করে এবং অনেকে উপবীত ধারণ করতে আরম্ভ করেছে।" (২)

আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে যারা হিন্দুত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু রীতিনীতি গ্রহণ করে, তার মধ্যে একটা ব্যাপার খুব সহজভাবেই চোখে পড়ে। হিন্দুর ভাল প্রথা গ্রহণ করার সঙ্গে হিন্দুর মন্দ প্রথাগুলিও আদিবাসীরা গ্রহণ করে থাকে। ডাঃ ডি এন মজুমদার হো সমাজের সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে জানা যায় যে—'হো সমাজ এক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে মেয়েদের পক্ষে বাজারে কাজ করতে যাওয়া নিষিদ্ধ করে।' এই প্রস্তাবকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, এটা বুঝি 'নারীর অধিকার সঙ্কোচে'র জন্য একটা কু-সংস্কারাপন্ন গোঁড়া মনোভাব। এল্যুইন সাহেবের মত সমালোচকেরা এই সব ঘটনাকেই হিন্দু সংস্পর্শের কুফল বলে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু যখন খোঁজ করে জানা যায় যে, হো সমাজে পুরুষেরা আলস্যপরায়ণ এবং মেয়েদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, তখন মেয়েদের পক্ষে ঘরে থাকা এবং পুরুষদের পক্ষে বাইরে খাটতে যাওয়া হোদের সামাজিক পরিণামের দিক দিয়ে প্রগতিশীল পরিবর্তন বলে অবশ্যই স্বীকৃত হবে। এই উদাহরণটি বাদ দিয়েও একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, আদিবাসী সমাজ হিন্দু সমাজের দেখাদেখি অনেক কুপ্রথাও গ্রহণ করেছে। 'হো' সমাজে অনেক 'কাজোমেসিন' বা জাতিচ্যুত পতিত পরিবার ছিল। সম্প্রতি আদিবাসী সমিতির নির্দেশে পতিত পরিবারগুলিকে সমাজভুক্ত করা হচ্ছে। (৩)

(2) District Gazetter of Singbhum.

(3) Dr. D. N. Majumder, Hindusthan Quarterly, Jan.-Mar, 1944.

মদ্যপানের অভ্যাস আদিবাসী সমাজের আর্থিক দুর্গতির একটা বড় কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আদিবাসীদের অনেক গোষ্ঠী সুরা বর্জনের আন্দোলন করে সমাজকে দোষমুক্ত করার চেষ্টা করেছে। ১৮৭১ সাল থেকেই উড়িষ্যার খন্দ সমাজ লেখাপড়া শেখবার জন্য এবং সুরাপান প্রথা দমনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ১৯০৮ সালে তারা সকলে সুরাপান বর্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে এবং মদের দোকানগুলি বন্ধ করে দেবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করে। গভর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ অবশ্য উপেক্ষা করেন নি। (৪)

হিন্দুর সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের মোটামুটি অধঃপতন হয়েছে, না উন্নতি হয়েছে, অনেকে এই প্রশ্ন করেছেন এবং অনেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এল্যুইন প্রমুখ কয়েকজন প্রচারক-নৃতাত্ত্বিক আছেন যাঁরা সোজাসুজি প্রচার করে থাকেন যে, হিন্দু সংস্পর্শের ফলেই আদিবাসীরা রসাতলে যেতে বসেছে। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বরং এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু সংস্পর্শের জন্য আদিবাসীদের উন্নতিই হয়েছে। হিন্দুর সংস্পর্শে যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী আসেনি, তারা কোন স্বর্গীয় অবস্থায় বাস করে না। এ বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত যাচাই করে দেখতে পারি, তাঁরা কি বলেন?

ও' ম্যালি (O' Malley) লিখেছেন—"হিন্দুত্ব গ্রহণ করে আদিবাসীরা মিত ও সংযত জীবনের প্রথম ধাপ খুঁজে পায়, কারণ হিন্দুধর্মীয় নীতির প্রভাবে মদ্য পানের আসক্তি খর্ব হয়, কারণ হিন্দুদের মধ্যে সভ্য নীতিসঙ্গত জীবনের একটা আদর্শ রয়েছে।" (৫)

এক মুখে হিন্দু সংস্পর্শের এই সুফল স্বীকার করেও ও' ম্যালি আর এক মুখে একগাদা কুফলের বর্ণনা করেছেন। 'হিন্দুর সংস্পর্শে এসেই আদিবাসীদের ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ লোপ পায় এবং তারা বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কুপ্রথা গ্রহণ

---

(4) Aborigines & Their Future—G. S. Ghurye.

(5) Modern India and the West.

করে অবনত শ্রেণী হয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা ছোট জাত হিসাবে স্থান গ্রহণ করে।'

এই বিষয়ে অন্যান্য সমালোচক কয়েকজনের অভিমত দেখা যাক্। মিঃ সিমিংটন (Mr Symington) যে মন্তব্য করেছেন, সেটাও দু' মুখো ভাষ্য হয়ে উঠেছে। তিনি একবার বলেছেন,—"বাইরের পৃথিবীর সংস্পর্শ থেকে যে সব আদিবাসী গোষ্ঠী দূরে সরে আছে, তারাই সুখী ও স্বাধীন। যেখানে তারা উন্নততর শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই তারা ভীরু ও অবনত হয়েছে এবং শোষিত হয়েছে।' কিন্তু এ হেন সিমিংটনও বলেন—"চোপড়া অঞ্চলে ভীলেরা রাজপুত কুন্‌বিদের (চাষীদের) সংস্পর্শে এসে তাদের কৃষিকাজের পদ্ধতি ও অন্যান্য অনেক সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রণালীতে উন্নতিলাভ করেছে।" (৬)

কিন্তু কর্ণেল ডাল্টন (Col. Dalton) বলেন—'খেড়িয়া গোষ্ঠীর মধ্যে যারা ছোটনাগপুরের জমিদারী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে তারা অন্যান্য দূরবিচ্ছিন্ন খেড়িয়াদের চেয়ে সভ্যতায় অনেক বেশী উন্নত।' (৭)

খেড়িয়াদের মধ্যে দুধখেড়িয়া নামে একটি শাখা আছে। এরা রায়ত হয়ে চাষবাস করে এবং হিন্দুর সংস্পর্শে ব্যবসায়িক লেনদেন করে হিন্দুদের সঙ্গে একই স্কুলে শিক্ষালাভ করে থাকে। এই সংস্পর্শের ফলে দুধখেড়িয়াদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। 'হিন্দু প্রতিবেশীর কাছ থেকে অনেক সাংস্কৃতিক বিষয় আহরণ করে খেড়িয়ারা নিজ সমাজে আত্মস্থ করেছে।' (৮)

হিন্দুর সংস্পর্শ আদিবাসী সমাজের ওপর মোটামুটি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, এই সমস্ত বিবরণ থেকে সংক্ষেপে এইভাবে তার একটি পরিচয় বিবৃত করা যেতে পারে :

---

(6) Report on the Aboriginal & Hill Tribes of the Partially excluded Area in the Province of Bombay, 1939.

(7) `Census of India—1930. Bihar & Orissa.

(8) Kharia—S. C. Roy & R. C. Roy.

'হিন্দুর সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজ যতটুকু প্রভাবিত হয়েছে তার ফলে তারা মোটামুটিভাবে উন্নত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সমাজ সংস্কার, শিক্ষার প্রসার ও ধর্মীয় মতবাদের সংস্কারের চেষ্টা করছে। পানোন্মত্ততার অভ্যাসকে খর্ব করেছে। উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে এসে জাত-প্রথা গ্রহণ করেও তারা উপরে উঠবার চেষ্টা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে।...শুধু যদি হিন্দুর দ্বারা জমি গ্রাসের ব্যাপারটা না থাকতো (যেটা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থারই পরিণাম) তাহলে হিন্দুর সংস্পর্শ লাভ করে আদিবাসীরা সম্পূর্ণ মঙ্গলকর উন্নতিলাভ করতো।' (৯)

আদিবাসীরা নিজেদের সম্বন্ধে 'হিন্দু' আখ্যা দিতে কতখানি উৎসাহী তার কতগুলি প্রমাণ উধৃত করা হলো:

(ক) খাড়িয়াদের মধ্যে শতকরা ৩৬ জন 'হিন্দু' হিসাবে পরিচয় দেয়, শতকরা ৪৪ জন খৃস্টান হিসাবে। (১৯৩১ সালের সেন্সাস)

(খ) উড়িষ্যার খন্দদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয় (১৯১১ সালের সেন্সাস)। "বিহার ও উড়িষ্যার খন্দদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন 'হিন্দু' হিসাবে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(গ) ওঁরাও আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৪১ জন 'হিন্দু' বলে এবং শতকরা ২০ জন খৃস্টান ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(ঘ) সাঁওতালদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। শতকরা '০১-এর চেয়েও কমসংখ্যক খৃস্টান হিসাবে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(ঙ) যুক্তপ্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যার সমস্ত খন্দ নিজেদের 'হিন্দু' ব'লে পরিচয় দেয়। মধ্য ভারতে শতকরা ৭৪ জন খন্দ 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয় এবং মধ্য প্রদেশের শতকরা ৪৬ জন। মোট কথা ভারতের সমগ্র খন্দ সমাজের শতকরা ৫৩ জন 'হিন্দুত্বের' দাবী করে। সমগ্র খন্দ সমাজের মধ্যে মাত্র ৩৫

(9) The Aboriginals & Their Future—G. S. Ghurye.

জন 'খৃস্টান' বলে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, খৃস্টান মিশনারীদের উদ্যোগের ব্যর্থতা, কারণ ১৮৪০ সাল থেকেই খৃস্টান মিশনারীরা খন্দদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করে আসছে।

(চ) কাওয়ার গোষ্ঠীর আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৬ জন 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সেন্সাস)।

(ছ) ভীলদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন 'হিন্দু' হিসাবে পরিচয় দেয়। সমস্ত ভীল সমাজের মধ্যে মাত্র ১৩ জন খৃস্টান পাওয়া যায় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

মানভূমের ভূমিজ কোলেরা হিন্দু হয়ে গেছে। তাদের ভাষা বাঙলা এবং তাদের সমাজপতিরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। তারা দ্রুত অধিকাংশ হিন্দু উৎসবগুলিকে গ্রহণ করে ফেলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গোষ্ঠীগত নৃত্যগীতের অনুশীলনও বজায় রেখেছে। নৃত্যগীতের প্রতি তাদের 'কোলসুলভ' অনুরাগের কোন হ্রাস হয় নি। (১০)

ভুঁইয়ারা নিজেদের 'হিন্দু' ব'লে মনে করে। ভুঁইয়া সমাজের বিশিষ্ট জমিদার ও সর্দারেরা নিজেদের রাজপুত বলে পরিচয় দেয় এবং রাজপুত মর্যাদাও দাবীও করে। (১১)

ও' ম্যালি বলেন: খন্দমলের খন্দেরা সব দিক দিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম উপজাতি হয়েই রয়েছে। কিন্তু পুরীর খন্দেরা এমন হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে গেছে যে, তাদের দেখে নিম্ন জাতের উড়িয়া বলেই মনে হবে। তারা যে শুধু নিজেকে সৎ হিন্দু বলে মনে করে তা নয়, গোঁড়া হিন্দু প্রতিবেশীরাও তাদের হিন্দু বলে মনে করে। গোঁড়া হিন্দুরা এই খন্দদের গ্রামে বা গৃহে অবস্থান করতে আপত্তি করে না। (১২)

বিলাসপুর জেলায় হিন্দুর হোলি উৎসবে আগুন জ্বালবার ভার সাধারণতঃ বৈগা, খন্দ প্রভৃতি আদিবাসী লোকের ওপর দেওয়া হয়। খেরমাতা, হনুমান

(10) Chotanagpur—Risley.

(11) The Story of an Indian Upland—Bradley-Birt.

(12) Modern India & The West—O' Malley.

প্রভৃতি পল্লী দেবতার পূজো করবার পুরোহিতকে ভুমকা, ভুমিয়া অথবা ঝানকার বলা হয়ে থাকে। এই পুরোহিত বা ঝানকার আদিবাসী গোষ্ঠীর লোক। সম্বলপুর জেলায় সাধারণতঃ বিঁঝোয়ার গোষ্ঠীর লোকেরা ঝানকার হয়ে থাকে। মান্দলা ও বলাঘাট জেলায় বৈগারাই ঝানকার হয়ে থাকে; 'ঝানকার' পুরোহিতেরা গ্রামের হিন্দু সমাজে মোটামুটি ভাল রকমেই মর্যাদা লাভ করেছে। এই প্রথা অবশ্য এখন দিন দিন কমে আসছে। ঝানকার পুরোহিতেরা প্রত্যেক হিন্দু এবং আদিবাসী গেরস্থের কাছ থেকে বার্ষিক বৃত্তি (শস্য) লাভ করে।

দেখা যাচ্ছে, যে সব অঞ্চলে সাধারণ ভারতীয় ও আদিবাসী উভয় সমাজকে নিয়ে মিশ্র বসতি আছে, সেখানে পারস্পরিক একটা যোগাযোগের ফলে উভয়ের পূজ্য নতুন নতুন দেবতাও তৈরি করা হয়েছে এবং উভয়েই আদিবাসী 'ঝানকার' পুরোহিতের যজমান হয়ে উঠেছে। মিঃ শুবার্ট (Shoobert) ১৯৩১ সালের মধ্য-প্রদেশ ও বেরারের সেন্সাসের রিপোর্টে মন্তব্য করে গেছেন যে, অনেক প্রথা এবং বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে যে সব সংস্কার, কৃত্য ও আচার আছে, সেগুলি মধ্যপ্রদেশের এক একটা অঞ্চলে এক এক রকম। এই বিষয়ে জাতি হিসাবে বেশী পার্থক্য নেই, অঞ্চল হিসাবেই পার্থক্য। একই অঞ্চলের হিন্দু ও আদিবাসী এ বিষয়ে মোটামুটি একই রকমের প্রথা পালন করে।

কোরকুরা হোলি উৎসব পালন করে এবং আখাতিজ বা অক্ষয়তৃতীয়া থেকে তাদের কৃষি বৎসর আরম্ভ হয়। কোরকুরা হিন্দুর ছুৎমার্গও গ্রহণ করেছে, চামার, তেলি ও মুসলমানের ছোঁয়া জল তারা পান করে না। কোরকুদের মধ্যে এই সংস্কার প্রচলিত আছে যে, মহাদেব পাহাড়ে বসতি করবার জন্যে রাবণের অনুরোধে মহাদেব কোরকুদের সৃষ্টি করেছিল। ভীল সমাজের মধ্যে অনেকে এত বেশী হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে যে, তারা রাজপুত জাত ব'লে দাবী করে।

বর্তমান হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেছে—জাত-পাত-তোড়ক মনোভাব। হিন্দু সমাজে যাকে নিম্ন জাত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, তারা আর চুপ করে এই নিম্নত্ব মেনে নিতে রাজী নয়। তারা ওপরে

উঠতে চাইছে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই ওপরে ওঠবার পদ্ধতি হিন্দুর সামাজিক কাঠামের প্রণালীসঙ্গত। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে যাওয়া—কিন্তু স্তরচ্যুত হওয়া কখনই নয়। নিম্ন জাতের হিন্দুরা শ্রেণী-মর্যাদা উন্নীত করার জন্য উচ্চ শ্রেণীর জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি গ্রহণ করে। আদিবাসীরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে হিন্দু সমাজে প্রবেশ ক'রে থাকে এবং প্রবেশ করার পর এক স্তরে থেকে ওপরের এক স্তরে উন্নীত হবার চেষ্টা করে। উপবীত গ্রহণ ক'রে, হিন্দু সমাজের বিশেষ দেবতা বা উৎসব গ্রহণ ক'রে, হিন্দুর জন্ম-মৃত্যু-বিবাহঘটিত সংস্কার ও প্রথা গ্রহণ ক'রে, কোন মুনি, ঋষি বা ভক্ত সাধকের সঙ্গে গোত্রত্ব দাবী ক'রে—শিখাধারণ, নিরামিষ ভক্ষণ ইত্যাদি কোন না কোন বিশিষ্ট হিন্দু পদ্ধতির সাহায্য নিয়েই এই জাতগত উন্নয়ন সম্ভব হয়ে থাকে। মিঃ শুবার্ট মধ্যপ্রদেশের সেন্সাস রিপোর্টে (১৯৩১) মন্তব্য করেছেন যে, নিম্নজাতের হিন্দুরা, যারা পূর্বে উপজাতীয় ধর্ম অনুসরণ করতো, তারা হিন্দু সমাজে আর নীচু হয়ে থাকতে চায় না। যে সব সামাজিক অধিকার তারা পূর্ব্বে লাভ করতে পারে নি, বর্তমানে নিজের উদ্যোগে সে সব অধিকার আদায় করার জন্য এদের মধ্যে একটা উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

ছোট একটি ঘটনার বিবরণ এই প্রসঙ্গের উপসংহারে উধৃত করা গেল। এই ঘটনা বস্তুতঃ অনুরূপ শত ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আদিবাসী জাতির মধ্যে হিন্দুসমাজভুক্তির যে বিরাট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলেছে, এই ঘটনা সেই বৃহত্তর পরিণামেরই একটি ছোট প্রতিবিম্ব।—"গত ১৮ই বৈশাখ মানভূমের জানবাজার থানার কয়েকটি গ্রামে আদিম শবর হিন্দুগণ সমবেত হইয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণান্তে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া সভাস্থ সকল সম্প্রদায়ের নিকট পরিচয় দেয় ও তাহা সভাস্থ সকলেই মানিয়া লয়।"—(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪।)

খৃষ্টান মিশনারী ও আদিবাসী

খৃস্টান মিশনারী বা ধর্মপ্রচারকের দল ভারতে আগমন করেন তখনই, যখন ভারতের কোন কোন অংশে ইংরাজের রাজনৈতিক আধিপত্য ভিত্তিলাভ করেছিল। বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচারের আবেগ ছাড়াও খৃস্টীয় ধর্মপ্রচারকের মনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল। খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ যে একটা অতি উচ্চ ধরণের আদর্শ, খৃস্টান পাদরী সমাজ সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। ভারতবর্ষের লোক খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে এবং ইংরাজ শাসনে থাকলে উন্নত হবে, এ বিশ্বাস পাদরী সমাজ আন্তরিকভাবেই পোষণ করতেন। কিন্তু ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তাঁদের ধর্মপ্রচার কখনই প্রসার লাভ করতে পারবে

এরপর মিশনারীদের উদ্যোগ অবনত হিন্দুসমাজের দিকে ধাবিত হয় এবং এক্ষেত্রেও তাঁরা সামান্য রকম সাফল্য অর্জন করেন। তারপর আদিবাসী সমাজ খৃস্টীয় পাদরী সমাজের ধর্মাভিযানের লক্ষ্য হয় এবং আদিবাসী সমাজের এক বৃহৎ অংশকে ধর্মান্তরিত করতে তাঁরা সক্ষম হন।

খৃস্টান পাদরী সমাজ ধর্মান্তরিত আদিবাসীর কিছু কিছু উপকার যে করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শিক্ষার বিস্তারে পাদরী সমাজ যথেষ্ট উদ্যোগ করেছেন। আদিবাসী সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা নিয়ে পাদরী সমাজ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করেন নি এবং সেটা বোধ হয় তাঁদের কর্মপদ্ধতির বিষয় নয়।

কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে দলে দলে খৃস্টধর্ম গ্রহণের পালা বহুদিন হলো বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে যে হারে ধর্মান্তর ঘটছে, সেটা ছুটকো ঘটনা মাত্র, দলে দলে ধর্মান্তরের (Mass Conversion) ব্যাপার নয়। কিন্তু খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের ...দ্যোগ ও আড়ম্বরে বিশেষ কোন শৈথিল্য এখনো আসে নি। বহু চার্চ, বহু ...জক সম্প্রদায়, বহু প্রতিষ্ঠান ও উপ-প্রতিষ্ঠান এখনো কাজ করে চলেছে।

খৃস্টান পাদরী সমাজের মনোভাব ও আচরণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে তিনটি কথা বলবার আছে এবং এই তিনটি ক্রটির জন্যই পাদরী সমাজের কৃতকার্যতার ভরসা বস্তুতঃ একরকম শুদ্ধ হয়ে গেছে।

(১) পাদরী সমাজ বর্তমানে খৃস্টান ও অখৃস্টান আদিবাসীদের প্রতি আচরণে এমন বৈষম্য দেখিয়ে থাকেন, যার ফলে অখৃস্টান আদিবাসী সমাজ পাদরীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাব অটুট রাখতে পারে না। অখৃস্টান আদিবাসীদের পাদরী-বিরোধী মনোভাব পাদরীদের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রকে অনুর্বর করে রেখেছে।

(২) পাদরী সমাজ আদিবাসীদের মনে হিন্দুবিরোধী তথা ভারত-বিরোধী ধারণা প্রচার করে থাকেন। আদিবাসীকে একদিকে বিশুদ্ধ ইংরাজ রাজভক্ত করা এবং অপরদিকে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী করা—পাদরী সমাজ এই অনধিকার চর্চা কম করেন নি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও খৃস্টান আদিবাসীদের নিয়ে একটা রাজভক্ত ফৌজ গঠন করিবার পরিকল্পনায় পাদরী সমাজও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

(৩) ধর্মপ্রচারক হয়েও পাদরী সমাজ তাঁদের সাহেবী আভিজাত্য ছাড়তে পারেন নি এবং আদিবাসীর মনও এই কারণে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের উচ্চ জাতিত্বের অহংকার অনেক সময় আদিবাসীর মনকে হিন্দুসমাজের প্রতি সন্দিগ্ধপরায়ণ করেছে, একথা সত্য। কিন্তু পাদরী সমাজের আচরণের মধ্যেও আদিবাসীরা জাতিগর্বের (Race Pride) ঝাঁজটুকু সহজেই লক্ষ্য করতে পেরেছে। সেজন্য খৃস্টান হবার জন্য বর্তমানের আদিবাসী কোন সামাজিক প্রেরণা অনুভব করে না। আদিবাসীরা চোখের সামনে দেখতে পায়, মরে গেলেও তারা পাদরী সাহেবদের সঙ্গে সামাজিক সাম্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, হাজারিবাগের খৃস্টান সমাধিক্ষেত্র দুই ভাগে ভাগ করা আছে—এক ভাগ ইউরোপীয় খৃস্টানের সমাধির জন্য নির্দিষ্ট, অপর ভাগ কালা খৃস্টানদের জন্য।

ইংরাজের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সময় ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলে
জনৈতিক বিধাতারূপে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই সময় সুদূর
র্মানীর বার্লিনে তৎকালীন বিখ্যাত ইভ্যানজেলিস্ট ধর্মযাজক জন গসনার
ohn Gossner) হিদেন উদ্ধারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে উদ্যোগ
সারের সংকল্প করলেন। অর্থাৎ ইংরাজ ভারতে রাজ্য জয় করেছেন, তিনি
রতের আত্মা জয় করবেন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে তিনি কলকাতায় চারজন জার্মান
শনারীকে পাঠালেন। জার্মান পাদরীরা কলকাতায় এসে দেশীয় লোকের
নোভাব দেখে নিরুৎসাহ হলেন, কারণ তাঁদের প্রস্তাবিত বাণীর প্রতি কলকাতার
নেটিভ" সমাজ কোন আগ্রহই দেখালেন না। আকস্মিকভাবে তাঁরা কলকাতার
য়েকজন ধাঙ্গড়কে নর্দমা পরিষ্কার করার কাজে দেখতে পান। কলকাতার
টিভদের থেকে ধাঙ্গড়দের চেহারার পার্থক্যও তাঁরা লক্ষ্য করেন এবং প্রশ্ন ক'রে
নতে পারেন যে তারা রাঁচী থেকে এসেছে। ধাঙ্গড় কথাটি মূলতঃ মুণ্ডারি
ষার কথা। ছেলে ছোকরাকে এবং চুক্তিবদ্ধ ক্ষেতমজুরকে মুণ্ডারি ভাষায়
ধারণতঃ ধাঙ্গড় বলা হয়। কলকাতার নেটিভদের নিদারুণ অধর্মের মধ্যেই
ড়ে দিয়ে এই চারজন উৎসাহী জার্মান ধর্মযাজক দুর্গম পথ পার হয়ে রাঁচীতে
স একটি মিশন স্থাপন করেন। (১)

জার্মান পাদরীরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, মাত্র বাণী প্রচার করে তাঁরা
াদিবাসীকে খৃস্টধর্মের আশ্রয়ে টেনে আনতে পারবেন না। ১৮৪৫ সাল থেকে
৫০ সাল পর্যন্ত চেষ্টা করে মাত্র একজন আদিবাসীকে তাঁরা ধর্মান্তরিত করতে
রেছিলেন। সোজা পথে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না, একটু বাঁকা পথে তারই
ষ্টা আরম্ভ হলো। পাদরীরা বুঝলেন একটা বৈষয়িক উন্নতির ভরসা দিতে
রলে কোল সমাজ (অর্থাৎ মুণ্ডা ও ওঁরাও) খৃস্টধর্মে আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু
দরী সাহেবেরা নিজেদের অর্থে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে প্রস্তুত
লেন না, তাঁরা মাছের তেলে মাছ ভাজবার মতলব করলেন। আদিবাসী

(১) The Legend of the Kols—S. Haldar.

কৃষকদের মধ্যে তাঁরা প্রবল জমিদারবিরোধী আন্দোলনের প্ররোচনা দি লাগলেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের ক্ষোভ আগে থেকেই পুঞ্জীভূ হয়ে ছিল। নতুন ইংরাজী ভূমি-ব্যবস্থায় আদিবাসীরা জমির দখল ক্রমে ক্রমে হারিয়ে আসছিল এবং সবই জমিদারদের কুক্ষিগত হয়ে চলেছিল। জমিদার বিরোধী আন্দোলনে আদিবাসীদের প্ররোচিত করে পাদরীবর্গ দু'রকম লাভে আশা করেছিলেন। প্রথম, আদিবাসীদের জমিদারবিরোধী মনোভাব বস্তুতঃ হি বিরোধী মনোভাবে পরিণত হবে। দ্বিতীয়, এর দ্বারা ইংরাজ শাসক শ্রেণীে প্রত্যক্ষভাবে বিড়ম্বিত করা হবে না। ইংরাজী শাসনের মূল ব্যবস্থাটির গা আঁচড় না লাগিয়ে, মাত্র হিন্দু জমিদারদের বিড়ম্বিত করলে ইংরাজ অফিস মহলের কাছে প্রশ্রয় পাওয়া যাবে, পাদরী সাহেবেরা তাই মনে করেছিলেন সময় থানা পুলিশ ও আদালতের অনাচার ও অন্যান্য সরকারী খাজনার আক্রম আদিবাসীদের সংসার যথেষ্ট উপদ্রুত হচ্ছিল, কিন্তু পাদরী সাহেবরা এদি হস্তক্ষেপ করেন নি, বেশ সাবধানে এড়িয়ে গেছেন। তবে, জমিদারবিরো আন্দোলনের পথ গ্রহণ করার সময় তাঁরা একটা বিষয় পরিষ্কার করে বুঝে উঠ পারেন নি। সে সময় জমিদারদের স্বার্থ বস্তুতঃ ইংরাজের রাজস্ব ভাণ্ডারের এক প্রধান ভিত্তি রূপেই স্থাপিত হয়েছিল। জমিদারকে বিব্রত করলে রাজস্ব ব্যবস্থাকে বিব্রত করা হয়, এটা ইংরেজ সরকার বুঝতেন। সেই কারণে মিশনারী প্ররোচি জমিদারবিরোধী আন্দোলন কোন বড় রকম সরকারী আনুকূল্য লাভে স হয় নি। তবে আন্দোলনের চাপে পড়ে আপোষমূলক ব্যবস্থা হিসাবে গভর্ণমে একটি নূতন ভূমি আইন জারি করলেন। ছোটনাগপুরের কমিশনার কর্ ডালটনের (Col. Dalton) সুপারিশ অনুসারে ১৮৬৯ সালে 'ভুইহারি আই (Bengal Act, II of 1869) পাশ করা হলো। জমিদারের কাছ থে আদিবাসী কৃষক যাতে কিছু কিছু নিষ্কর জমি লাভ করতে পারে, তার ব্যব এই আইনে করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার পরেও মিশনারীদের প্ররোচ আদিবাসীরা যে পরিমাণে জমি ভুইহারি জমি হিসাবে দাবী করতে আ

দিয়েছিল, অধিকাংশ ইংরাজ অফিসার তাকে 'আইনসঙ্গত' বলে মনে করতে পারেন

ভুইহারি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সব অখৃস্টান ভারতীয় কর্মচারী ক্রমে নিযুক্ত হয়েছিলেন, মিশনারীরা এইবার তাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এ বিষয়ে তাঁরা বড়লাটের দরবার পর্যন্ত আবেদন নিয়ে পৌঁছলেন।

কোল সমাজের আর্থিক সুবিধার জন্য মিশনারীরা যে ভাবে আন্দোলন করছিলেন, তার বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই স্পষ্ট—আন্দোলন প্রধানতঃ 'হিন্দু' জমিদারের বিরুদ্ধে এবং অখৃস্টান অফিসারের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। মিশনারীদের আন্তরিক উদ্দেশ্য কি ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন ইংরাজ খৃস্টান ব্যক্তির মন্তব্য উধৃত করা যেতে পারে।

"মিশনারীরা এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবেই বলে থাকেন যে, কোলদের জন্য আন্দোলন করার পিছনে তাদের যে প্রধান উদ্দেশ্য আছে, সেটা হলো কোলদের ওপর ধর্মপ্রচারের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা।" (১)

"মিশনারীরা আদিবাসীদের অবশ্য এভাবে প্রলুব্ধ করেন না যে, খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করলে তাঁরা আদিবাসীর জন্য জমি আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য করবেন। কিন্তু আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, পাদরী সাহেবেরা মাত্র তাদের আত্মার উন্নতির জন্য আসেন নি, বৈষয়িক উন্নতিও করিয়ে দিয়ে থাকেন। এই মনোভাব প্রসার লাভ করাতেই যে দলে দলে আদিবাসী খৃস্টান হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" (২)

'এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ধর্মান্তর করার চেষ্টায় খৃস্টান মিশনারীদের এতখানি সাফল্যের একটা বড় কারণ হলো, মুণ্ডারা খৃস্টান হয়ে কতকগুলি আর্থিক সুবিধা লাভ করে থাকে।" (৩)

(১) Official note, dated Dec. 16, 1879 by Mr. C. W. Bottom, I. C. S., Secretary to Government.

(২) Census of India, 1911.

(৩) Sir Edward Gait.

১৮৭৫ সালে জার্মান মিশনারীরা বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কাছে একটা বিরাট অভিযোগপত্র দাখিল করেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, অখৃস্টান ভুইহারি অফিসারগণ অত্যন্ত গর্হিতভাবে কাজ করছে। তৎকালীন বাঙলার লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) উক্ত অভিযোগপত্র বিবেচনা করার পর মন্তব্য করেন :

"এই অভিযোগপত্রে এমন সব মন্তব্য ও কথা আছে যা পড়ে আমার ভয় হয় যে, যেসব কোল খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং যারা গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছে তাদের উভয়েরই বিশ্বাস—মিশনারীরা তাদের হয়ে দাবী (সত্য অথবা কাল্পনিক) আদায়ের জন্য লড়াই করবে। অভিযোগপত্রের মধ্যে লিখিত একটি অংশ থেকে এই ধারণা করা যেতে পারে যে আদিবাসীরা ধর্মান্তর গ্রহণ করে মনে মনে অসুখী হয়েছে, কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে যে, ধর্মান্তর গ্রহণ করেও তাদের সামাজিক উন্নতি হচ্ছে না।"

১৮৬৯ সালে রাঁচীর জার্মান লুথেরীয় মিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল : "কোলেরা একেশ্বরবাদী সমাজ। মূর্তিপূজক হিন্দুদের দূষিত সংস্পর্শ থেকেই তারা বহু-দেবতার পূজো আর মদ্যপানের কু-অভ্যাস অর্জন করেছে।"

জার্মান মিশনারী তাঁদের ধর্মপ্রচারের পথ সুগম করার জন্য শুধু হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কোল সমাজের এক ইতিহাসও রচনা করলেন। আদিবাসীকে হিন্দুধর্মবিরোধী এবং হিন্দুসমাজ-বিরোধী করবার জন্য যতখানি উদ্ভট কাহিনী রচনার প্রয়োজন সবই তাঁরা করেছিলেন।

১৯০২—১০ সালে রাঁচীর জরিপ (Survey & Settlement) কমিশনার মিঃ জন রীড (Mr. John Reid, I.C.S.) কোল সমাজে জার্মান মিশনারী রচিত 'কিম্বদন্তীর' প্রভাব দেখতে পেয়ে মন্তব্য করেছেন : "জার্মান মিশনারীরা এদের মধ্যে একটি থিওরী প্রচার করে গেছে যে, অতীতে মুণ্ডা ও ওঁরাওরা স্বেচ্ছা তাদের নির্বাচিত রাজাকে জমির অর্ধেক ছেড়ে দিত; অপর অর্ধেক বিনা

খাজনায় নিজেরা ভোগ করতো।" মিঃ রীড বলেন, কোলসমাজের ইতিহাসে এরকম ঘটনার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং 'অর্ধেক জমি বিনা খাজনায় ভোগ করার' একটা প্রলোভন ও প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্যেই যে মিশনারীরা কাহিনীটির রচনা করেছিলেন, এ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ?

কালক্রমে জার্মান লুথেরীয় মিশনের প্রভাবে মন্দা পড়ে এবং ১৮৮৫ সালে বেলজিয়ান জেসুইট মিশন (Belgian Jesuit Mission) রাঁচীর আদিবাসী সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। জেসুইট ফাদার বর্গ বেশী সংখ্যক আদিবাসীকে ধর্মান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪) ইংরাজ-জার্মান বৈরিতার অধ্যায়ে রাঁচীতে জার্মান পাদরীদের ক্রিয়াকলাপ শুদ্ধ হয়ে যায়। এর পর চার্চ অব ইংলণ্ডের এস-পি-জি (S. P. G.) * যাজক সম্প্রদায় প্রধান হয়ে ওঠে এবং ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজে কাজ করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এস-পি-জি জার্মান লুথেরীয় প্রচারকদের মতন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, এমন কি রোমক মিশনারীরাও (Church of Rome) আদিবাসী সমাজে ধর্মপ্রচারের কৃতিত্বে ইংলণ্ডীয় চার্চকে অতিক্রম করে যায়।

বেলজিয়ান জেসুইট প্রচারক সম্প্রদায়ের সাফল্যের একটি বড় কারণ আছে। ক্যাথলিক মতবাদ আদিবাসীদের মনে সহজেই আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। উৎসবপ্রবণ ক্যাথলিক মতবাদের মধ্যে আদিবাসীরা তাদের গোষ্ঠীগত নাচগানের প্রথাটুকু বজায় রাখবার সুযোগ পেয়েছিল। আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সমাজব্যবস্থা ও আচার ব্যবহারের প্রতি জেসুইট প্রচারকেরা খুব বেশি গোঁড়ার মত বিরুদ্ধতা করেন নি। তা ছাড়া জেসুইট পাদরীদের ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যেও জাতিগর্বের তিক্ততা কমই ছিল। ধর্মান্তরিত কৃষ্ণকায় আদিবাসীর সঙ্গে উদারভাবে মেলামেশার সহজ সৌহার্দ্য তাঁরা রাখতে পেরেছিলেন।

জেসুইট মিশনারীরাও প্রথম প্রথম আদিবাসীদের ভূমিস্বত্বের প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ১৯০৮ সালের ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন

* Society for the Propagation of Gospel Mission.

(Chotanagpur Tenancy Act) পাশ করাবার ব্যাপারে জেসুইট মিশনারীদের প্রচেষ্টা অনেকখানি কাজ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জেসুইট মিশনারীরা অল্পদিন পরেই এই ধরণের বাঁকা পথ ছেড়ে দেন এবং প্রধানতঃ বিশেষ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির ভেতর দিয়ে 'ক্যাথলিক সত্য' প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

জার্মান মিশনারী ও তাঁদের উদ্যোগে ধর্মান্তরিত খৃস্টান আদিবাসীদের সম্পর্ক বেশী দিন ধরে অন্তরঙ্গতায় বাঁধা থাকে নি। ঘটনা অন্যদিকে আবর্তিত হয়। কয়েকজন 'সর্দারের' নেতৃত্বে খৃস্টান আদিবাসীরা মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই আদিবাসী সর্দারদের মধ্যে এক ব্যক্তি 'জন দি ব্যাপটিস্ট' (John the Baptist) নাম গ্রহণ করে এবং সদলবলে এক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রাচীন নাগবংশী রাজাদের রাজধানী যেখানে ছিল, সেই স্থানের নাম ডোয়েসা। আদিবাসীদের জন দি ব্যাপটিস্ট ডোয়েসাতে তাঁর 'স্বাধীন রাজ্য' স্থাপন করলেন। এই জন দি ব্যাপটিস্টের অনুগামীরা 'মায়েলের সন্তান' (Children of Mael) নাম গ্রহণ করে। এই নতুন আন্দোলন ক্রমে ক্রমে তীব্রতর হয়ে প্রায় বিদ্রোহের রূপে পরিণত হয়। ১৮৮৭ সালে এই বিদ্রোহ দমিত হয়।

মিঃ এলুইনের মত হিন্দুত্ব বিরোধী আদিবাসীতত্ত্ব-বিশারদও খৃস্টান ধর্মযাজকদের ক্রিয়াকলাপের সমর্থন করতে পারেন নি। আদিবাসীকে 'খৃস্টান' ক'রে দিলেই সে উন্নত হয় না। মিঃ এলুইনের মতে, মিশনারীর দল আদিবাসীকে তার গোষ্ঠীগত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি থেকে উৎখাত ক'রে একেবারে নতুন একটা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছেন। জলের মাছ ডাঙ্গায় পড়লে যে অবস্থা হয়, কতকটা সেই দশা। খৃস্টান মিশনারীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মিঃ এলুইন মন্তব্য করেছেন—"কতগুলি দীনহীন আদিবাসীর বদলে কতগুলি দীনহীন ধর্মান্তরিত (convert) খৃস্টান তৈরী হয়েছে, এই মাত্র।" (১)

---

(১) The Aboriginals—Verrier Elwin.

খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ ক'রে আদিবাসীরা জীবনে কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ ক'রেছে, সেটা প্রশ্নের বিষয়। বরং দেখা যায়, বাধ্য হয়ে খৃস্টান হওয়ায় তাদের মনের গোপনে যেন একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে, তাদেরই কথার ভেতর দিয়ে এই ক্ষোভ মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনিত হয়। উদাহরণ হিসাবে সাঁওতালী ছড়ায় একটি নমুনা উধৃত করা হলো :—

"হড়মো হপনবাবু লেঃফ্‌লেকা
ডানডা হপনবাবু চাঁমুক্ লেকাঃ
চেকাতে বাং বাবুম্ রহড়ঃ কান্
নিঞ্ তেমা বাং সারে চান্দোগে
বেনাও লিদিং যিস্থমাসি কিন
চিলাও কিদিঞ।"

এর বাংলা তর্জমা হলো :—

"গা'টি তোমার, ভাইটি, ছিল চক্‌চকে পিছ্‌লে যাবার মতো। কোমরটি ছিল ছিপ্‌ছিপে চাবুকের মতো। শরীর এখন অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন ?"

"আমার আপনা থেকে তো নয় বউদি, চান্দো (বিধাতা) গড়ে তুলেছিল আমাকে, যিশু মুসাতে জুটে দুরবস্থা ঘটালে !" (২)

(২) বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩, শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদার লিখিত প্রবন্ধ

ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া

ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রথম রাজমহলের পাহাড়িয়া গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আসে। তথাকথিত আদিম অধিবাসী অথবা উপজাতিদের প্রতি ব্রিটিশ শাসক যে নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তার প্রথম পরীক্ষা পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর ওপরেই আরম্ভ হয়।

প্রথম ব্রিটিশ শাসকের দল (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) আদিবাসীদের প্রতি যে নীতি গ্রহণ করলেন তাকে বলা যেতে পারে 'শান্ত করার' নীতি (Pacification)। আদিবাসীরা যেন উপদ্রবপ্রবণ হয়ে না ওঠে এবং ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে এসে শান্তিভঙ্গ বা উৎপাত না করে, তারই জন্য এই নীতি। প্রত্যক্ষভাবে শাসন ব্যবস্থা না চাপিয়ে, আদিবাসীকে নিজের ঘরে নিজের আইন নিয়ে থাকবার সুযোগ ইংরাজ সরকার দিয়েছিলেন।

রাজমহলের পাহাড়িয়া সর্দারদের 'সনদ' দেওয়া হয়। পাহাড়িয়া অঞ্চলের কোন হাঙ্গামা হলে গভর্ণমেণ্টের কাছে সে সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করা ও সংবাদ দেওয়া এইসব সনদধারী সর্দারের কর্তব্য ছিল। ইংরাজের সরকারী সড়ক দিয়ে ডাকের যাতায়াত যাতে নিরাপদ হয় এবং ডাকবাহকদের ওপর আক্রমণ না হয়, সে সম্বন্ধে পাহারা রাখা সর্দারদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্যের বিনিময়ে সর্দারেরা ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে বাৎসরিক বৃত্তি লাভ করতো। এই বৃত্তি বস্তুতঃ উৎকোচ ছাড়া আর কিছু নয়। মুসলমান শাসনকালেও উপজাতিদের এই ভাবে ঘুষ দিয়ে শান্ত করে দূরে সরিয়ে রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

রাজমহলের পাহাড়িয়াদের প্রতি ইংরাজ সরকার যেমন একদিকে উৎকোচ-পুষ্ট তোষণনীতি গ্রহণ করলেন, অপরদিকে আর একরকমের কূটনৈতিক সতর্কতাও গ্রহণ করলেন। অবসরপ্রাপ্ত সিপাহীদের জমি দিয়ে রাজমহল পাহাড়ের চারদিকে বসতি করিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। আক্রমণ-প্রবণ

পাহাড়িয়াদের যাতে বাধা দিতে পারে, এমনই যুদ্ধ-শিক্ষিত এক শ্রেণীর সাহায্যে রাজমহল পাহাড়কে যেন একটা সামরিক বৃত্ত দিয়ে অবরোধ করে রাখার ব্যবস্থা হলো।

আদিবাসীদের প্রতি যে সব ব্রিটিশ রাজনৈতিক নানারকম নীতির আবিষ্কার, পরীক্ষা ও প্রবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে অগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের (Augustus Cleveland) নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজমহলের পাহাড়িয়া অঞ্চলের শাসন তদারকের ভার পেয়েই ক্লীভল্যাণ্ড নানা নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। পাহাড়িয়া সর্দার, নেতা ও উপনেতাদের জন্য ক্লীভল্যাণ্ড পেন্সনের ব্যবস্থা করলেন (বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা) এবং সর্দারদের কর্তব্যের তালিকা আরও বাড়িয়ে দিলেন। পাহাড়িয়া এলাকার প্রত্যেকটি অপরাধের খবর সরকারী দপ্তরে পৌছে দেওয়া, হাঙ্গামায় নিজেদের প্রভাবে শান্তি স্থাপন করা এবং শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করা—এইসব কর্তব্যে সর্দারেরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

এইভাবে পাহাড়িয়া অঞ্চলে ইংরাজ সরকারের অনুগত একটি সর্দারদল তৈরী হয়। এইবার ক্লীভল্যাণ্ড এদের দিয়ে একটা 'আদালত' কায়েম করেন। রাজমহল অঞ্চলকে সাধারণ আদালতের বিচারক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য ক্লীভল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করলেন এবং ১৭৮২ সালে রাজমহল সাধারণ আদালতের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ক্লীভল্যাণ্ড পাহাড়িয়াদের গোষ্ঠীগত সর্দারদের নিয়ে একটি দায়রা আদালত স্থাপন করেন। নিয়ম ছিল, বছরে মাত্র দু'বার আদালত বসবে এবং সব রকম অপরাধের বিচার করবে। 'সর্দার পরিষদ' রূপে গঠিত এই আদালতই সরকারী পরিভাষায় 'পাহাড়িয়া পরিষদ' (Hill Assembly) নাম গ্রহণ করে। বিচারে প্রাণদণ্ড ঘোষণার অথবা প্রাণদণ্ডের নির্দেশ বাতিল করবার অধিকার পাহাড়িয়া পরিষদের ছিল। পাহাড়িয়া মহলকে এইভাবে নিরুপদ্রব ও শান্ত করার ব্যবস্থা শেষ করে ক্লীভল্যাণ্ড এর পর পাহাড়িয়া মহলের ভূমি সম্বন্ধে একট সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার

চেষ্টা করলেন। ব্যবস্থা হলো—পাহাড়িয়ারা যে সব জমি ভোগদখল করছিল, তা সবই গভর্ণমেণ্টের জমি হিসাবে ঘোষণা করা হলো এবং পাহাড়িয়ারা খাস গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এইসব জমি বিনা খাজনায় ভোগ করার ব্যবস্থা লাভ করলো। যে সব পাহাড়িয়া সর্দার এ পর্যন্ত পাহাড়িয়া পরিষদ প্রভৃতি ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে স্বীকার না করে পৃথক হয়ে ছিল, তারাও ভূমিগত এই সুবিধার আকর্ষণে উৎসাহিত হয়ে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিল। এইভাবে সমস্ত পাহাড়িয়া মহলকে 'বিশেষ ব্যবস্থার' অধীনে আনা হলো এবং ব্রিটিশ কর্তৃক এই বিশেষভাবে ব্যবস্থিত ও শাসিত অঞ্চলই 'দামনি কো' নামে আখ্যাত হয় (সাঁওতালী ভাষায় 'কো' অর্থ পাহাড় এবং 'দামনি' অর্থ অঞ্চল)।

ক্লীভল্যাণ্ডের ধারণা ছিল যে, পাহাড়িয়া আদিবাসীকে যদি উন্নত অগ্রসরশীল সমাজের সংস্পর্শে না আনা হয়, তবে তাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি স্তব্ধ হয়ে থাকে। ক্লীভল্যাণ্ড বহুদিন পূর্বেই এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী এবং আধুনিক অনেক ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক এবং রাজনীতিবিদ্ ক্লীভল্যাণ্ডের ধারণার ঠিক বিপরীত মনোভাব পোষণ ও প্রচার করে থাকেন। ১৭৮৪ সালে ক্লীভল্যাণ্ড মারা যান, সেইজন্য তিনি তাঁর পরিকল্পনার অনেকখানিই পরীক্ষা করে দেখে যেতে পারেন নি।

'নন-রেগুলেশন' শাসনপদ্ধতির উদ্ভব

পাহাড়িয়া পরিষদের (Hill Assembly) কাজ অবাধভাবে চলতে থাকে। পরিষদের কাজ সম্বন্ধে ক্লীভল্যাণ্ড যে সব নিয়ম তৈরী করেছিলেন, সেইসব নিয়মগুলিকে ১৭৯৬ সালে আইনে পরিণত করা হয়। এই আইন ১৭৯৬ সালের ১নং রেগুলেশন (Regulation I of 1796) নামে পরিচিত। ক্লীভল্যাণ্ডের পর থেকে আরম্ভ করে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত বলা যেতে পারে পাহাড়িয়া মহলের ইতিহাসে রেগুলেশন-বহির্ভূত শাসনের (Non-Regulation) অধ্যায়। এই অধ্যায়ে পাহাড়িয়া অঞ্চলের শাসনের জন্য কালেক্টর সাধারণ বিধিবদ্ধ আইন

প্রয়োগ না করে নিজের ইচ্ছামত আইন তৈরী করতেন। ১৭৯৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত 'দামনি কো' এইভাবে বিশেষ শাসনব্যবস্থার (Specially Administered) দ্বারা শাসিত হয়। ১৮২৭ সালে নতুনভাবে আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন চালু হয় এবং পুরাতন ১৭৯৬ সালের ১নং রেগুলেশন বাতিল হয়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা বিধিবদ্ধ শাসনতন্ত্র (ফোর্ট উইলিয়ামের রেগুলেশন) ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত সাধারণতঃ প্রচলিত থাকলেও ১৭৮২ সাল থেকেই রাজমহলের পাহাড়িয়া অঞ্চলকে কোম্পানীর সাধারণ রেগুলেশনের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। কোম্পানীর সাধারণ আদালতের কোন অধিকার পাহাড়িয়া অঞ্চলের ওপর রইল না। কালেক্টর স্বয়ং তাঁর বিচার ও বিবেচনা অনুযায়ী নিয়ম রচনা করে উক্ত অঞ্চলের শাসন আরম্ভ করেন। নন-রেগুলেশন শাসন প্রথার এই প্রথম আভাষ বা পূর্ব সূচনা বলা যেতে পারে। ১৭৯৬ সালে ক্লীভল্যাণ্ডের নিয়মগুলিকে একটা বিশেষ রেগুলেশনে পরিণত ক'রে পাহাড়িয়া অঞ্চলের শাসন আরম্ভ হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, এই ভাবে এবং এই প্রথম বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীন একটা অঞ্চল ('Specially administered area') দেখা দিল। পরবর্তী কালের 'তপশীলী অঞ্চল', 'নন-রেগুলেশন অঞ্চল', 'অনগ্রসর অঞ্চল' অথবা 'বহির্ভূত অঞ্চল', ইত্যাদি অঞ্চলের উদ্ভবের ইতিহাস এখান থেকেই সূচিত হয়।

১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন পাহাড়িয়া পরিষদের স্বতন্ত্র ক্ষমতা রদ করে দেয়। 'দামনি কো'র পাহাড়িয়া অধিবাসীর বিবাদ বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যাপার সাধারণ আদালতের অধীনে আসে। পাহাড়িয়াদের ওপরে সাধারণ আদালতের অধিকার প্রযুক্ত হয়েও কতকগুলি বিষয়ে পাহাড়িয়া সমাজের হাতে বিশেষ কতগুলি ক্ষমতার সুবিধা দেওয়া হয়। এর ফলে নিজেদের ব্যাপার নিয়ে বিচার ও মীমাংসার ক্ষমতা পাহাড়িয়া সমাজেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এইভাবে পঞ্চাশ বছর চলে। এর মধ্যে পাহাড়িয়াদের মত ভারতবর্ষের আরও অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী ভারত গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার মধ্যে এসে পড়ে।

'পাহাড়িয়া পরিষদ' প্রতিষ্ঠাকল্পে ক্লীভল্যাণ্ড যে ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছিলেন, পরবর্তী কালেক্টরেরা এবং অন্যান্য অফিসারেরা সে ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিযোগ করেন। একে তো পাহাড়িয়ারা খাজনা দেয় না, তারপর উল্টো তাদের বাৎসরিক বৃত্তি ও সর্দারদের পেন্সন দেওয়া হচ্ছিল। তা ছাড়া পাহাড়িয়া পরিষদের আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন কিভাবে চলছে, তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা কালেক্টরদের পক্ষে একটা কষ্টকর পরিশ্রমসাধ্য ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল এবং কালেক্টরেরা এবিষয়ে মনোযোগ দিয়েও উঠতে পারতেন না। কাজেই পাহাড়ী পরিষদের মত একটা অপ্রবীণ সংঘ সরকারী কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য এবং সহানুভূতিপূর্ণ তদারকের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে। ১৮১৯ সালে গভর্ণমেণ্ট জেম্‌স সাদারল্যাণ্ডকে 'দামনি কো'র ব্যবস্থা ও অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করতে পাঠান। সাদারল্যাণ্ড পাহাড়ী পরিষদের নিয়ম কানুন ও কর্মপ্রণালীর তীব্র নিন্দা করে রিপোর্ট দেন। ১৮২৩ সালে জে. পি. ওয়ার্ড (J. P. Ward) 'দামনি কো'র সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করার জন্য প্রেরিত হন। তিনিও 'পাহাড়িয়াদের দাবী'কে অত্যন্ত গর্হিত বলে মত প্রকাশ করেন। গভর্ণমেণ্ট ১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন অনুসারে পাহাড়িয়া সমাজকে সাধারণ আদালতের আওতায় এনেও পাহাড়িয়াদের গোষ্ঠীগত এবং সর্দার পরিচালিত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসনের সুবিধাটুকু বাতিল করতে চাইলেন না। (১)

১৮৩১ সালে কোল বিদ্রোহ দমিত হবার পর গভর্ণমেণ্ট সিংভূমের 'হো' সমাজের সম্বন্ধে এক নতুন পলিসি গ্রহণ করেন। এর আগে থেকে স্থানীয় 'হিন্দু রাজারা' (অর্থাৎ জমিদারগণ) 'হো'দের কাছ থেকে লাঙ্গল প্রতি আট আনা বাৎসরিক খাজনা নিত। হিন্দুরাজাদের ওপর 'হো'দের খুবই বিদ্বেষভাব

(১) District Gazetteer of Santal Parganas.

ছিল। তাই, এর পর থেকে এই খাজনা সোজাসুজি গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারিতে জমা দেবার জন্য 'হো' সমাজের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশ বছরের মধ্যে খাজনা দ্বিগুণ করা হয় এবং 'হো' সমাজ কোনই আপত্তি করে নি। ১৮৬৬ সালে গভর্ণমেণ্ট 'হো' অঞ্চলের জমি জরিপের উদ্যোগ করেন। 'হো' সমাজের একটি প্রকাশ্য সম্মেলন আহ্বান করে এবিষয়ে 'হো' সর্দারদের সম্মতি গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৬৭ সালে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকর প্রথা অর্থাৎ জমির পরিমাণ হিসাবে খাজনা দেবার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

হিন্দু জমিদারদের জমি গ্রাসের ফলে কোল বিদ্রোহের (১৮৩১ সালের) পর সমস্ত ছোটনাগপুর সম্বন্ধেই একটা নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ছোটনাগপুরের শাসন পরিচালনার জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত হন, তাঁর পদবী ছিল 'গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট' (Agent to the Governor General)। গভর্ণর জেনারেল এই অঞ্চলের জন্য একটা বিশেষ ফৌজদারী দণ্ডবিধি তৈরী করেন। ১৮৬১ সালে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি (Criminal Procedure Code) তৈরী হবার পর, ছোটনাগপুরের জন্য এই বিশেষ দণ্ডবিধি বাতিল হয়ে যায়। এজেণ্ট সাহেব আদিবাসীদের জমি সম্বন্ধে একটা রক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেন। এজেণ্টের বিনা অনুমতিতে আদিবাসীর জমি বিক্রয়, হস্তান্তর বা বন্ধক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮৫৪ সালে ছোটনাগপুরের এজেণ্ট-শাসন প্রত্যাহৃত হয়, ছোটনাগপুরকে নন-রেগুলেশন অঞ্চল হিসাবে বাঙলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের পরিচালনাধীন করা হয়। ছোটনাগপুরই প্রথম নন-রেগুলেশন অঞ্চল। (২) বিশেষভাবে শাসিত এবং সাধারণ শাসন আইনের অধিকার থেকে স্বতন্ত্র হলেও ছোটনাগপুরে ধীরে ধীরে সাধারণ আইনগুলি বলবৎ করা হতে থাকে।

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর 'দামনি কো' অঞ্চলসহ সমস্ত সাঁওতাল পরগণাকে একটি জিলা হিসাবে নন-রেগুলেশন অঞ্চলে পরিণত করা হয়।

---

(২) Chotanagpur—Bradley Birt.

একজন ডেপুটি কমিশনার জিলার উচ্চতম কর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তাঁর অধীনে চার জন সহকারী কমিশনার জিলার চারটি বিভাগের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সাঁওতাল পরগণা সাধারণ বিধিবদ্ধ আইন ও ব্যবস্থার বাইরে থাকে। যা করেন ডেপুটি কমিশনার—তিনিই একাধারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যবস্থার কর্তা এবং তিনিই আদালত। বাদী বিবাদী বা ফরিয়াদী আসামী, সকলে ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনারদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মৌখিকভাবে অভিযোগ পেশ করে, উকীল মোক্তারের দরকার নেই। কোন পুলিশও নেই, সাঁওতাল সর্দারের দ্বারাই পুলিশী কর্তব্য সম্পন্ন হয়। নন-রেগুলেশন অঞ্চল সাঁওতাল পরগণায় এইভাবে শাসন চলতে থাকে। সাঁওতাল পরগণার তৃতীয় ডেপুটি কমিশনার স্যার উইলিয়ম ফ্লেমিং রবিনসনের (Sir William Fleming Robinson) নাম একটি কারণে বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তিনি সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের 'ক্রীতদাস প্রথা'র উচ্ছেদ করেন।

প্রথাটা এই: কোন গরীব লোক অর্থাভাবে পড়ে কোন পয়সাওয়ালা লোকের কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হতো যে, উত্তমর্ণ যখনই তাকে ডাকবে তখনই সে এসে কাজ ক'রে দিয়ে যাবে। খাটবার সময় সে উত্তমর্ণের কাছ থেকে ভিন্ন কোন মজুরী পাবে না, মাত্র খোরাক পাবে। বেশী হলে হয়তো আর এক টুক্‌রো কাপড়। মজুরী হিসাবে যেটা প্রাপ্য হতো সেটা ঋণ-শোধ হিসাবে উত্তমর্ণের খাতায় জমা হতো। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে উত্তমর্ণের রহস্যময় হিসাবের কৌশলে ঋণের পরিমাণ বিশেষ কিছু কম্‌তির দিকে যেত না। সারাজীবন এভাবে খাটুনি দিয়েও হতভাগ্য কামিয়া ঋণ শোধ করতে পারতো না। মরবার সময় এই ঋণের দায়িত্ব কামিয়ার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অথবা নিকট সম্পর্কের আত্মীয়ের ওপর গিয়ে চাপতো, এবং তারাও সারাজীবন খেটে এই ঋণ শোধের চেষ্টা করতো। সরকারী আদালত এই কামিয়ৌতি প্রথাকে অবৈধ মনে করতেন না। এইভাবে সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে এবং ছোটনাগপুরের অন্য অঞ্চলেও একটা বিরাট ক্রীতদাস

শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। স্যার উইলিয়াম রবিনসন তাঁর শাসনকালে সাঁওতাল পরগণায় কামিয়োতি প্রথার উচ্ছেদ করেন। ১৮৬৩ সালে অ্যাডভোকেট জেনারেলের কতগুলি রুলিং নন-রেগুলেশন অঞ্চলের অফিসারদের ক্ষমতার স্বাধীনতাকে কিছু কিছু খর্ব করে এবং লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার সিসিল বীডনও (Sir Cecil Beadon) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সাঁওতাল পরগণা জিলার শাসন ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব বাঙলার অন্যান্য জেলার শাসন ব্যবস্থার মত করা উচিত। এর ফলে জমিদার ও মহাজন সম্প্রদায় আবার সুযোগ পায় এবং ব্রিটিশ আইনের পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস পেছনে থাকায় সাঁওতাল চাষীদের ওপর প্রবল মহাজনী আরম্ভ করে। এর পরিণামে ১৮৭১ সালে সাঁওতালদের মধ্যে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্বেল "সাঁওতাল পরগণার শান্তি ও সুশাসনের" জন্য এক আইন পাশ করিয়ে নেন (Regulation III of 1872). মহাজনেরা শতকরা ২৪ টাকার বেশী সুদ নিতে পারবে না, রায়তেরা জমি হস্তান্তর করতে পারবে না ইত্যাদি কতগুলি বিধিনিষেধ এই রেগুলেশনের দ্বারা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭৯ সালে সাঁওতাল পরগণার ভূমি নতুনভাবে জরিপ ও বন্দোবস্ত (Survey & Settlement) ক'রে সাঁওতাল সমাজের গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ শাসনের পদ্ধতিকেও অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। ব্রাড্লে বার্ট এই সরকারী ব্যবস্থার প্রশংসা করেও বলেছেন: "দুরবস্থাপীড়িত সাঁওতাল সমাজের আর্থিক উন্নতি ফিরে এল।......সাঁওতালের ওপর বিশ্বাস ক'রে আত্ম-শাসনের যে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হলো, তার ফলে সাঁওতালেরা খুবই খুসী হয়। অপরাধ-মূলক কাজ (crime) গোপন করার উদাহরণ ক্রমেই কমে আসতে থাকে। তবুও এই আর্থিক উন্নতি সাঁওতালের জীবনে খুব কমই পরিবর্তন আনতে পেরেছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা সভ্যতার ক্ষেত্রে তারা চিন্তায়, প্রবৃত্তিতে ও জীবনযাত্রায় কিছু ওপরে উঠ্তে পেরেছে, এমন প্রমাণ খুব কমই চোখে পড়ে। যেমন জীবন চল্ছে, তাইতেই তারা সুখী। কাজেই উন্নত হবার কোন চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই।"

ব্রাড্‌লে বার্টের মন্তব্যের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শুধু জমির ব্যাপারের কতগুলি সুবিধা দিলেই এবং "গোষ্ঠীগত রীতিনীতির স্বাধীনতা" অক্ষুণ্ণ রাখলেই আদিবাসীর জীবন উন্নত হয় না। আদিবাসীদের জন্য গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যের হাজার প্রশংসা ক'রে আধুনিক কালের যে সব স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist) সমালোচক আদিবাসী-দরদ প্রচার ক'রে থাকেন, তাঁরা ব্রাড্‌লে বার্টের পুরাতন মন্তব্য দিয়ে নিজেদের অভিমতের সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন।

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ কোম্পানীর শাসনের সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম (কলিকাতা), ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (মাদ্রাজ) এবং বোম্বাইয়ের শাসনকার্য পরিষদগুলি (Executive Councils) যে সব 'রেগুলেশন' জারি করতেন, তার দ্বারাই ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসন চলতে থাকে। নতুন নতুন অঞ্চল শাসনভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী বুঝতে পেরেছিল যে, সব অঞ্চল বা প্রদেশকে এইসব রেগুলেশনের সাহায্যে শাসন করার অসুবিধা আছে। যে সব অঞ্চলকে অনগ্রসর ব'লে মনে হতো, সেগুলিকে রেগুলেশন-বহির্ভূত (Non-Regulated) প্রদেশ বলে পৃথক করে নিয়ে ভিন্ন ব্যবস্থায় শাসন করা হতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান (Code) রচিত হয়। এই বিধানগুলি মূল রেগুলেশনগুলির তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করেই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পর থেকে কিছুটা ভিন্নতর ভাবে করা হয়। এইভাবে কোম্পানীর শাসন কাল থেকেই 'রেগুলেশন' প্রদেশ ও 'রেগুলেশন-বহির্ভূত' প্রদেশ নামে দুই শ্রেণীর অঞ্চল সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে সব 'প্রদেশের' শাসন ব্যবস্থাকে একই রকম করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকে।

তপশীলভুক্ত জিলা

১৮৬১ সালে পার্লামেণ্টে ভারতীয় কাউন্সিল আইন (Indian Council Act) পাশ হয়। রেগুলেশন-বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য গভর্ণর-জেনারেল অথবা স্থানীয়

কর্তৃপক্ষ যে সব বিধি-নির্দেশ তৈরী করেছিলেন, এই আইনে সেগুলি সমর্থিত হয়। ১৮৭০ সালে পার্লামেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্ট আইন (Government of India Act) পাশ করেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কতগুলি বিশেষ অঞ্চলের শাসনের জন্য যে সব বিধি-নির্দেশ তৈরী করবেন সেগুলিকে অনুমোদন করবার জন্য পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই আইন অনুসারে ন্যস্ত ক্ষমতা অনুযায়ী গভর্ণর-জেনারেল বহু নতুন বিধান প্রবর্তন করেন। ১৮৭৪ সালে ভারতীয় আইন সভা 'তপশীলভুক্ত জিলা আইন' (Scheduled Districts Act, XIV of 1874) পাশ করেন। এই আইনের বলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকে কতগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়, বিশেষ অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্ট করে একটা তালিকাও এই আইনের সঙ্গে করা হয়। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নিজে বিবেচনা ক'রে বুঝবেন, কোন্ বিশেষ অঞ্চলে কোন্ ব্যবস্থা প্রয়োজন, কোথায় সাধারণ আইন প্রয়োগ করা উচিত এবং কোথায় নয়। (১)

নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলি তপশীলভুক্ত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয়:

আসাম, আজমীঢ় মাড়ওয়ার, কুর্গ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর বিভাগ, আঙ্গুল মহল, এডেন, সিন্ধু প্রদেশ, পাঁচ মহল, পশ্চিম খান্দেশের মেওয়াসি সর্দারদের তালুকসমূহ, চান্দা জমিদারী অঞ্চল, ছত্রিশগড় জমিদারী অঞ্চল, চিন্দোয়ারা জায়গীরদারী অঞ্চল, গঞ্জামের ১৪টি মালিয়া, ভিজাগাপট্টমের ৯টি মালিয়া, গোদাবরী জিলার কতগুলি অংশ, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, হাজারা, পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজী খাঁ, লাহৌল ও স্পিতি, ঝাঁসি বিভাগ, কুমায়ুণ ও গাড়োয়াল, তরাই পরগণা, মির্জাপুর জিলার চারিটি পরগণা, বারাণসী মহারাজার পারিবারিক বসতি অঞ্চলসমূহ, দেরাদুন জিলার জৌনসার-বাওয়ার এবং মণিপুর পরগণা (মধ্য ভারত এজেন্সী)।

(১) Constitutional History of India—B. Keith.

উল্লিখিত তালিকা থেকে পাঁচ মহল জিলা, ঝাঁসি ডিভিসন এবং গঞ্জামে একটি মালিয়া পরে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে মণিপুর পরগণাকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

খন্দসমাজে নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই প্রথা রহিত করবার চেষ্টা করেন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ খন্দেরা ১৮৪৬ সালে 'বিদ্রোহ' করে। আঙ্গুলের রাজাও এই বিদ্রোহের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। বিদ্রোহ দমন ক'রে ১৮৪৮ সালে আঙ্গুলকে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করা হয়। শুধু আঙ্গুল নয়, খন্দ অধ্যুষিত সমস্ত মালিয়াগুলিকে ১৮৩৯ সালের আইনের (India Act XXIV of 1839) ব্যবস্থা অনুসারে শাসন করা আরম্ভ হয়। ১৮৭৭ সালে আঙ্গুলকে তপশীলভুক্ত জিলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়

তপশীলভুক্ত জিলা আইন পাশ হবার পর এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন বুঝে তালিকায় উল্লিখিত অঞ্চলগুলি তপশীল জিলা হিসাবে ঘোষিত হতে থাকে গোদাবরী এজেন্সী ১৮৯১ সালে সম্পূর্ণভাবে তপশীলভুক্ত হয়।

১৮৬২ সালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি (London Missionary Society দক্ষিণ মির্জাপুরে তুধি-পরগণায় জমিদারী স্বত্ব নিয়ে মিশন স্থাপনের পরিকল্প করেন, এতে ধর্মপ্রচারের সুবিধা হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। মিশনের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ধর্মপ্রচারের সঙ্গে জমিদারগিরি ঠিক থাপ খাবে মনে ক'রে পথ ছেড়ে দেন। ১৮৬৪ সালে দক্ষিণ মির্জাপুর রেগুলেশন-বহির্ভূ অঞ্চল ছিল, কিন্তু ১৮৭৪ সালে তপশীল জিলায় পরিণত হয়। ১৮৯১ সালে 'বোর্ড অব রেভিনিউ' দক্ষিণ মির্জাপুর অঞ্চলের (রবার্টগঞ্জ তহশীল শাসনের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা ও বিধিনির্দেশ প্রণয়ন করেন। রাজস্ব এবং দেওয়ানী ব্যাপারে প্রচলিত সাধারণ আইনের অধিকার থেকে এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দেওয়ানী মামলার ব্যাপারেও সাধারণ আদালতের অধিকার খারিজ করে দিয়ে কালেক্টরকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়। আপীলের সর্বোচ্চ দরবার হলো কমিশনার। শুধু সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং বিবা

বিচ্ছেদের ব্যাপারে আপীলের সর্বোচ্চ অধিকার এলাহাবাদ হাইকোর্টের হাতে ছিল। ফৌজদারী মামলায় বিচারের ভারও জিলার কোন পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে দেওয়া হয়। (১)

কয়েকটি আদিবাসী অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের রীতিনীতি এবং শাসনব্যবস্থার পলিসি ও প্রক্রিয়ার যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো তা থেকে কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব। প্রথম, এটা খুবই স্পষ্ট যে, সত্যি সত্যি আদিবাসী অঞ্চলে গোষ্ঠীগত স্বায়ত্তশাসনের কোন সুযোগ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দেন নি। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের পলিসি সার্থক্ করার জন্য যখন যেমন ইচ্ছা বিধান ও ব্যবস্থা তৈরী করে নিয়ে আদিবাসী অঞ্চলে প্রয়োগ করেছেন। মাঝে মাঝে আদিবাসী সর্দারদের দিয়ে রেগুলেশন বা আধা-রেগুলেশনের ব্যবস্থাকে অথবা কালেক্টর, কমিশনার এবং এজেণ্ট সাহেবের মরজি মাফিক রচিত ব্যবস্থাকে চালু করবার কাজে লাগান হয়েছে। এটা সর্দারতন্ত্র ছিল না, বরং বলা যায়—সর্দারদের সাহায্যে ইংরাজ কোম্পানীতন্ত্র। রেগুলেশন বহির্ভূত অঞ্চল অথবা পরবর্তীকালে তপশীলভুক্ত নামে ঘোষিত অঞ্চলগুলিই বিশেষভাবে আদিবাসী গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। এই সব অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার রীতিনীতি ও ইতিহাস লক্ষ্য করলেই প্রথমে চোখে পড়ে এর জটিলতা। খানিকটা সাধারণ আইন, খানিকটা বিশেষ আইন এবং তার সঙ্গে কিছুটা অফিসারী স্বেচ্ছাতন্ত্র মিশিয়ে এবং তার মধ্যে আবার দুর্বল গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের ভেজাল দিয়ে এক উদ্ভট শাসন ব্যবস্থা আদিবাসীর অদৃষ্টের ওপর চাপান হয়। আংশিক আধুনিক প্রথা, আংশিক প্রাগৈতিহাসিক প্রথা এবং সবার ওপর কমিশনারী যথেচ্ছাতন্ত্র—এই হলো রেগুলেশন-বহির্ভূত অথবা তপশীলভুক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক গঠন। দেওয়ানী ব্যাপার হয়তো সাধারণ আদালতের অধীন, এবং ফৌজদারী ব্যাপারে কমিশনার সাহেবই একমাত্র ন্যায়াধীশ।

(1) District Gazetteer of Mirzapur.

সমস্ত ব্যাপার দেখে এই ধারণা হয় যে, আদিবাসী অঞ্চলে কোনমতে একটা শান্তিরক্ষার জন্যই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ উৎসাহী হয়েছিলেন। জমির সমস্যা নিয়েই আদিবাসীরা বেশী বিচলিত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ ভূমি-ব্যবস্থার রীতি অনুসারে বেশীর ভাগ জমি হিন্দু জমিদার ও মহাজনের হাতে চলে যাচ্ছিল। বিক্ষুব্ধ আদিবাসীকে এই জমির শোক বহু বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জমি সম্বন্ধে আদিবাসীদের প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতি দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বিদ্রোহের পর প্রথম প্রথম কতগুলি আইন করে আদিবাসীদের জমি রক্ষার আনুকূল্য করেন। এইভাবে একটা শান্ত অবস্থা সৃষ্টি করেই, তারপর ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে ব্যাপক জরিপ ও নতুন বন্দোবস্ত ক'রে দস্তুরমত ভূমিকর প্রথা প্রবর্তন করেন। আদিবাসীকে আধুনিক যুগোপযোগী অবস্থা ও প্রয়োজনের জন্য যোগ্যতার সঙ্গে উন্নতি করার পথে অগ্রসর করিয়ে দেবার কোন নীতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নি। রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে আদিবাসীর জীবনযাত্রাকে পুরাতন বৃত্তের মধ্যেই অচল করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। সত্যি সত্যিই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাঁওতাল পরগণার দামিন অঞ্চলকে 'তালগাছের বৃত্ত' দিয়ে ঘিরে রেখেছেন কিন্তু ব্রিটিশ ভূমি-ব্যবস্থা আদিবাসীদের কাছে যতই নতুন ও অদ্ভুত লাগুক না কেন, এই একটি ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রবল অধ্যবসায়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত প্রাচীন আদিবাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে ছেড়েছেন।

কিন্তু সমস্ত আদিবাসী অঞ্চলে এই নীতি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি তবে এটাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টর নীতি। প্রথমে দমন নীতি, তারপর তোষণ-নীতি এবং তারপর আদিবাসীকে ধীরে ধীরে খাজনাদাতা বাধ্য প্রজারূপে পরিণত করার নীতি। সর্বত্র এই নীতির প্রক্রিয়া চলছে; কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধ সার্থক হয়েছে।

দৃষ্টান্ত: খন্দমাল ও গঞ্জামের খন্দেরা ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে কয়েকবার বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের পেছনে কতগুলি কারণ ছিল—

খন্দ অঞ্চলে পুলিশ প্রথার প্রবর্তন, ধরাবাঁধা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সড়ক তৈরীর জন্য বেগার খাটতে বাধ্য হওয়া, এই তিন কারণে খন্দেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। খন্দমাল এলাকায় পাহাড়ী উড়িয়ারা (এরা কোন আদিবাসী গোষ্ঠী নয়) জমির খাজনা দিয়ে থাকে, কিন্তু খন্দদের কাছ থেকে শুধু লাঙলকর (লাঙল প্রতি বার আনা) আদায় করা হয়। গঞ্জামের খন্দদের লাঙলকরও দিতে হয় না। অধিকাংশ ভূমিই এখনো জরিপ বা বন্দোবস্ত করা হয় নি। কোরাপুট বা ভিজাগাপট্টম এজেন্সির জমিও এখনো ভালভাবে জরিপ ও বন্দোবস্ত করা হয় নি। এখানকার আদিবাসী গোষ্ঠী 'ঝুম' প্রথায় চাষ করে। জঙ্গলের ওপর তাদের বিশেষ কতগুলি অধিকার গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তারা নিজেদের প্রয়োজনের মত মদ ঘরেই তৈরী করার অধিকার পেয়েছে।

রক্ষামূলক ব্যবস্থার রীতিনীতি ও রহস্য

'বিশেষ রক্ষামূলক' (Special Protection) ব্যবস্থা করেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাস্তব ক্ষেত্রে আদিবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে রক্ষা করতে পারেন নি। কালাহাণ্ডি রাজ্যের খন্দসমাজ ১৮৮২ সালে কোল্টাদের (মহাজন) হত্যা করতে আরম্ভ করে, কারণ খন্দদের জমি একে একে কোল্টাদের হাতে চলে গিয়েছিল। গঞ্জামের খন্দদের জমি একে একে উড়িয়াদের হাতে চলে যেতে থাকে। বিশেষ রক্ষামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও আদিবাসীর জমি সুরক্ষিত থাকতে পারে নি। কেন এ রকম হলো? এ বিষয়ে শুধু মহাজন ও সাহুকারের লোভ এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই প্রশ্নের উত্তর হয় না। আদিবাসীর এই অর্থনৈতিক অধঃপতনের ব্যাপারে স্বয়ং আদিবাসীরও দোষ রয়েছে এবং 'বিশেষ রক্ষামূলক' ব্যবস্থাগুলির মধ্যেও ত্রুটি আছে।

১৯১৭ সালে ১নং মাদ্রাজ আইন (Madras Act I) পাশ হয়। এই আইনের অপর নাম—'এজেন্সি অঞ্চলের সুদ ও ভূমি হস্তান্তর আইন (Agency Tracts Interest & Land Transfer Act).

আইনের নির্দেশ ছিল—গভর্ণরের এজেণ্টের অনুমতি ছাড়া আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন লোক জমি হস্তান্তর করতে পারবে না। আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন লোকের বিরুদ্ধে যদি কারও কোন মামলা করতে হয়, তবে এজেন্সি অঞ্চলের আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে; ডিক্রি পেলেও কেউ আদিবাসীর অস্থাবর সম্পত্তিকে ক্রোক করতে পারবে না। শতকরা ২৪ টাকার বেশী হারে সুদ আদায় করা নিষিদ্ধ হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই ধরণের রক্ষামূলক আইন কার্যক্ষেত্রে সার্থক হয় নি, কারণ কর্তৃপক্ষই এই আইনের নির্দেশগুলির মর্যাদা রক্ষা করেন নি। খন্দসমাজ মহাজনের কাছে চড়া সুদে দেনা করেছে, জমি বন্ধক দিয়েছে আর দরিদ্র হয়েছে। আদিবাসী অঞ্চলে বিশেষ রক্ষামূলক আইনের সাহায্যে

আদিবাসীকে রক্ষা করার কাজে গভর্ণমেণ্ট তাঁর অফিসারদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অফিসারদের আচরণ ছিল রক্ষামূলক নীতির বিপরীত। সরকারী অট্টালিকা নির্মাণে বা মেরামতের কাজে, সড়ক তৈয়ারীর কাজে এবং অফিসারদের মালপত্র বহনের কাজে মজুরকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়ার নীতি সরকারী অফিসারেরা পালন করতেন না। 'বেগার' প্রথাকে (বিনা মজুরিতে লোক খাটাবার) একটা চল্‌তি ও সঙ্গত প্রথা হিসাবে সরকারী অফিসারেরা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সরকারী অফিসারের কাছে আন্তরিক-ভাবে রক্ষামূলক ব্যবস্থার ভরসা করা আদিবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আদিবাসীরা লক্ষ্য করেছিল, প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার ব্যবসায়ে সরকারী অফিসারেরাও কম যান না। সুতরাং অফিসার পরিচালিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার ওপর আদিবাসীর পক্ষে কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করা সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়। রক্ষামূলক ব্যবস্থা অথবা তপশীলভুক্ত অঞ্চলে অনুসৃত সরকারী নীতির ব্যর্থতার মূল কারণ এইখানে। ব্যবস্থার নীতি হয়তো ভাল ছিল, কিন্তু ব্যবস্থা প্রয়োগের ব্যাপারে দুর্নীতি ছিল। ১৯২৪ সালে গভর্ণমেণ্ট এই কু-প্রথার উচ্ছেদের জন্য একটা সার্কুলার জারি করেন—সরকারী অফিসারেরা কাউকে বেগার খাটাতে পারবে না, খাটালে ন্যায্য মজুরী মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই সার্কুলারের দ্বারা অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি এবং এই কু-প্রথা আজও রয়ে গেছে। (১)

ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সব সরকারী ব্যবস্থা ও আইন করা হয়েছিল তার কিছু পরিচয় এর আগে বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু এত ক'রেও আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার আদর্শটা বাস্তবক্ষেত্রে কেমন যেন কাগজে কলমেই রয়ে গেল। আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থার সত্যিকারের উন্নতি বলে কোন ব্যাপার সম্ভব হলো না। ১৯০৩ সালে আবার একটা আইন পাশ করা হয়—ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন (Chotonagpur Tenancy Act)। মানভূম ছাড়া ছোটনাগপুর বিভাগের সর্বত্র এই আইনকে কার্যকরী করা হয়।

(1) Report of the Partially Excluded Areas Committee (Orissa).

পাঁচ বছরের বেশী মেয়াদে ভূমি বন্ধক দেওয়া বা নেওয়া বে-আইনী করা হয়। প্রজার স্বার্থ ও স্বত্বকে জমিদারের অধিকার থেকে আরও বেশী সংরক্ষিত করে ১৯০৮ সালের ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।

ভীল সমাজের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একই শাসন-নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমে ভীলদের শান্ত করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 'ভীল এজেন্সি' স্থাপন করেন, এবং রাজমহলের পাহাড়িয়াদের সম্পর্কে যে ধরণের শাসন ব্যবস্থা ছিল, ভীল সমাজের সম্পর্কেও সেই ধরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী চাষী হিসাবে ভীলদের বসতি পত্তন করাবার চেষ্টা হয়, এবং ভীলদেরও বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হতে থাকে। (১) ভীলেরা অল্পদিনের মধ্যে ভূমিপ্রিয় চাষী হিসাবে স্থায়ীভাবে বসতি করে ফেলে। এর পরেই ভীল এজেন্সি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের প্রচলিত সাধারণ আইন ব্যবস্থা ও নীতির দ্বারাই ভীল সমাজও শাসিত হতে থাকে। আদিবাসী গোষ্ঠী হলেও, ভীলদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয় নি, এবং এদের বসতি অঞ্চলকে তপশীলভুক্ত অঞ্চল বলেও ঘোষণা করা হয় নি। মাত্র মেওয়াসী উপগোষ্ঠী অধ্যুষিত পশ্চিম খান্দেশকে ১৮৮৭ সালে তপশীলভুক্ত অঞ্চল করা হয়। তপশীলভুক্ত হলেও মেওয়াসী অঞ্চলের জন্য খুব বড় রকমের কোন 'বিশেষ ব্যবস্থা' করা হয় নি। ১৮৪৬ সাল থেকেই এই অঞ্চলে কতগুলি বিশেষ বিশেষ ফৌজদারী আইন ছিল, ১৯২০ সালে এই বিশেষত্ব বাতিল করে দিয়ে সমস্ত অঞ্চলকে সাধারণ ফৌজদারী আইন ও পুলিশী কর্তৃত্বের অধীন করা হয়। কতগুলি বিশেষ দেওয়ানী আইন মাত্র প্রচলিত থাকে। ১৯১৮ সালে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, মেওয়াসি অঞ্চলে আবগারী আয় বাবদ যে টাকা উঠবে, তা সবই মেওয়াসিদের উপকারের জন্য ব্যয় করা হবে, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি।

গন্দ কোরকু এবং বৈগা গোষ্ঠীকে 'বিশেষভাবে রক্ষা' করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি, মাত্র মধ্যপ্রদেশের তিনটি জমিদারী অঞ্চলে করা হয়েছে।

(I) Brief Historical Sketches of the Bhil Tribes—Capt. D. C. Graham.

মিঃ উইলস্ (Mr. C. U. Wills) বলেন—ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর বিলাসপুর জমিদারী অঞ্চল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েই ছিল। আদিবাসীরা 'ঝুম' প্রথায় চাষ আবাদ করতো, কারণ জমির প্রাচুর্য ছিল এবং কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু ১৮৯০ সাল থেকেই অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়, ব্যবসায়ী, মহাজন ও জমিদারের শুভাগমন হতে থাকে। গোষ্ঠীর সর্দার অথবা গ্রামের মোড়লকে কিছু পরিমাণ বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতা দিয়ে পর পর কতগুলি আইন জারি করা হয়। কিন্তু মাত্র এইটুকু বিশেষত্ব দিয়ে জমিদারী অঞ্চলের আদিবাসীর কোন উন্নতি হয় নি।

এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে আদিবাসী গোষ্ঠীরা বহুসংখ্যায় বাস করে, কিন্তু এই সব অঞ্চলকে তপশীলভুক্ত অঞ্চল করা হয় নি। তবুও এইসব সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসী সমাজেরও কতকগুলি বিশেষ সমস্যা যে আছে, সরকারী কর্তৃপক্ষ সে তথ্য জানতেন। ১৮৬৩ সালেই স্যার রিচার্ড টেম্পল্ আদিবাসীদের সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নীতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। অর্থাৎ

"—পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চলে যে স্বাভাবিক বা সহজ সম্পদ আছে, (natural economy of hills & forests) সেটা সার্থকভাবে আহরণ করার কাজে আদিবাসীরাই প্রধান সহায়।" আদিবাসীদের 'ঝুম' চাষের অভ্যাসকে উচ্ছেদ করার নীতি গৃহীত হয়, কিন্তু এ বিষয়ে জবরদস্তি করা উচিত হবে না বলেই কর্তৃপক্ষ মনে করেন। কারণ, হঠাৎ একটা প্রাচীন উপজাতীয় অভ্যাসকে বন্ধ ক'রে দিলে আদিবাসীরা তাড়াতাড়ি লাঙল প্রথা গ্রহণ করবে, এরকম আশা করা যায় না। বরং জবরদস্তি করলে ঝুম-চাষী আদিবাসীরা হয়তো জীবিকাহীন হ'য়ে লুঠতরাজ ও গরু চুরির বৃত্তি গ্রহণ করে বসবে। (১)

পূর্বে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আদিবাসীর জন্য 'বিশেষ রক্ষামূলক' ব্যবস্থা হিসাবে কতগুলি আইন করেছিলেন, যার সাহায্যে আদিবাসীদের জমি হাতছাড়া হবার পথ বন্ধ করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সব আইন ব্যর্থ

(1) Aboriginal Tribes of the Central Provinces—Hislop.

হয়েছে। ফরসাইথ (Forsyth) স্বীকার করেছেন—"আইন ক'রে কখনো কোন অবনত জাতিকে উন্নত জাতির প্রতিপত্তি থেকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। বরং এইসব আইন প্রতিষ্ঠাভিলাষী ('aggressor') উন্নত সমাজের হাতেই একটা নতুন অস্ত্র হয়ে উঠেছে। আইন না করলে বরং আক্রান্ত সমাজ মুখোমুখি লড়াই করে তাদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে পারতো। জমির স্বত্বলীস্বত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রবর্তিত আইনগুলির মধ্যেই ত্রুটি আছে। আদিবাসীদের প্রতি 'দায়িত্ব' পালনের জন্য যে ভাবে আইনের প্রয়োগ হয়ে থাকে, তার মধ্যেও ত্রুটি আছে। আইনগত-ভাবে যা কিছুই করা হয়, দেখা গেছে যে শেষ পর্যন্ত হিন্দুরাই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সুবিধা পেয়েছে। বর্তমান অবস্থায় পুঁজিওয়ালা ধনী ব্যক্তি ছাড়া কারও সামর্থ্য নেই যে, পতিত জমিগুলি অধিকার করতে পারে। আদিবাসীদের এমন আর্থিক শক্তি নেই যে, তার দ্বারা পতিত জমি অধিকার সম্ভব হবে।...... আর একটা কথা, দেওয়ানী মামলা বিচার করার আদর্শ (Civil Justice) যে পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে, সাধারণ প্রদেশগুলিতে হয়তো তার সার্থকতা আছে, কিন্তু অরণ্যের আদিবাসীর কাছে সেটা ন্যায়বিচারের পদ্ধতি তো নয়ই, বরং তার বিপরীত।"

এপর্যন্ত যে সব ভূমি আইনের উল্লেখ করা গেল সেগুলি সবই প্রজার (আদিবাসী অথবা সাধারণ সমতলবাসী) স্বার্থ ও স্বত্বের জন্য করা হয়েছিল, অর্থাৎ জমিদার বা মহাজন যেন আদিবাসীর জমি সহজে গ্রাস না করতে পারে। এইসব আইনই ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এমন একটা ভূমি ব্যবস্থা করেছিলেন, যার দ্বারা জমিদার ও প্রজার স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। জমিদারের স্বার্থ দেখলে প্রজার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং প্রজার স্বার্থ দেখলে জমিদারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শুধু প্রজা-দরদী বা আদিবাসী-দরদী আইন প্রবর্তন করেন নি, জমিদার-দরদী আইনও সঙ্গে সঙ্গে চালু করে এসেছেন। হয়তো একেই বলে 'ব্রিটিশ-নীতি'। পরস্পর-বিরোধী দুই বিপরীত স্বার্থকেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট

আইনের সাহায্য দিয়ে এসেছেন। মধ্যপ্রদেশে ভূমিস্বত্ব আইনে (১৮৯৮) প্রজার স্বার্থ ও জমিদারের স্বার্থ উভয়ই বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোটনাগপুর অক্ষম জমিদারী আইন (Chotanagpur Encumbered States Act, 1876) স্থানীয় জমিদারের স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রণীত হয়। ১৯১৬ সালে মধ্যপ্রদেশের ভূমি হস্তান্তর আইন (Land Alienation Act) পাশ করে ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা হয়। তপশীলভুক্ত অঞ্চলেও এই আইন বলবৎ হয়, জমিদারের স্বার্থের জন্যই। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির মধ্যে এই বিচিত্র ভেজাল থাকায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে রক্ষামূলক আইনগুলির উদ্দেশ্য বাস্তবক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

অনগ্রসর অঞ্চল

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টের ওপর ভিত্তি ক'রে ১৯১৯ সালে ভারতের শাসন পদ্ধতিকে এক দফা সংস্কার করা হয়। উক্ত রিপোর্টে আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে 'বিশেষ ব্যবস্থার' নীতি পূর্ববৎ বহাল থাকে। রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে—"আদিবাসী সমাজে এমন কোন উপাদান নেই যার ওপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করান যেতে পারে।" ১৯১৯ সালের নতুন ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনে বড়লাটের হাতেই আদিবাসী অঞ্চলকে ইচ্ছামত অর্থাৎ বিশেষভাবে শাসন করার খাস ক্ষমতা দেওয়া হয়। পুরাতন তপশীলভুক্ত জিলা আইনে উল্লিখিত অঞ্চলের তালিকাটি পুনর্বিবেচনা ক'রে, একটা নতুন 'অনগ্রসর' (Backward Tracts) অঞ্চলের তালিকা তৈরী হয়।

নতুন অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকা এই দাঁড়ায়:—(১) লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম, (৩) স্পিতি, (৪) অঙ্গুল জিলা, (৫) দার্জিলিং জিলা, (৬) লাহৌল, (৭) গঞ্জাম এজেন্সি, (৮) ভিজাগাপট্টম এজেন্সি, (৯) গোদাবরী এজেন্সী, (১০) ছোটনাগপুর বিভাগ, (১১) সম্বলপুর জিলা, (১২) সাঁওতাল পরগণা জিলা, (১৩) গারো পাহাড় জিলা, (১৪) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ (শিলং মিউনিসিপ্যালিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্ট বাদে), (১৫) মিকির পাহাড়, (১৬) উত্তর

কাছাড় পাহাড়, (১৭) নাগা পাহাড়, (১৮) লুসাই পাহাড়, (১৯) সদিয়া বলিপাড়া ও লখিমপুর সীমান্ত অঞ্চল।

অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকা দেখে বুঝতে পারা যায়, তপশীলভুক্ত অঞ্চলের তালিকা থেকে সমস্ত অঞ্চলকেই এর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি। কিছু বাদ পড়ে প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের মধ্যে চলে গেছে। কিন্তু সাধারণ অঞ্চলের গণ্ডীর মধ্যে পড়লেও কার্যতঃ সে সব অঞ্চলে ১৯১৯ সালের সংস্কার চালু করা হয় নি।

প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে অনগ্রসর অঞ্চলগুলি কতটুকু অধিকার লাভ করলো ?

এ বিষয়ে অনগ্রসর অঞ্চলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ—(১) কতগুলি অঞ্চল একেবারেই কোন প্রতিনিধিত্ব লাভ করে নি, যথাঃ লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, স্পিতি ও অঙ্গুল। (২) কতগুলি অঞ্চলে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়, যথাঃ দার্জিলিং, লাহৌল এবং আসামের সমগ্র অনগ্রসর অঞ্চল। (৩) কতগুলি অঞ্চলে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়, উপরন্তু কয়েকটি সরকার মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও থাকে, যথাঃ ছোটনাগপুর বিভাগ, সম্বলপুর জিলা, সাঁওতাল পরগণা, গঞ্জাম এজেন্সী, ভিজাগাপট্টম এজেন্সী ও গোদাবরী এজেন্সী।

অনগ্রসর অঞ্চলের ওপর প্রাদেশিক আইনসভার অধিকার কতটুকু, তা এই শ্রেণী বিভাগ থেকেই বোঝা যায়। প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত ৪টি অঞ্চলে আইন-সভার কোন অধিকার নেই, কারণ ঐ অঞ্চলের কোন প্রতিনিধিত্ব আইনসভার নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি আইনসভায় আছে, সুতরাং এই দুই শ্রেণীর অঞ্চলের ওপর প্রযোজ্য আইন রচনার ক্ষমতা আইনসভার থাকা উচিত এবং আছেও। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা সপরিষদ বড়লাট অথবা সপরিষদ গভর্ণরের ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। আইনসভায় গৃহীত আইনকে বড়লাট অথবা গভর্ণর ইচ্ছে করলে প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন অনগ্রসর অঞ্চলে

প্রয়োগ না-ও করতে পারেন, অথবা কিছু রদবদল করে নিয়ে প্রয়োগ করতে পারেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অনগ্রসর অঞ্চলকে যে ভাবে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, তাতে এই অঞ্চলে প্রাদেশিক আইনসভা অথবা মন্ত্রিমণ্ডলের অধিকার থাকার কথা। বিহার ও উড়িষ্যার অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে বস্তুতঃ মন্ত্রিমণ্ডলের অধিকার কার্যকরী হয়ে থাকে। সমস্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলী যে সব ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন, অনগ্রসর অঞ্চলেও তাই করে থাকেন—কাজের বেলায় বিশেষ কোন বাধা নেই। কিন্তু আসামের ক্ষেত্রে আবার একটা ব্যতিক্রম করা হয়েছে। বিহার-উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল অনগ্রসর অঞ্চল শাসনে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিচালনা করে থাকেন, আসামের মন্ত্রিমণ্ডলীকে ততটা সুযোগ কার্যক্ষেত্রে দেওয়া হয় নি। গভর্ণর নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এমন সব নির্দেশ বলবৎ করেছেন, যার ফলে অনগ্রসর অঞ্চলে মন্ত্রিমণ্ডলের ক্ষমতা খুবই সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায়, অনগ্রসর অঞ্চলের ওপর আইনসভার ক্ষমতাকে খর্ব করেই রাখা হয়েছে। দেখা যায় যে, অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য একটা সোজা সরল শাসন পদ্ধতি ১৯১৯ সালে এসেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পরিকল্পনা করতে পারেন নি। কোথাও ডায়ার্কি (যেমন বিহার ও উড়িষ্যার অনগ্রসর অঞ্চলে), কোথাও আংশিক ডায়ার্কি (যেমন আসামের অনগ্রসর অঞ্চলে) এবং কোথাও একেবারে খাস গভর্ণরী শাসন (তালিকায় উল্লিখিত ১নং থেকে ৪নং অঞ্চল)।

১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের জন্য একদফা শাসন সংস্কার করা হয়। এর পর ১৯৩৫ সালে আর এক দফা শাসন সংস্কার হয়। এই দুই শাসন সংস্কারের মধ্যবর্তী সময়ে আদিবাসীদের উন্নতির জন্য বলতে গেলে আর কোন নতুন ব্যবস্থা বা আইন করা হয় নি। ১৯১৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত আদিবাসীদের জন্য প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে কতগুলি বিশেষ রক্ষামূলক ব্যবস্থার আইন করা হচ্ছিল, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। রক্ষামূলক ব্যবস্থার মধ্যে প্রধানতঃ এবং একমাত্র আদিবাসীদের জমি রক্ষার চেষ্টাই হয়েছিল। কিন্তু জমির ব্যাপার ছাড়া আদি-

বাসীদের যে আর কোন সমস্যা বা প্রয়োজন আছে এবং জমি রক্ষার পদ্ধতি ছাড়া আদিবাসীকে উন্নত করার আর কোন পদ্ধতি আছে, তা গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার মধ্যে আসে নি। সম্ভবতঃ এদিক দিয়ে কোন চিন্তাই করা হয় নি।

প্রায় প্রত্যেক আদিবাসী অঞ্চলে রেগুলেশন বা বিশেষ আইনের সাহায্যে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দফায় দফায় জমি রক্ষার জন্য বা আদিবাসীদের আর্থিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা হলো, তার ভাল-মন্দ পরিণামের পরিচয় সরকারী রিপোর্টের মধ্যেই পাওয়া যায়। ১৯১৭ সালে খন্দদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে আইন হলো, ১৯৩৮ সালের উক্ত আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তদন্ত ক'রে এক সরকারী রিপোর্টে বলা হলো যে, "সরকারী অফিসারেরা ঐ আইনকে ভালভাবে কার্যকরী করে নি। প্রত্যেকটি জরিপ ও বন্দোবস্তের সময় তদন্তের ফলে পূর্ব প্রচলিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার ব্যর্থতা অথবা আংশিক সাফল্যের কথা স্বীকৃত হয়েছে। একটা আইন করে কিছুদিন পরেই সে আইনকে হয় সংশোধন করতে হয়েছে অথবা নতুন আইন করে আবার ভিন্নভাবে রক্ষামূলক ব্যবস্থা করতে হয়েছে। একই অঞ্চলে বার বার রক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন এই ইঙ্গিত করে যে, ব্যবস্থাগুলি ঠিক প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি করতে পারে নি।"

কোন ক্ষেত্রেই রক্ষামূলক ব্যবস্থা বা বিধান বা আইন আদিবাসীর উপকার করে নি, এ কথা অবশ্য সত্য নয়। দু'এক ক্ষেত্রে এর ফল ভাল হয়েছে। কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করলেই জানা যায় যে, নিছক সরকারী রক্ষামূলক বিশেষ আইনগুলির জন্যেই এ উন্নতি হয় নি, বে-সরকারীভাবেই এমন কতগুলি সামাজিক, আর্থিক বা শিক্ষার সুযোগ আদিবাসীরা এক্ষেত্রে পেয়েছিল, যার ফলে কিছু উন্নতি সম্ভব হয়।

সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর অবস্থা

এইবার দেখা যাক, প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলে যে সব আদিবাসী বসবাস করে, তাদের অবস্থার কতটুকু উন্নতি বা অবনতি হয়েছে? আরও দেখতে হবে, সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীরা কি তপশীলভুক্ত বা অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসীদের

তুলনায় বেশী দুর্দশা লাভ করেছে? আইনের দিকে তাকালে, সরকারী নীতির দিকে তাকালে এবং ইংরাজ নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ মহাশয়দের মতবাদের দিকে তাকালে, এই তত্ত্বই আমাদের মেনে নিতে হবে যে, সাধারণ অঞ্চলের আদি-বাসীর পক্ষে রক্ষিত (Protected) অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসীর তুলনায় অবনত হওয়া উচিত। কারণ, সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসী সকলের মত সাধারণ আইনের দ্বারা পরিচালিত, বিশেষ রক্ষামূলক আইনের স্নেহ এখানে নেই। দ্বিতীয় কথা, সাধারণ অঞ্চলে হিন্দু-সংস্পর্শও খুবই বেশী রয়েছে।

বাঙলা প্রদেশে সাধারণ অঞ্চলের অধিবাসী সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনকে সংশোধিত করা হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সাঁওতালদের প্রজাস্বত্ব রক্ষার জন্য এই আইনের সংশোধিত নির্দেশগুলি প্রথম প্রয়োগ করা হয়; পরে সুন্দরবন অঞ্চলেও চালু করা হয়। মধ্য প্রদেশের ভূমি হস্তান্তর আইন (১৯১৬) বিশেষ আইন নয়। এই সাধারণ প্রাদেশিক আইন মান্দলা জিলার আদিবাসী এবং মেলাঘাট ও অমরাবতী জিলার আদিবাসীকে উপকৃত করেছে। মান্দলা, মেলাঘাট ও অমরাবতী কোনটাই 'রক্ষিত' অঞ্চল নয়। মধ্যপ্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের লোকেরা রক্ষিত অঞ্চলের লোকদের চেয়ে আর্থিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বেশী উন্নত। বলাঘাটের লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাদনদাতা মহাজনদের 'বয়কট' করে সায়েস্তা করতে সমর্থ হয়। ১৯২০-২১ সালে নাগপুরের পতাকা সত্যাগ্রহে এবং ১৯২৩ সালের জঙ্গল সত্যাগ্রহে খন্দসমাজ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগ-দান করে। দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ প্রাদেশিক আইনের সাহায্যে আদিবাসীদের উন্নতি করা সম্ভব হয়েছিল, এর জন্য তপশীলভুক্ত জেলা বা অনগ্রসর অঞ্চল সৃষ্টি করে সাধারণ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার গণ্ডীর বাইরে তাদের নিয়ে যাবার কোন অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল না। প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীরা সকল সাধারণ নাগরিকের মত সমান সুখে-দুঃখে ও সুযোগে জীবিকা নির্বাহ করেছে এবং তারা 'রক্ষিত' অঞ্চলের জাতভাইদের চেয়ে অবনত হয় নি।

তপশীলভুক্ত রক্ষিত অঞ্চল হয়ে সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার আদিবাসীর জমি রক্ষার সমস্যাকে অল্পবিস্তর সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু ছোটনাগপুর বিভাগের মানভূম, হাজারীবাগ ও পালামৌয়ের আদিবাসীরা বস্তুতঃ ভূমিহীন দাসশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এটা গভর্ণমেণ্টেরই স্বীকৃতি। "ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা তাদের জমি যখন হাতছাড়া করে ফেলেছে, তখন তাদের জমি বাঁচাবার জন্য বিশেষ আইন চালু করা হয়" (১)। এ থেকেই ধারণা হয়, রক্ষিত অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট আদিবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য কি পরিমাণ তৎপরতা ও সত্বরতা দেখিয়েছেন।

গভর্ণমেণ্টের রক্ষিত অঞ্চলেই ঘন ঘন প্রজা-বিদ্রোহ হয়েছে। এর অর্থ, রক্ষিত অঞ্চলের প্রজাদের অর্থাৎ আদিবাসীদের মধ্যে বার বার অসন্তোষের কারণ ঘটেছিল। এটা রক্ষিত অঞ্চলের 'বিশেষ শাসনের' ব্যর্থতার প্রমাণ। রক্ষিত অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট যে শাসন-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটাকে মূলতঃ নেতিমূলক বা নেগেটিভ নীতিই বলা চলে। গঠন-মূলক কোন নীতি তার মধ্যে ছিল না। শুধু নিষেধ করা, বন্ধ করা, বাতিল করা, রহিত করা ইত্যাদি। কিন্তু কোন সমাজের শুধু খারাপ প্রথাগুলিকে নিষেধ, বন্ধ বা বাতিল করলেই সুফল হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা প্রচলন করা, গঠন করা এবং সৃষ্টি করাও চাই। কোন কোন বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট আবার নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছেন, ফলে যে অবস্থা সেই অবস্থা রয়ে গেছে। খন্দসমাজের ঝুম-চাষ প্রথাকে গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করলেন না। এটা উদার নীতি নয়। ঝুম-চাষ বন্ধ করলে সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল পদ্ধতিতে খন্দসমাজকে শিক্ষিত করার যে পরিশ্রম, দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট ছিল, গভর্ণমেণ্ট সেটা এড়িয়ে গেলেন। ছোটনাগপুরের কোরোয়া ও বিরহোর আজও ভ্রাম্যমাণ বর্বরদশায় রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভূমি বা এলাকা সংরক্ষিত করে চাষী হিসাবে বসতি করিয়ে দেবার চেষ্টা গভর্ণমেণ্ট আজও করে উঠতে পারেননি। অপর দিকে তুলনা করে দেখা যায় যে, মধ্যপ্রদেশের

(1.) Oraons of Chotanagpur.—S. C. Roy.

বগাদের পক্ষে 'রক্ষিত অঞ্চলে' পড়বার অদৃষ্ট হয় নি। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট তাদের নানাভাবে উন্নত হবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভীল-সমাজের পক্ষেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য, তারা 'রক্ষিত অঞ্চলে' পড়ে নি বলে সাধারণভাবেই শাসিত হয়েছে এবং 'রক্ষিত অঞ্চলের' আদিবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা উন্নত।

রাজমহলের পাহাড়িয়ারা প্রায় দেড়শত বছর হলো 'রক্ষিত অঞ্চলে' থেকে অফিসারী শাসনের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যে দশায় আগে ছিল, আজও প্রায় সেই দশা। 'রক্ষিত অঞ্চলের' আদিবাসী খন্দসমাজও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মর্জির দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত হয়ে আসছে এবং কৃষি বা শিল্পে কোন কুশলতা আজও তারা লাভ করতে পারে নি। ১৯৩০ সালে বিহার-উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে—"গত ৭০ বৎসরের মধ্যে সমগ্রভাবে আদিবাসী সমাজের চরিত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। আদিবাসীকে শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলার জন্য কোন গঠনমূলক কাজ ভাল করে আরম্ভও হয় নি। (১)

(1.) Report of the Indian Statutory Commission.

কয়েকটি বিশিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(১) ভীল : ভারতের তিনটি প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্যতম গোষ্ঠী হলো ভীলেরা, আর দুটি প্রধান গোষ্ঠী হলো সাঁওতাল ও গন্দ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও রাজপুতনার দেশীয় রাজ্য অঞ্চলে ভীল সমাজের প্রধান বসতি। ঠক্কর বাপার উদ্যোগে ১৯২১ সাল থেকে ভীল সেবামণ্ডল নামে একটি সমিতি এদের মধ্যে সেবা, শিক্ষা ও সংস্কারমূলক কাজ করে আসছে। অনেকগুলি বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে।

ভীল সমাজে সম্প্রতি এক ভীল কর্মবীরের প্রেরণায় বিরাট সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই ভীল কর্মবীরের নাম গুলা মহারাজ। গুল মহারাজের প্রেরণায় হাজার হাজার ভীল মাদক বর্জন করে এবং স্নান, শৌচ প্রভৃতি নিত্যাচার উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে। তা ছাড়া ভীলেরা স্বয়ং স্বসমাজে শিক্ষাপ্রচারের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

(২) ভুঁইয়া : ভুঁইয়ারা অধিকাংশ উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলিতে বাস করে। সংস্কৃতির দিক দিয়ে সমস্ত ভুঁইয়াসমাজ এক স্তরে নেই, কোন কোন উপগোষ্ঠী একেবারে আদিম সভ্যতার স্তরে আছে, যেমন কেঁওঝড়ের পাহাড়ী ভুঁইয়ারা। আবার দেখা যায় গাঙ্গপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্টেটের ভুঁইয়া জমিদার সমাজ একেবারে আধুনিক হিন্দুর মত সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন।

(৩) চাকমা : পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী চাকমা আদিবাসী সমাজ। এঁরা কৃষিপ্রধান সভ্যতা গ্রহণ করেছে। ১৫।২০ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত এরা হল-কর্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করে নি। 'ঝুম' প্রথায় চাষের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এরা অধিকাংশই 'হলধরের' আদর্শে দীক্ষিত, লাঙ্গল দিয়েই কৃষিকার্য করে।

(৪) গড়াবা : উড়িষ্যার কোরাপুট এবং মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম জেলায় এদের বসতি। মেয়েদের মধ্যে পরিচ্ছদের আড়ম্বর খুব বেশী। তুলো ও অন্যান্য

উদ্ভিজ্জ আঁশের তৈরী সুতোয় এরা স্বহস্তে বস্ত্র তৈরী ক'রে নেয়। বস্ত্র বয়ন ও রন্ধনের কাজ এদের গৃহশিল্প, মিলের তৈরী বস্ত্র এরা সহজে ব্যবহার করেনা। গড়াবা মেয়েদের কর্ণাভরণ দেখবার মত; পেতলের তার দিয়ে তৈরী ৮ ইঞ্চি ব্যাসের গোলাকার মাকড়ী দুকান থেকে লম্বমান হয়ে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে থাকে।

(৫) গারো: আসামের গারো আদিবাসীরা সমাজব্যবস্থায় খুবই উন্নত। আদর্শ গণতন্ত্রবাদের দৃষ্টান্ত গারো সমাজ। নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে স্বীকৃত। গ্রামসভায় বিচার ও বিপদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই আলোচনায় যোগদান করে।

(৬) গন্দ: গন্দেরা সংখ্যায় প্রায় ২৫ লক্ষ এবং মধ্যপ্রদেশেই ১০ লক্ষ গন্দ বাস করে। প্রাচীনকালে কতগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত গন্দ রাজ্য (State) ছিল এবং বর্তমানেও গন্দ গোষ্ঠীর কয়েকজন দেশীয় রাজন্য (Native Chief) আছেন। গন্দ রাণী দুর্গাবতী মোগল বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। গন্দওয়ানা (Gondwana) নামে যে বিশিষ্ট শিলাময় ভূখণ্ডের কথা ভূতাত্ত্বিকের (Geologist) পরিভাষায় পাওয়া যায় তার নামকরণ এই গন্দভূমি থেকেই হয়েছে। গন্দভূমির পাষাণের বেল্ট আফ্রিকা মহাদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। মারিয়া গন্দ, মুরিয়া গন্দ প্রভৃতি কয়েকটি গন্দ উপগোষ্ঠী আছে, যারা নৃতাত্ত্বিকের (Anthropologist) বিচারে পৃথিবীর আদিমতম নর-গোষ্ঠীর অন্যতম নমুনা বলে স্বীকৃত হয়েছে।

(৭) কাছাড়ী: জনসংখ্যার দিক দিয়ে কাছাড়ীরা আসামের মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ আদিবাসী সমাজ, প্রায় ৩½ লক্ষ। কিংবদন্তী বলে—কাছাড়ীরা ভীম-হিড়িম্বার পরিণয়জাত পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর। হরিজন সেবক সঙ্ঘ কাছাড়ীদের মধ্যে কিছু কাজ করেছে। আসাম গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম কাছাড়ী সমাজের মানুষ।

(৮) বৈগা: এরা মধ্যপ্রদেশের গন্দ সমাজের একটি প্রতিবেশী গোষ্ঠী। কিন্তু গন্দদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। 'ঝুম' চাষের দিকে এদের ঝোঁক বেশী;

লাঙ্গল গ্রহণে আগ্রহ নেই। যাদুতন্ত্রে খুবই বিশ্বাসী। ভেরিয়ার এলুইন (Verier Elwin) নামক ইংরাজ নৃতাত্ত্বিক বৈগা সমাজে থেকে অনেক গবেষণা করেছেন। ভারতের আদিবাসীদের দাবী নিয়ে মিঃ এলুইন তাঁর নানা লেখার মধ্য দিয়ে আন্দোলন করে থাকেন। আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ এলুইনের বক্তব্য, অভিমত ও ব্যাখ্যা কতদূর যুক্তিসহ সে বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(৯) কত্‌কারি: পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে এদের বসতি। কত্‌ বা কথ্‌ অর্থ হিন্দীতে খয়ের। এই আদিবাসী গোষ্ঠী পূর্বে খয়ের তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতো, এদের নামকরণ থেকেই তা বোঝা যায়। এখনও কোন কেউ এই পেশা রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ কত্‌কারি কাঠকয়লা এবং জ্বালানি কাঠ বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করে। ১৯৪০ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী থানা জেলায় আদিবাসী সেবামণ্ডল প্রতিষ্ঠা ক'রে স্থানীয় কত্‌কারি, বর্লি ও ঠাকুর প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য উদ্যোগ করেন।

(১০) খাসি বা খাসিয়া: কিংবদন্তী বলে খাসি গোষ্ঠীর আদিবাসীরা অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর। খাসি সমাজে খৃষ্টধর্ম প্রচার খুব বেশী রকমের হয়েছে এবং খৃষ্টান খাসি সমাজের নরনারী য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পর্যন্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। খৃষ্টান খাসি সমাজে শিক্ষার প্রসারও মোটের ওপর ভাল। আসামের প্রাক্তন মন্ত্রিসভায় মিস্ ডান (Miss Dunn) নামে জনৈকা খাসি মহিলা অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। খাসিয়া অঞ্চলের বহু বিদ্যালয়ে রোমান অক্ষরে খাসি ভাষা লেখা, ছাপা ও পড়ান হয়, অসমীয়া অক্ষর গ্রহণ করা হয় নি। খাসি দেশীয় রাজ্যগুলিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু রাজার ক্ষমতা কিছুটা গণতন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ দরবার বা মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

(১১) খন্দ: প্রধান বসতি উড়িষ্যায়, সংখ্যায় প্রায় ৭½ লক্ষ। খন্দদের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আইন করে এই প্রথা উচ্ছেদ করেছেন। যে ব্যক্তিকে বলি দেবার জন্য নির্দিষ্ট করা হতো, তাকে

'মারিয়া' বা উৎসর্গ বলা হতো। ১৯০১ সালের আদম সুমারিতে ২৫ জন খন্দ নিজেদের 'মারিয়া' শ্রেণী বলে পরিচয় দেয়, অর্থাৎ তারা মারিয়াদের বংশধর। বলি দেবার জন্য নির্বাচিত ২৫ জন মারিয়াকে গভর্ণমেণ্টের লোক উদ্ধার করেছিল, এরা তাদেরই বংশধর। খন্দেরা এর পর থেকে নরবলির বদলে মহিষ বলির প্রথা গ্রহণ করেছে। মারিয়া অনুষ্ঠান বা নরবলির প্রথা আইন করে উচ্ছেদ করা হলেও মাঝে মাঝে 'বিক্ষিপ্তভাবে এমন এক একটা গোপন হত্যাকাণ্ড হয়, যাকে বস্তুতঃ মারিয়া অনুষ্ঠান বলিয়া সন্দেহ করবার কারণ থাকে। ১৯০২ সালে খন্দ সমাজের পক্ষ থেকে গঞ্জামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে এক আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছিল যে, আবার তাদের নরবলি বা মারিয়া অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হোক। সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি খন্দসমাজের জন্য কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেছেন এবং অন্যান্য সেবা ও শিক্ষামূলক কাজের জন্য একটা আশ্রমও করেছেন। গঞ্জাম পাহাড়ী অঞ্চলের খন্দেরা গভর্ণমেণ্টকে কোন ভূমিকর (Land Tax) দেয় না। মারিয়া অনুষ্ঠান বর্জন করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গভর্ণমেণ্ট নাকি প্রায় একশ' বছর আগে খন্দদের প্রতি শুভেচ্ছা ও পুরস্কারস্বরূপে এই অনুগ্রহ দেখিয়েছেন।

(১২) কোণ্ডা-ডোরা: পূর্ব গোদাবরী জেলায় এদের বসতি, বর্তমানে বহুল পরিমাণে তেলেগু-সংস্কৃতি এরা গ্রহণ করেছে। এরা পাহাড়ের ওপরেই চাষবাস করে। এরা সম্ভবতঃ খন্দ গোষ্ঠীর একটি শাখা।

(১৩) কোইয়া: এরাও তেলেগু-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। এরা সম্ভবতঃ খন্দ গোষ্ঠীরই একটি শাখা।

(১৪) কুকি: আসামের একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। পার্বত্য ত্রিপুরাতেও এরা আছে। নাগা গোষ্ঠীর মত এদের এক শ্রেণীর মধ্যে মুণ্ড-শিকার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাবেক কুকি সমাজে বিবাহেচ্ছু কুকি যুবককে আগে কোন শত্রুকে হত্যা করে তার মুণ্ড নিয়ে আসতে হতো, তবে তার বিবাহ সম্ভব হতো। গ্রামের মধ্যে উচু বাঁশের চূড়ায় শত্রুর মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখার প্রথা ছিল।

(১৫) লুসাই : দক্ষিণ-পূর্ব আসামে প্রায় বর্মার গা ঘেঁষে লুসাই পাহাড় অঞ্চলে এদের বাস। অঞ্চলটি পথহীন দুর্গমতার জন্য প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলে যাতায়াতের একটি বৈশিষ্ট্য দোল্‌না-পথ। এদের মধ্যেও মুণ্ড-শিকার প্রথা প্রচলিত ছিল।

(১৬) মিকির : একটি অহিফেনবিলাসী সমাজ। মিকির (এবং খাসিয়ারা) মৃৎ-শিল্পে পারদর্শী, অলাতচক্র বা কুমোরের চাকা ব্যবহারের কৌশল এরা জানে। তুলো এবং ধানের চাষও এরা জানে, কিন্তু চাষের পদ্ধতি সেই অতি-পুরাতন 'ঝুম' প্রথা।

(১৭) নাগা : আসামে এদের বাস এবং সংখ্যায় ২$\frac{১}{৪}$ লক্ষ। মুণ্ড-শিকারের পদ্ধতি এদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে।

গুইডালো নামে এক নাগা রমণী সম্বন্ধে আধুনিক রাজনীতি-উৎসাহী ভারতীয় সমাজ কিছু কিছু খবর রাখেন। পণ্ডিত নেহরু এঁর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে উল্লেখ করায় গুইডালোর কাহিনী বহু প্রচারিত হয়। তরুণী গুইডালো এবং আর একজন নাগা তরুণ, উভয়ে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ-ভারতীয় পুলিস ও সৈনিকের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পলিটিক্যাল অফিসারের আবাস আক্রমণ করে। উভয়েই—তরুণী গুইডালো এবং তার সহকর্মী তরুণ নাগা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়। তরুণটির ফাঁসি হয় এবং গুইডালোর হয় নির্বাসন। সম্প্রতি এ বিদ্রোহিণী নাগা-রমণী মুক্তিলাভ করেছেন।

(১৮) ওঁরাও : ছোটনাগপুরের একটি প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠী। ওঁরাওদের মধ্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। রাঁচী শহরে ও জেলায় ওঁরাও এবং মুণ্ডাদের কয়েকটি স্কুল আছে। বহু ওঁরাও ছোটনাগপুরের খৃষ্টান মিশনারীদের সুদীর্ঘ প্রচার-সাধনার ফলে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। অখৃষ্টান ওঁরাওদের মধ্যে রায় সাহেব বন্দীরাম জনৈক বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তিনি বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য।

ছোটনাগপুরের ওঁরাও এবং মুণ্ডাসমাজে ইংরেজি শিক্ষার কিছু প্রসার হওয়ায় অন্যান্য প্রত্যেক প্রদেশের আধুনিক ভারতীয়ের মত একটা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক

(Middle Class) শ্রেণী গড়ে উঠেছে। খৃষ্টান এবং অ-খৃষ্টান ওঁরাও ও মুণ্ডাদের দুই সমাজেই 'ভদ্রলোক' শ্রেণী দেখা দিয়েছে। কিন্তু খৃষ্টান খাসিয়া সমাজের মত এরা বেশভূষায় ফিরিঙ্গিয়ানা গ্রহণ করে নি।

(১৯) পরাজ: কিছু কিছু কৃষিকাজ এবং গরু ও শূকর পালন পরাজদের জীবিকা। পরাজ মেয়েদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য আছে। পরিচ্ছদ মাত্র একটি দশ আঙ্গুল চওড়া কাপড় কোমরে জড়ান। অলঙ্কারের মধ্যে বুকভরা অজস্র পুঁতির মালা। মেয়েরা মাথা নেড়া ক'রে তার ওপর একটি টায়রা এঁটে দেয়।

(২০) সাঁওতাল: সংখ্যায় প্রায় ৩০ লক্ষ; সাঁওতাল পরগণাতেই এদের সংখ্যাধিক্য। এরা কৃষিতে অভ্যস্ত, গৃহ, সমাজ ও গ্রামের প্রতি অনুরাগী। কিন্তু ভারতবর্ষের সকল আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র সাঁওতালেরাই সবচেয়ে দ্রুত মজুর-জীবন গ্রহণ করেছে। এরা দলে দলে চা-বাগানের শ্রমিক হয়ে দেশান্তরে গেছে, কোলিয়ারী বা কয়লার খনিতে মালকাটার কাজ নিয়েছে এবং বহু কারখানাতে দৈনিক বাঁধা পরিশ্রমের প্রথায় মজুরবৃত্তি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন নতুন অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে এরা নিজেকে খাপ খাইয়ে চলবার মত গুণ ও শক্তি রাখে। বাঙালা দেশেও এরা কৃষক হয়ে জীবিকা অর্জন করে থাকে। পতিত ও জংলী জমিতে আবাদের পত্তন করতে এদের সমকক্ষ কেউ নেই।

(২১) শবর: দক্ষিণ উড়িষ্যায় বসতি। রামায়ণের শবরীর উপাখ্যান আধুনিক ভারতীয়ের চিত্তে করুণ-মধুর সমবেদনা সৃষ্টি করে। রামায়ণের শবরী এই শবর জাতির মানুষ—ইতি জনশ্রুতি। রামচন্দ্রের জন্য পথের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে শবরীর, তবু প্রতীক্ষায় ক্লান্তি নেই। সে শুধু দৃষ্টি মেলে পথের দিকে চেয়ে আছে। ঈপ্সিতের জন্য প্রতীক্ষায় এই বুক-ভরা জীবনপণ আকুলতা, শবরী যেন স্বয়ং একটি আগ্রহের মহাকাব্য।

শবরেরা, পাহাড়ের গায়ে ধাপে আলবাঁধা ক্ষেত তৈরী করে এবং তার সঙ্গে অতি সুন্দর কৌশলে সেচ ব্যবস্থাও করে থাকে। এই ধাপ-বাঁধা কৃষি ('Terraced cultivation') যাদের আয়ত্ত তারা কৃষিকলায় যথেষ্ট উন্নত সন্দেহ নেই।

(২২) টিপ্‌রা: পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এদের বসতি। এদের অনেকখানি বাঙালীত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে, অর্থাৎ এরা অনেকখানি বাঙলা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে।

আবগারি নীতি ও আদিবাসী

আদিবাসীসমাজের একটা মস্তবড় আচারগত দোষ—মদ্যপানের অভ্যাস। শুধু উৎসব-রাত্রির মুহূর্তগুলিকে প্রগল্‌ভ করার জন্য নয়, প্রাত্যহিক জীবনেও মদের নেশা আদিবাসীকে গ্রাস করে বসে আছে। শুধু আদিবাসী পুরুষ নয়, মেয়েদের মধ্যেও এ-নেশা সমানভাবে প্রবল। কতগুলি গোষ্ঠী মদের প্রতি এত আসক্ত যে, তারা আর সময়-অসময় বিচার করে না। কাজের সময়ে হোক বা কাজ ফাঁকি দিয়ে হোক এবং অবসরের সময়ে তো কথাই নেই—মদ পেলেই হলো। সুতরাং আদিবাসীর অভ্যাসকে বরং বলা যায় পানোন্মত্ততা।

পানোন্মত্ততা কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর নৈতিক চরিত্রকে যথেষ্ট শিথিল ও অবনত করেছে, এ সত্যে সন্দেহ নেই। পানোন্মত্ততার জন্যই বহু উৎসবের বিহ্বলতা শেষ পর্যন্ত যৌন ব্যভিচারের উৎসবে পরিণতি লাভ করে। এদের পানোন্মত্ততার দাবী মেটাতে গিয়েই পয়সার ঘাঁটতি পড়ে এবং একে একে জমি, শস্য, গরু ও বাছুর মহাজনের হাতে বন্ধকদশা প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন উঠবে যে, আদিবাসীদের মধ্যে এত পানোন্মত্ততা কেন? এ বিষয়ে আদিবাসীর সামাজিক ঐতিহ্য অবশ্যই দায়ী; কিন্তু এর ওপরেও একটা কারণ আছে। গভর্ণমেণ্টের আবগারি নীতি আদিবাসীর সাধারণ রকমের পানদোষের অভ্যাসকে পানোন্মত্ততার অভ্যাসে পরিণত হতে বাধ্য করেছে—অতি দুঃখের বিষয় হলেও কথাটা অত্যন্ত সত্য। ইংরাজ সরকারের নতুন ভূমি ব্যবস্থার ধারক ও বাহক হিসাবে যেমন জমিদার ও মহাজন আদিবাসী অঞ্চলে এক নতুন পদ্ধতির অর্থনৈতিক শোষণ সুরু করেছিল, ইংরাজ সরকারের আবগারি নীতি (Excise Policy) অনুসারেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদ্য বিক্রেতার দল (কালার বা কালাল) আদিবাসীর অদৃষ্টাকাশে আর এক কুগ্রহের মত আবির্ভূত হলো। মদের দোকানের গদিতে বসে কালারের দল এক বোতল তরল মূঢ়তার লোভ দেখিয়ে আদিবাসীর সুখ-স্বাস্থ্য, অর্থ ও মস্তিষ্ক কিনে ফেলবার সুযোগ লাভ করলো।

মিঃ ফুলার (Mr. Fuller) মন্তব্য করেছেন: "গন্দদের অবস্থা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রত্যেক রিপোর্টেই স্বীকৃত হয়েছে যে, গন্দদের সর্বনাশের কারণ সুরাপানের আসক্তি। এই সঙ্গে এ ধারণাও করা যেতে পারে যে, গভর্ণমেণ্টের আবগারি নীতি গন্দদের এই অভ্যাসকে প্রতিরোধ করে নি, একথা শোনা গেছে যে, গন্দরা কয়েক পুরুষ আগে এ রকম একটা মাতাল সমাজ ছিল না। বৃটিশ শাসনের সময় থেকেই এই মাতাল হওয়ার অভ্যাস বেড়ে গেছে।" (১)

মিঃ ফুলার সরকারী আবগারি নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্টাস্পষ্টি অভিযোগ আনেন নি শুধু 'শোনা গেছে' বলে অভিযোগটাকে কিছুটা হাল্‌কা করে রেখেছেন।

আদিবাসী অঞ্চলে মদ্য সরবরাহ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের আবগারি বিভাগ দুইটি প্রথার মধ্যে কোন একটি প্রথা অবলম্বন করে থাকেন—(১) আরক বা স্পিরিট সরবরাহের প্রথা (Central Distillery) অথবা (২) চোলাই প্রথা (Outstill system)। সেণ্ট্রাল ডিস্টিলারি, অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের এক একটি কেন্দ্রীয় আরক তৈরীর ভাটিখানা থাকে, সেখান থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের ভেণ্ডারদের কাছে আরক প্রেরিত হয়। ভেণ্ডার জলের সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণের আরক মিশিয়ে বিভিন্ন নম্বরের (Strength) মদ তৈয়ারী করে এবং বোতলে পূরে বিক্রী করে আউট-স্টিল বা চোলাই প্রথা, হলো মদ্য বিক্রেতাকেই নিজ নিজ ভাটিতে মদ চোলাই করবার লাইসেন্স দেওয়া। গভর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে তাঁর আবগারি নীতির পরিবর্তন করে থাকেন। এই কথাটার অর্থ হলো—হয় আরক সরবরাহ প্রথা উঠিয়ে দিয়ে চোলাই প্রথা, অথবা চোলাই প্রথা উঠিয়ে দিয়ে আরক সরবরাহ প্রথার প্রবর্তন। এই পলিসি পরিবর্তনের মধ্যে বস্তুতঃ কোন নৈতিক পরিবর্তন নেই। কারণ উদ্দেশ্যটা একই থাকে, অর্থাৎ সরকারী আয়। যে প্রথার সাহায্যে যখন আয় হবার আশা থাকে, তখন সেই প্রথা চালু করা হয়। আদিবাসীদের

(1) Review of the Progress of the Central Province. 1916-17

পানাভ্যাস সংযত হোক, আবগারি পলিসির মধ্যে সে রকম কোন সামাজিক আদর্শের বালাই নাই।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জানতেন আদিবাসী সমাজে মদ্যাসক্তি একটা ব্যাপক সামাজিক কুপ্রথা। শাসন ব্যবস্থায় গভর্ণমেণ্ট নাকি আদিবাসীদের সম্পর্কে রক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তাঁদের আবগারি নীতির প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার কোন আদর্শ এর মধ্যে ছিল না। ১৯০৭-৮ সালে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা থেকে মদ সরবরাহের ব্যাপারটা খাস সরকারী পরিচালনায় না রেখে ব্যবসায়ীদের কাছে ঠিকা দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্টের আবগারি নীতি যে ভাবে পরিবর্তিত ও পরিচালিত হয়েছে, তার মধ্যে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, আদিবাসীদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাসকে সংযত বা সীমাবদ্ধ করার কোন চেষ্টা হয়েছে; অথচ মদ্যাসক্তিই আদিবাসীদের আর্থিক দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ।

গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনরকম মদ্যপ্রস্তুত এবং বিক্রয় হতো। (১) মহুয়া ফুল থেকে তৈরী আরক বা স্পিরিট, (২) হাঁড়িয়া বা পচাই অর্থাৎ ভাত থেকে তৈরী মদ, (৩) নম্বরী মদ (liquor)। চোলাই প্রথার (outstill) দ্বারা কোলহানের হো সমাজের ভয়ানক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ১৯৩৪ সালে বিহার ও উড়িষ্যার আইনসভার (Legislative Council) বেসরকারী সদস্যেরা কয়লা-খনি অঞ্চল ও অন্যান্য জেলায় চোলাই প্রথা সম্বন্ধে একটা তদন্তের প্রস্তাব করেন; কিন্তু আইনসভা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। (১)

রাঁচি জেলায় ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চোলাই প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তারপর 'কেন্দ্রীয় ভাটিখানা' প্রথা কায়েম করা হয়। রাঁচীর কোন কোন অংশে প্রাক্তন চোলাই প্রথাও বজায় রাখা হয়। বিক্রী করার জন্যে নয়, নিজেদের প্রয়োজনের জন্য হাঁড়িয়া (Rice-Beer) তৈরীর অধিকার আদিবাসীদের দেওয়া

(1) A Tribe in Transition—D. N. Mojumdar.

হয়েছে। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে, আবগারি বিভাগের উদ্যোগে 'সরকারী মদ' বিক্রয়ের পরিমাণ খুবই বেশী। (১)

১৯০৭ সালে মানভূমে চোলাই প্রথা রহিত ক'রে দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় ভাটিখানা প্রথা প্রবর্তিত হয়। মির্জাপুর জেলার আদিবাসী অঞ্চলে প্রথম দিকে এক একটা এলাকা ভাগ করে নিয়ে ঠিকাদারের হাতে মদ তৈরী ও বিক্রীর ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে ১৮৬৩ সালে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাটিখানা করেও আবগারি আয় খুব আশাজনক হয় নি, কারণ পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্য থেকে গোপনে আমদানী করা মদ ও বে-আইনীভাবে তৈরী করা মদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরকারী মদ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আবগারি বিভাগ আবার ঠিকাদারের হাতে মদ তৈরীর ভার অর্পণ করে। আবার ১৮৯৬ সালে চোলাই প্রথা কায়েম করা হয়। এই ঘন ঘন প্রথা পরিবর্তনের মধ্যে যে নীতি ছিল, তা আর চিন্তা করে বুঝতে হয় না। যখনি যে প্রথায় আবগারি আয়ের ভরসা কমেছে, তখনি সে প্রথা তুলে দিয়ে ভিন্ন প্রথার পরীক্ষা হয়েছে।

আদিবাসী অঞ্চলে গভর্ণমেণ্টের আবগারি নীতিতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখা যায়। যে অঞ্চলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মত হাঁড়িয়া বা পচাই তৈরীর অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং হয়ে থাকে, সেখানেও গভর্ণমেণ্ট তাঁর বোতল-ভরা মার্কা-মারা নম্বরী মদ বিক্রীর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। গঞ্জাম এবং ভিজগাপট্টম এজেন্সীতে গভর্ণমেণ্টই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য লোকে নিজের ঘরেই হাঁড়িয়া বা পচাই তৈরী করতে পারবে। কিন্তু এ সত্ত্বে আবগারি বিভাগ এই অঞ্চলে কখনো 'চোলাই' এবং কখনো কেন্দ্রীয় 'ভাটিখানা' পদ্ধতিতে আদিবাসীদের কাছে সরকারীমার্কা নেশা বিক্রয় করতে থাকেন। কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীকে পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য হাঁড়িয়া তৈরী করতে হ'লে সরকারী লাইসেন্স নিতে হয়।

(1) District Gazetteer of Ranchi (1917):

সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে সময় সময় দু'একটা মন্তব্য করেছেন যে, মদ আদিবাসীদের নানাভাবে ভয়ানক ক্ষতি করছে। কিন্তু এসব মন্তব্য সরকারের আবগারি নীতির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। নীতি পরিবর্তনও করতে পারে নি। বড় বেশী উচ্চবাচ্য হলে আবগারি বিভাগ হয়তো বড় জোর তাঁদের প্রিয় দুটো প্রথার মধ্যে একটার বদলে আর একটা প্রথা চালু করে দিয়েছেন। যেখানে চোলাই প্রথা ছিল, সেখানে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা প্রথা এবং যেখানে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা প্রথা ছিল, সেখানে চোলাই প্রথা। এর বেশী নয়।

আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংস্কার আন্দোলন হয়েছে এবং তারা নিজেরাই সচেষ্ট হয়ে মদ্য বর্জনের জন্য দাবী ও আন্দোলন করেছে। ১৮৭১ সালে খন্দমলের খন্দ সমাজ নিজেরাই গভর্ণমেণ্টকে মদ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। ১৯০৮ সালে উড়িষ্যার খন্দেরা মদ্য বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করে। গন্দ সমাজে যে সংস্কার আন্দোলন হয়েছে, তাতেও দেখা যায় যে তারা মদ্য বর্জনের জন্য চেষ্টা করেছে। ১৯০৭-১২ সালে মান্দলা জেলার আদিবাসীদের মদ্য বর্জন আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করে এবং সফলও হয়। কিন্তু তারপরই আবার যথাপূর্ব মদ্যাসক্ত অবস্থা ফিরে আসে। কেন এ রকম হলো, তার রহস্য গভর্ণমেণ্ট জানেন।

ধর্মগত আচার ও পূজা এবং উৎসবে আদিবাসীদের পক্ষে মদের প্রয়োজন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আদিবাসীদের এই সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে জঙ্গলে জঙ্গলে মদ বিক্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন, গভর্ণমেণ্টকে এতটা নিঃস্বার্থ সংস্কৃতি-সচেতন মনে করা যায় না। মদ্যপানের অভ্যাস প্রসার লাভ করুক—বস্তুতঃ আবগারি বিভাগের উদ্যোগ এই লক্ষ্যে চালিত হয়েছে। আদিবাসীকে হাঁড়িয়া তৈরীর অবাধ অধিকার দেওয়া কোন উদারনীতির প্রমাণ নয়। আদিবাসীকে বিনা খাজনায় জমি বন্দোবস্ত করে দেবার মতই এটা একরকম কূটনৈতিক উদারতা। জমিতে চাষের কাজে একবার অভ্যস্ত করিয়ে নিয়ে তারপর উঁচুদরে

খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ভালমতই হতো। এক্ষেত্রেও হাঁড়িয়া খাইয়ে আদিবাসী-দের নেশা একবার ভালমতই পাকিয়ে দিতে পারলে, তারপর কড়া সরকারী মদের জোগান দিয়ে চাহিদা মেটানো সহজ হবে, এই বেনিয়াবুদ্ধির দ্বারাই গভর্ণমেণ্টের আবগারি নীতি গঠিত। ভীল অঞ্চলে মাঝে মাঝে গভর্ণমেণ্ট সাধারণ রাজস্বের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আবগারি আয় বাড়াবার উদ্যোগ করেছেন এবং আবগারি আয় বৃদ্ধির অর্থ মদ বিক্রীর বৃদ্ধি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গন্দ সমাজ সুরা-বর্জন আন্দোলন আর করে। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রবলভাবে চল থাকে। কিন্তু ইংরাজ সমালোচক এই আন্দোলনকে কি চক্ষে দেখছেন ত পরিচয় দেওয়া হলো।

"আদিবাসীদের পক্ষে এই সব সংস্কারের (মদ্য বর্জনের) যে প্রচেষ্টা চলছে তার মূলে কি আছে? মদ জিনিসটা খারাপ, অথবা মদ খেলে স্বাস্থ্যহানি হয়, মদ ছেড়ে দিলে লোকের স্বাস্থ্য ভাল হবে—এসব ধারণা এই প্রচেষ্টার পেছনে নেই। মদ বর্জন করলে উঁচু জাত হয়ে সম্মান পাওয়া যাবে, এই রকম একটা ধারণাই এর পেছনে রয়েছে।" (১)

সমালোচক মিঃ উইলসের মনস্তত্ত্ব সত্যই অদ্ভুত। উঁচু জাত হবার জন্যে অথবা লোক-সম্মানিত সমাজে উন্নীত হবার জন্য যদি কেউ মদ্য বর্জন করে, তবে তাকে নিন্দা করার কি থাকতে পারে?

বিখ্যাত আদিবাসী ও হরিজন সেবক শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর লিখেছেন—"সাধারণতঃ সরকারী অফিসারের দল, বিশেষ করে আই-সি-এস অফিসার এবং নৃতাত্ত্বিকেরা (Anthropologists) আদিবাসী সমাজে মদ্য বর্জন ব্যবস্থা (Prohibition) পছন্দ করেন না। গভর্ণমেণ্টের আদিবাসী নীতির ক্রিয়াকলাপ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, গভর্ণমেণ্ট আদিবাসী সমাজে সুরাপানের ব্যাপকতাই কামনা করেছেন

(1) Aboriginal Problem in the Balaghat District—C. Wills.

এর ফলে আদিবাসী সমাজকে প্রচণ্ড আর্থিক ও নৈতিক দণ্ড দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সব ইংরেজ সমালোচক উইল্‌স এলুয়িন বা গ্রিগসনের মত নয়। মিঃ ডি. সিমিংটন সুস্পষ্টভাবেই মন্তব্য করেছেন—"আমি একথা না বলে পারছি না, যদি মদ্য-বর্জনের ব্যবস্থা কোথাও চালু করার প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে বিশেষ করে ভীল ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের সম্পর্কেই সে ব্যবস্থা চালু করলে ন্যায়সঙ্গত কাজ হবে।" (২)

(2) Report of the Aboriginal and Hill Tribes (Bombay)—D. Symington.

জঙ্গল আইন ও আদিবাসী

আদিবাসীদের জন্য সরকারী উদ্যোগে ভূমিঘটিত যে সব ব্যবস্থা ও সংস্কার হয়েছিল, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের জীবিকা মাত্র ভূমির ওপর নির্ভর ক'রে ছিল না। ভূমির মতই জঙ্গলও তাদের জীবন ও জীবিকার একটা বড় আশ্রয়। সুতরাং জঙ্গল সম্বন্ধে যে কোন বিধিনিষেধ, আইন বা ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আদিবাসীদের জীবনে দেখা দেবে, এটা স্বাভাবিক সত্য। জঙ্গল সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কি এবং কতখানি উদ্যোগ করেছিলেন, তার ইতিহাস খোঁজ করা যাক্।

সাঁওতাল পরগনার খাস-শাসিত (Directly Administrated) দামনি কো অঞ্চলের বৃহৎ অংশ অরণ্যাবৃত। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পরও দীর্ঘকাল ধরে জঙ্গলের কোন জরিপ ও বন্দোবস্ত হয় নি। চাষ করার পক্ষে উপযোগী পতিত অথবা জংলি জমি সাঁওতাল ও পাহাড়িয়ারা নিজের জমি হিসাবেই উপভোগ করতো। ১৮৭১ সালে গভর্ণমেণ্ট প্রথম দামনি কো অঞ্চলের 'সরকারী জঙ্গলের' সীমা নির্ধারণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কিন্তু সে সময় সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভ চলছিল এবং গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা কার্যতঃ স্থগিত থাকে। ১৮৭১ সালে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পলের আমলে ৩৬ বর্গমাইল জঙ্গল 'সংরক্ষি জঙ্গল' (Reserved Forest) ব'লে প্রথম ঘোষিত হলো। পর বৎসর ডেপুটি কমিশনারের হাতে জঙ্গল পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয় এবং সরকারী দপ্তরে একটা 'জঙ্গল বিভাগ' (Forest Department) কায়েম করা হয়। ১৮৭৯ সালের জরিপ হয়ে যাবার পর জঙ্গলের গাছ সংরক্ষণের নীতি কার্যকরী হতে আরম্ভ করে। জরিপ করা বন্দোবস্ত এলাকাতেও শালগাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়। গভর্ণমেণ্ট নিজের বিবেচনামত এক একটা এলাকাকে 'জঙ্গল এলাকা' বলে ঘোষণা করতে থাকেন। ১৮৯৪ সালে গভর্ণমেণ্ট দামনি কো'র সমস্ত বে-বন্দোবস্ত এলাকাকে 'সংরক্ষিত জঙ্গল' বলে ঘোষণা করেন। ঘোষণার মধ্যে একটা প্রতি-

শ্রুতি ছিল—'সওরিয়া পাহাড়িয়ারা জঙ্গল সম্পর্কে যে সব ব্যক্তিগত বা সামাজিক অধিকার ভোগ করে আসছিল, সে সব অধিকার বজায় রইল।' কিন্তু সরকারী জঙ্গল বিভাগ কার্যক্ষেত্রেই এই নীতি মেনে চলেন নি, সওরিয়া পাহাড়িয়াদের অধিকারে বাধা দিয়ে তাদের বহু দুর্ভোগে পতিত করা হয়। ১৯০৬ সালে ১৫৩ বর্গমাইল জঙ্গলের মধ্যে ১৪৩ বর্গমাইল ডেপুটি কমিশনারের পরিচালনাধীন হয়ে যায়। ১৯১০ সালে সীমানা আরও বাড়িয়ে দিয়ে ২৯২ বর্গমাইল জঙ্গলকে 'সরকারী জঙ্গলে' অর্থাৎ সংরক্ষিত জঙ্গলে পরিণত করা হয়।

সিংভূমের কোল্‌হান অঞ্চলেও এই নীতি অনুসৃত হতে থাকে এবং ৭০০ বর্গ মাইলেরও অধিক জঙ্গলকে 'হো' সমাজের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে খাস সরকারী জঙ্গলে পরিণত করা হয়।

খন্দমাল-অঞ্চলে কোন 'সংরক্ষিত জঙ্গল' ছিল না, সম্প্রতি এ বিষয়ে একটা চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। গঞ্জাম এজেন্সীতে জঙ্গলের কিছু অংশকে 'সংরক্ষিত জঙ্গল' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। খন্দ অঞ্চলে প্রচুর জঙ্গল আছে, কিন্তু শবর অঞ্চলে খুবই কম। কিন্তু তবুও শবর অঞ্চলের জঙ্গলকেই সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। কোরাপুট অঞ্চলে ১৬০০ বর্গমাইলেরও বেশী জঙ্গল 'সংরক্ষিত' ক'রে রাখা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে গভর্ণমেণ্টের জঙ্গল নীতি কতগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হতে থাকে। এই প্রদেশের জঙ্গল শুধু বৃক্ষসম্পদে ধনী নয়, জঙ্গলের মাটীর নীচে বহু খনিজের আধার রয়েছে। তাছাড়া জঙ্গল অঞ্চলেই প্রধান গোচারণভূমিগুলি অবস্থিত; সুতরাং জঙ্গল এলাকাই মধ্যপ্রদেশের ঐশ্বর্যের একটা বড় আশ্রয়। জঙ্গলের বা জঙ্গল এলাকা থেকে সম্পদ আহরণ করতে হ'লে আদিবাসী সমাজের সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন—এই ধারণা থেকেই গভর্ণমেণ্ট তাঁর জঙ্গল-নীতি নির্ধারিত করেন। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে যে 'ঝুম' চাষের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেটা জঙ্গলের পক্ষে ক্ষতিকর। তবুও গভর্ণমেণ্ট কড়াকড়ি ক'রে 'ঝুম' চাষের প্রথা বন্ধ করতে উৎসাহী ছিলেন না। গভর্ণমেণ্টের আশঙ্কা ছিল,

'ঝুম' প্রথা বন্ধ ক'রে দিলে আদিবাসীরা হয়তো এলাকা ছেড়ে স্থানান্তরে চলে যাবে, যাযাবর জীবন গ্রহণ করবে এবং আদিবাসীরা যাযাবর হ'য়ে গেলে 'জঙ্গলের সম্পদ আহরণ করার' মত উপযুক্ত শ্রমিক পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে স্যার রিচার্ড টেম্পলের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"আশা করা যায় যে, পাহাড়ী লোকেরা ক্রমে ক্রমে উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করবে। যদিও তারা অজ্ঞ ও রূঢ় প্রকৃতির মানুষ, তাদের মধ্যে উৎসাহ ও সহিষ্ণুতার শক্তি আছে। তাদের গোষ্ঠী আছে, গোষ্ঠীপতি সর্দার আছে। তাদের মধ্যে সর্বদা একটা লুঠেরা প্রবৃত্তি দেখা যায়। এটাও বহু ঘটনায় দেখা গেছে যে, তারা সশস্ত্রভাবে বাধা দেবার যোগ্যতা রাখে। তাদের কোন অভ্যস্ত লোকাচার বা প্রথাকে বন্ধ ক'রে দেবার ফলে যদি তারা আর্থিক অভাবে পতিত হয়, তবে তারা লুঠ করেই জীবিকা অর্জন করবে, বিশেষ ক'রে গৃহপালিত পশু চুরি করার দিকে ঝুঁকে পড়বে। এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রদেশের সমতল অঞ্চল থেকে গবাদি পশু যে সব বড় বড় গোচারণভূমিতে এসে খাদ্য লাভ করে, সেই সব গোচারণভূমিগুলি এই পাহাড়ী আদিবাসী অঞ্চলেই অবস্থিত। যদি আদিবাসীরা এখানে না থাকে, তবে জঙ্গল এলাকার অবস্থা চরম দুর্দশার স্তরে নেমে যাবে। কারণ জঙ্গল এলাকা থেকে মানুষের বসতি উঠে গেলে ভূমিবন্দোবস্ত ও জঙ্গল কেটে পথ করার ভরসাও লুপ্ত হবে। তাহলে বন্যজন্তু সমাকীর্ণ, ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন, পথশূন্য জঙ্গল অঞ্চলে কোন বন-কর্মচারী বা কাঠুরিয়ার পক্ষে প্রবেশ করার সাধ্য হবে না, বাস করাও সম্ভব হবে না। আর একটা সত্যিকারের আপদ জঙ্গলের বন্যজন্তু। এদের উপদ্রবে ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে। বন্যজন্তুগুলিই যাতে জঙ্গল এলাকার প্রভু হয়ে উঠতে না পারে, তার সম্ভাবনা রোধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাহাড়ী সমাজকে জঙ্গল এলাকায় স্থায়ী বসতি করিয়ে দেওয়া।" (১)

স্যার রিচার্ড টেম্পলের উক্তির মধ্যে গভর্ণমেণ্টের আদিবাসী-নীতি এবং সেই সঙ্গে জঙ্গল-নীতির মূল সূত্রটুকু পাওয়া যায়। পাহাড় ও জঙ্গল এলাকার সম্পদ

(1) Aboriginal Tribes of the Central Provinces—Hislop.

সাফল্যের সঙ্গে আহরণের জন্য আদিবাসীকে দরকার হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে, 'জঙ্গল সংরক্ষণের' (Preservation of Forests) এবং আদিবাসী-সংরক্ষণের (Preservation of Tribes) নীতির একই উদ্দেশ্য—জঙ্গলের সম্পদ আহরণ।

এই নীতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে এই ধারণাই হবে যে, আদিবাসীর উন্নতি দিকে লক্ষ্য রেখে গভর্ণমেণ্টের জঙ্গল-নীতি তৈরী হয় নি। বরং বলা যায়, জঙ্গলের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে আদিবাসী-নীতি তৈরী করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হ'ল, জঙ্গল এলাকার সম্পদ আহরণ। এই উদ্দেশ্যের জন্য আদিবাসীকে কতখানি কাজে লাগান যায়, গভর্ণমেণ্ট সর্বদা সেদিক থেকেই চিন্তা করেছেন। গভর্ণমেণ্টের জমি-নীতিরও যে পরিচয় ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যেও এই একই উদ্দেশ্যের গূঢ় লীলা দেখতে পাওয়া যায়। আদিবাসী অঞ্চলে জমির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট অনেক উদার রেগুলেশন, জরিপ-বন্দোবস্ত ও বিশেষ আইন করেছেন। আদিবাসীর জমিকে শস্যপ্রসূ করার নীতি এর মধ্যে ছিল না, সেটা পরোক্ষভাবে হয়তো হয়েছে। মুখ্য নীতি ছিল জমিকে খাজনাপ্রসূ করা। এই উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্ট জমির আবাদ বৃদ্ধি করাবার জন্য প্রথম প্রথম বিনা খাজনায় আদিবাসীর হাতে জমি তুলে দিয়েছেন। কৃষিবিমুখ আদিবাসী একবার আবাদে অভ্যস্ত ও দীক্ষিত হওয়ামাত্র অল্প দিনের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট নতুন জরিপ ও বন্দোবস্ত করে খাজনা-প্রথা চালু করে দিয়েছেন।

বহির্ভূত অঞ্চলের ইতিহাস

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন (অর্থাৎ Indian Statutory Commission) ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা তদন্ত ক'রে নতুন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারতে আসেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নিজ নিজ প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস, পূর্ব-প্রচলিত শাসন-সংস্কারের পরিণাম ও কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সম্বন্ধে কমিশনের নিকট মেমোরাণ্ডাম বা স্মারকলিপি দাখিল করেন। আশ্চর্যের বিষয়, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের মেমোরাণ্ডামে আদিবাসীদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। এই তিন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বিবরণ পড়ে মনে হবে যে, তাঁদের প্রদেশে আদিবাসী সমস্যা বলে কোন ব্যাপারই নেই। অথচ ঐসব প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় আদিবাসী তো আছেই, তাছাড়া কতগুলি তপশীলভুক্ত অঞ্চলও ছিল। বাঙলা ও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের মেমোরাণ্ডামে আদিবাসীদের সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করা হয়। একমাত্র বিহার গভর্ণমেণ্টের মেমোরাণ্ডামে আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিবরণ দেওয়া ও আলোচনা করা হয়। বিহার গভর্ণমেণ্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আদিবাসীদের জন্য বিশেষ রক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। কিন্তু রক্ষামূলক ব্যবস্থার সীমা এবং প্রসার কতটা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মন্ত্রীসভার সঙ্গে গভর্ণর একমত হন নি। সাইমন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অনগ্রসর অঞ্চল (Backward Tract) কথাটা বদলে দিয়ে 'বহির্ভূত অঞ্চল' (Excluded Area) আখ্যা দেওয়া হয়।

কমিশন আদিবাসীদের সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য, প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেগুলি বলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী নীতির একেবারে নিরাবরণ আত্মপ্রকাশ।

কমিশনের সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যায়: অনগ্রসর অঞ্চলগুলির মধ্যে দু'-একটা অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকী সবগুলিকেই সাধারণ শাসনতন্ত্রের বাইরে রাখা উচিত। অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসীরা যোগ্যতার ক্ষেত্রে যে স্তরে

পৌঁছতে পেরেছে, তাতে তারা সাধারণ শাসনতন্ত্রের মধ্যে থাকবার যোগ্য নয় বলেই কমিশন মনে করেন। আদিবাসীকে তার পূর্বপুরুষের অনুসৃত পদ্ধতিতে জীবনযাপন করবার (traditional methods of livelihood) স্বাধীনতা দিতে হবে এবং জমির স্বত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে হবে।

কমিশন আরও বলেন: "দ্রুত রাজনৈতিক উন্নতির ওপর আদিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে না। অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সাহায্যে দরদের সঙ্গে তাদের ওপর নজর দিলেই তারা সুখী হতে পারবে। আদিবাসীকে সুখী করবার আর একটা উপায় হলো তাকে তার প্রতিবেশীর কাছে অর্থনৈতিক অধীনতা থেকে রক্ষা করা।"

কমিশন সুপারিশ করেন—সম্পূর্ণভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি (Wholly Excluded Areas) সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের অধীনে তাঁর এজেন্টদের (অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্ণরদের) মারফৎ শাসিত হবে। কিন্তু আংশিকভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি (Partially Excluded Areas) প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করবে এবং প্রাদেশিক গভর্ণর সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট হিসাবে 'মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করবেন। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল থেকে লব্ধ সমস্ত রাজস্ব ঐ অঞ্চলে ব্যয় করা হবে, উপরন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকেও অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হবে।

দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ বহির্ভূত ও আংশিক বহির্ভূত—এই দুই অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক নীতির মধ্যে পার্থক্য খুবই সঙ্কীর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই চরম ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের এজেন্ট গভরর্ণরদের হাতে। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে গভর্ণর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করবার সৌজন্যটুকু মাত্র দেখাবেন, পরামর্শ গ্রহণ করা বা না-করা তাঁরই ইচ্ছা ও অধিকার।

কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে অভিসন্ধিপূর্ণ বলে যা মনে হয়, সেটা হ'ল আদিবাসীকে সস্নেহে পূর্বপুরুষের অনুসৃত জীবনযাত্রার প্রাচীন পদ্ধতির কোলে

বসিয়ে চির-শিশু ক'রে রাখবার সঙ্কল্প। এই পলিসিকেই সাম্রাজ্যবাদী পলিসির চরম বলে মনে করবার কারণ আছে, প্রসঙ্গক্রমে তারই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বৃটিশ শাসনের প্রথম অধ্যায়েও এই নীতি ছিল, কিন্তু কমিশনের মন্তব্য থেকে মনে হয়, সেই নীতিকে আরও ভাল ক'রে সফল করবার জন্যেই ১৯২৯ সালে আর একটা নতুন উদ্যোগের সঙ্কল্প করা হয়। কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হ'ল প্রতিবেশী হিন্দুর সংস্পর্শ। হিন্দুরাই আদিবাসীকে অর্থনৈতিক পরাধীনতায় চেপে রেখেছে, হিন্দুর দ্বারাই আদিবাসীর ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে ইত্যাদি। সুতরাং ব্রিটিশের কূটনৈতিক অভিপ্রায়টি অতি সহজেই ধরা পড়ে যায়, আদিবাসী অঞ্চলকে 'বহির্ভূত' করার উদ্দেশ্য বস্তুতঃ হিন্দু সমাজের প্রভাব থেকে বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য। কমিশন নিজেই নির্লজ্জভাবে বলেছেন যে, রাজনৈতিক উন্নতির ওপর আদিবাসীদের সুখ-সন্তোষ নির্ভর করে না। সুতরাং বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য বস্তুতঃ রাজনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্র থেকেই বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি হ'তে পারে? কমিশনের মানসিক রহস্য বিশ্লেষণ ক'রে এই তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে যে, হিন্দু প্রভাব থেকে বহির্ভূত করা আর রাজনৈতিক উন্নতি থেকে বহির্ভূত করা একই কথা এবং বলা বাহুল্য, এটাই বিশেষভাবে সত্য।

কমিশনের রিপোর্ট ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল হওয়ার পরে নতুন ভারত গভর্ণমেণ্ট বিল আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। এই বিলের ৯১নং ধারার সঙ্গে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা দেওয়া হয়। তালিকাটি এই—

(ক) সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল—(১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (সদিয়া, বলিপাড়া ও লখিমপুর) অঞ্চল; (২) নাগা পাহাড় জিলা; (৩) লুসাই পাহাড়; (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম।

(খ) আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল—(১) উত্তর কাছাড় পাহাড়; (২) গারো পাহাড় জিলা; (৩) মিকির পাহাড় (নওগাঁ এবং শিবসাগর জিলায় অবস্থিত অংশ); (৪) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ (শিলং ক্যাণ্টনমেণ্ট ও মিউনিসি-

্যালিটি এলাকা বাদে); (৫) অঙ্গুল জিলা; (৬) ছোটনাগপুর বিভাগ; (৭) ম্বলপুর জিলা; (৮) সাঁওতাল পরগণা জিলা; (৯) দার্জিলিং জিলা; (১০) লাক্ষা ীপপুঞ্জ (মিনিকয় সমেত); (১১) গঞ্জাম, ভিজগাপট্টম ও গোদাবরী এজেন্সী।

উল্লিখিত তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পূর্ব-প্রচলিত 'অনগ্রসর মঞ্চলের' তালিকা থেকে কয়েকটা অঞ্চলের নাম বাদ দিয়ে এই নতুন বহির্ভূত মঞ্চলের তালিকা করা হয়েছে। স্পিতি ও লাহৌলের নাম এই তালিকায় নেই, ই দুই অঞ্চলকে সাধারণ শাসিত অঞ্চলের মধ্যে বদলি ক'রে দেওয়া হয়েছে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট বিলের সঙ্গে সংযুক্ত বহির্ভূত অঞ্চলের এই তালিকা সম্পর্কে মন্স সভার কমিটিতে যে আলোচনা হয়, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জি. এস. ্র্যের গ্রন্থ থেকে উধৃত করা হলো। (১) বক্তাদের অভিমতগুলি বস্তুতঃ বহু াম্রাজ্যবাদী রহস্যের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে।

কর্ণেল ওয়েজউডের অভিমত :—কোন কোন হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতে মাদিবাসীদের সংখ্যা ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট বিলে যে বহির্ভূত মঞ্চলের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ০ লক্ষ। এই ব্যবস্থা ভাল নয়। আরও বেশী সংখ্যায় আদিবাসীকে রক্ষিত াসনব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। শিক্ষিত ভারতীয়েরা চাইছে যে, আদিবাসী-দের ওপর শাসনব্যবস্থা ভারতীয়ের দ্বারাই পরিচালিত হোক্। আদিবাসীকে স্তায় মজুর করার জন্যই শিক্ষিত ভারতীয়েরা এই মতলব করেছে। অনগ্রসর মাদিবাসীর উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে ভরসার আশ্রয় হলো খৃষ্টান মিশনারী সমাজ। আদিবাসীদের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে, তাকে রক্ষা করা এবং উন্নত করাই াদের একমাত্র কাম্য, সেই সব নৃতত্ত্ববিদ এবং আর যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়ে ইংরাজ অফিসার ও খৃষ্টান মিশনারী?) আরও বিশ-ত্রিশ বছর আদিবাসীদের ওপর শাসন চালাতে হবে। যে সভ্যতার আক্রমণে আদিবাসীরা ধ্বংস হতে চলেছে, সেই সভ্যতার (হিন্দু?) আক্রমণ থেকে তাদের বাঁচাতে হবে। প্রাদেশিক

(1) The Aborigines and their Future—G. S. Ghurye.

গভর্ণরদের দিয়েও বহির্ভূত অঞ্চল শাসন করানো উচিত নয়, কারণ তার ফলে প্রাদেশিক প্রভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি ভারতের সাধারণ অঞ্চলগুলির মতন অবস্থায় এসে পড়বে। আমি চাই, অনগ্রসর আদিবাসীকে খাস ব্রিটিশ পরিচালনায় রাখার ব্যবস্থা করা হোক্।

ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর:—গভর্ণমেণ্ট জানেন যে, ভারতের সভ্য সম্প্রদায়ের জন্য রচিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধানগুলি অনগ্রসর আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দিলে বিপদ আছে।

কমিশনের সদস্য মিঃ এডওয়ার্ড ক্যাডোগান (Mr. Edward Cadogan) বহির্ভূত অঞ্চলের একটি সংশোধিত তালিকা উত্থাপিত করেন। এই তালিকাটি বৃহৎ। মিঃ ক্যাডোগান তালিকা নির্দিষ্ট অনেকগুলি আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। তাছাড়া প্রদেশের সাধারণ শাসিত অঞ্চল থেকে কতগুলি নতুন অংশকেও সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকাভুক্ত করেন। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের যে সংশোধিত তালিকা মিঃ ক্যাডোগান প্রস্তুত করেন, সেটা সবই সাধারণ অঞ্চলের অংশ নিয়ে তৈরী এবং সংখ্যায় অনেক মিঃ ক্যাডোগান যে সব অঞ্চলকে আংশিক বহির্ভূত বলে তালিকাভুক্ত করতে চাইলেন, সেগুলি পূর্বে কোনকালে অনগ্রসর অঞ্চল বলে অথবা তপশীলভুক্ত অঞ্চল বলে ঘোষিত হয় নি। মেজর এ্যাটলি (ইনিও কমিশনের সদস্য ছিলেন) এই বৃহৎ সংশোধিত তালিকা সমর্থন করেন:

"যদি আমাদের কোন ভুল করতে হয়, তবে যত বেশী সম্ভব অঞ্চলকে তালিকাভুক্ত করেই সে ভুল হোক, কিন্তু তালিকা থেকে অঞ্চলের নাম বাদ দিয়ে বা কমিয়ে দিয়ে যেন সে ভুল না করি।"

উইং কম্যাণ্ডার জেম্‌স সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বলেন—"ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের থেকে আদিবাসীরা বিশিষ্টভাবে ভিন্ন একটি জাতি। যত বেশী সংখ্যায় আদিবাসীকে বহির্ভূত অঞ্চলের গণ্ডির মধ্যে আনতে পারা যায়,

তই ভাল। এই সব অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে হয় ইউরোপীয়ানদের দ্বারাই শাসন রাতে হবে, অথবা ইউরোপীয়ানদের পরিচালনাধীনে ভারতীয়ের দ্বারা।"

এইবার আর একদল বিশেষজ্ঞের অভিমত বিবৃত করা যাক্, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী য়ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান না হারিয়ে ঐতিহাসিক সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই মন্তব্য শ করেন।

স্যার রেজিনাল্ড ক্রাডক (Sir Reginald Craddock)—"সম্বলপুরের মত াট একটা জিলাকে বহির্ভূত অঞ্চলে যুক্ত করার কোন অর্থ হয় না।"

লর্ড পার্সি (Lord Percy):—এই সব অনগ্রসর অঞ্চল বা বহির্ভূত অঞ্চলগুলি স্তুতঃ এক-একটা উপেক্ষিত উদ্যানের মত। যে সব অঞ্চলগুলিতে ১৯১৯ সালের সন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে, সেই অঞ্চলের কোন অংশকে বহির্ভূত অঞ্চলে যুক্ত রা উচিত নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, এমন কতগুলি অঞ্চলকে 'আংশিক হির্ভূত' অঞ্চলে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে শতকরা পঁচিশ থেকে ারম্ভ ক'রে শতকরা ষাট পর্যন্ত সাধারণ অধিবাসী রয়েছে, যারা আদিবাসী নয়। মস্যাটা খুবই কঠিন, আপনাদের পরিষ্কারভাবে নীতি ঠিক ক'রে নিতে হবে। াদিবাসী সমাজকে পুরাতন কাসুন্দির (Cold Storage) মত পরিবর্তনহীন ক'রে খা, অথবা চারিদিকের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সমন্বিত (Assimilation) হবার ন্য পথ দেখিয়ে দেওয়া—এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্‌টা কতখানি আপনারা রতে চান?"

মিঃ বাটলার (Mr. Butler, Under Secretary of State for India):—

'যদি এই সময়ে আমরা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার নীতি (Ring Fence olicy) গ্রহণ করি এবং বেশী ক'রে নতুন নতুন অঞ্চলকে 'বহির্ভূত অঞ্চলে' রিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে ফল ভাল হবে না। ভবিষ্যৎ ভারতের সাধারণ ষ্ট্রতন্ত্রে আদিবাসীদের পক্ষে অন্য সকলের সঙ্গে সমভাবে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা র সরে যাবে। আদিবাসীকে ব্যাপকভাবে সরিয়ে রাখার (Segregation) াতি আদিবাসীর পক্ষে ক্ষতিকর হবে।"

আর্ল উইণ্টারটন (Earl Winterton)—

"বিচ্ছিন্নতার (Isolation) চেয়ে সংমিশ্রণের (Assimilation) নী... আমি বেশী বিশ্বাসী। আমার মনে হয়, আপনারা এইটা চাইবেন না যে আদিবাসী অঞ্চলগুলি এক-একটা আধুনিক হুইপস্নেড (Whipsnade) হয়ে উঠুক যেখানে গিয়ে আপনারা মনের সুখে বলবেন—এই যে এখানে কেমন বিচিত্র একটা নরগোষ্ঠী রয়েছে, যারা ভারতবর্ষের অন্যান্য সমাজ থেকে হাজার বছরের ব্যবধানে পৃথক। আমি মনে করি, তালিকাভুক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়া আর নতুন কোন অঞ্চল 'বহির্ভূত' করা উচিত হবে না।"

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত দ্বারাই প্রভাবিত হলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট বিলের তালিকাটি প্রত্যাহৃত হয় এবং প্রস্তাব করা হয় যে পার্লামেণ্টের কাছে যে সব তথ্য উপস্থিত করা হবে, তার ওপর ভিত্তি ক'রে নতুন ভাবে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট নতুন ক'রে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা তৈরীর করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে পেশ করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য যে তালিকা প্রস্তুত করেন, সেটা এই দাঁড়ায়—

(ক) সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল :—(১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল; (২) নাগা পাহাড় জিলা; (৩) লুসাই পাহাড় জিলা; (৪) উত্তর কাছাড় পাহাড়; (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম; (৬) স্পিতি ও লাহৌল (কাশ্মীর); (৭) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (মিনিকয় সমেত) ও আমিনদিভি দ্বীপ; (৮) হাজারা জিলার উচ্চ (upper) টানাওয়াল।

(খ) আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল :—(১) গারো পাহাড় জিলা; (২) মিকির পাহাড়; (৩) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ (শিলং মিউনিসিপ্যালিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা বাদে); (৪) দার্জিলিং জিলা; (৫) ময়মনসিংহের শেরপুর ও সুসঙ্গ পরগণা; (৬) দেরাদুন জিলার জৌনসার বাওয়ার পরগণা (৭) মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত কাইমুর গিরিমালার দক্ষিণ অংশ

ছোটনাগপুর বিভাগ ; (৯) সাঁওতাল পরগণা জিলা ; (১০) অঙুল
জলা ; (১১) সম্বলপুর জিলা ; (১২) গঞ্জাম-ভিজাগাপট্টম ও গোদাবরী
(১৩) রায়পুর জিলায় অবস্থিত ঘাড়িয়ার জমিদারী সার্ভিস ; (১৪)
লাসপুর জিলায় অবস্থিত পদমপুর ও সাতগড় অঞ্চল ; (১৫) চন্দা জিলায় আহিরি
মিদারী ও গড়চিরোলি তহশীল ; (১৬) চিন্দোয়ারা জাগীরদারী ; (১৭) মান্দলা
লা ; (১৮) দ্রুগ জিলার আউন্ধি, কোরাচা, পানা, বারাস এবং অম্বাগড় চৌকি
মিদারী ; (১৯) বলাঘাট জিলার বৈহার তহশীল ; (২০) অমরাবতী জিলার
লাঘাট ; (২১) বেতুল জিলার ভঁইসডেহি তহশীল ; (২২) নবাবপুর পেঠা,
লোডা, নন্দুরবার ও শাহাদা তালুক—পশ্চিম খান্দেশের আকরানি মহল ও
ওয়াসি অঞ্চল ; (২৩) পূর্ব-খান্দেশের সাতপুরা পাহাড়ের সংরক্ষিত জঙ্গল
ঞ্চল ; (২৪) নাসিক জিলার পেইণ্টমহাল ও কল্যাণ তালুক ; (২৪) থানা
লার মোখাড়া ও উম্বেরগাঁও পেঠা এবং ডাহানু ও শাপুর তালুক ; (২৬) পাঁচ
হল জিলার দোহাদ তালুক ও ঝালোড় মহাল।

এই তালিকা চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয় (Government of India Order,
36)। সম্পূর্ণ ও আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের জনসংখ্যা হয় দেড় কোটি।

দেখা যাচ্ছে যে, সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকায় বিরুদ্ধবাদী মিঃ ক্যাডো-
নের তালিকার সাথে শুধু দু'টি নতুন নাম যুক্ত করা হয়েছে (স্পিতি ও লাহৌল)।
র দু'টি নতুন নাম, উত্তর কাছাড় পাহাড় ও লাক্ষাদ্বীপ ভারত গভর্ণমেণ্ট বিলের
ধ্যই আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল হিসাবে উল্লিখিত ছিল, নতুন তালিকায় এই দু'টি
ঞ্চলকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল করা হয়েছে।

কিন্তু আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের যে নতুন তালিকা দেখা যাচ্ছে তাতে ভারত
ভর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ মিঃ ক্যাডোগানের সাধ অনেকখানি পূর্ণ করেছেন। বোম্বাই
াদেশিক গভর্ণমেণ্টের আপত্তি সত্ত্বেও কতগুলি নতুন অঞ্চলকে আংশিক
হির্ভূত অঞ্চলে যুক্ত করা হ'ল।

ব্যাপার দেখে আমরা একটা সিদ্ধান্ত করতে পারি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনে ক্রিয়া ও কীর্তি ১৯৩৬ সালে এসেও দেখা গেল যে, বিশেষভাবে রক্ষা করার জ যে সব অঞ্চল ভিন্ন করা হলো, তার প্রায় সবগুলিই ১৮৭৪ সাল থেকে বিশেষভা রক্ষিত হয়ে এসেছে। ১৮৭৪ সাল থেকে ১৯৩৬—এই ৬২ বৎসর ধরে অঞ্চ গুলিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এমন বিশেষ পদ্ধতিতে রক্ষা করে এসেছেন যার জ বিশেষ রক্ষার প্রয়োজনটা থেকেই যাচ্ছে। গভর্ণমেণ্টের বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? ৬২ বৎসর ধরে বিশে রক্ষা দিয়ে শাসন করা সত্ত্বেও আদিবাসীদের কোন উন্নতি হয় নি, এবং তাদে সাধারণ শাসন ব্যবস্থায় ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। ১৯৩৬ সালের বহির্ভূ অঞ্চলের তালিকাটি বস্তুতঃ বৃটিশ শাসনের এই ব্যর্থতারই স্বীকৃতি।

এই অর্ডার (Order in Council) নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির সীমা ও শাসন সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনের ৯১ ও ৯২ ধারায় প্রধান বিধানগুলি দেওয়া হয়েছে।

৯১ ধারা অনুসারে—কোন সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলকে বা তার অংশকে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করতে পারেন। কিংবা কোন আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বা তার অংশকে সাধারণ শাসিত অঞ্চলরূপে ব্রিটিশ গভর্ণ মেণ্ট ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু কোন নতুন অঞ্চলকে ভবিষ্যতে আর সম্পূ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে পারা যাবে না।

৯২ ধারা অনুসারে—প্রাদেশিক গভর্ণর যদি নির্দেশ না দেন, তবে ফেডারা বা প্রাদেশিক আইন সভায় গৃহীত কোন আইন (Act) সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না। গভর্ণর ইচ্ছে করলে কো আইনকে বহির্ভূত অঞ্চলে প্রয়োগ করতে পারেন এবং এবং ইচ্ছে করলে সে আইনকে তাঁর বিবেচনাসম্মত রদবদল ক'রে নিতে পারেন। গভর্ণর নিজেও বহির্ভূ অঞ্চলের শাসনের জন্য রেগুলেশন তৈরী ক'রে নিতে পারেন। এই সব রেগুলেশ গভর্ণর-জেনারেলের দ্বারা সমর্থন করিয়ে নিতে হবে এবং সমর্থিত হবার পর আই (Law) পরিণত হবে।

৮০ ধারা অনুসারে—সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর আইন সভার ভোটসাপেক্ষ সম্মতির ওপর নির্ভর করে না। এটা ভোট-নিরপেক্ষ (Non-votable), গভর্ণরের সমর্থন থাকলেই হ'ল। কিন্তু আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুরের জন্য আইন সভায় ভোটসাপেক্ষ সম্মতির জন্য পেশ-করার নিয়ম আছে। কিন্তু আইনসভার ভোট যদি বিরুদ্ধে যায়, তবে নিজ সম্মতি দিয়ে মঞ্জুর করবার ক্ষমতা গভর্ণরকে দেওয়া হয়েছে।

৫২ ধারা অনুসারে—আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করা ও সুশাসন বজায় রাখা গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব।

৮৪ ধারা অনুসারে—সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থাঘটিত কোন বিষয়ে (আইন সভায়) প্রশ্ন উত্থাপন বা আলোচনা করতে হলে গভর্ণরের অনুমতি প্রয়োজন। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন বা আলোচনা করতে হলে গভর্ণরের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

কতগুলি অঞ্চলকে বহির্ভূত ক'রে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এই অঞ্চলগুলি সাধারণ শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার মত রাজনৈতিক যোগ্যতা লাভ করে নি। কিন্তু যাদের রাজনৈতিক যোগ্যতাকে এইভাবে সোজাসুজি অস্বীকার করা হ'ল, দেখা যাচ্ছে যে প্রাদেশিক আইন সভায় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের আসন দেওয়া হ'ল। এক্ষেত্রে ঘোষিত নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুক্তিগত সামঞ্জস্য নেই।

বহির্ভূত অঞ্চলগুলিকে আইনসভায় যে ভাবে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে :—

(১) আসাম—অনগ্রসর পাহাড়ী অঞ্চল নির্বাচনকেন্দ্রসমূহ, ৫টি আসন। অনগ্রসর সমতলবাসী আদিবাসী নির্বাচন কেন্দ্র, ৪টি আসন। আসনগুলি আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত (Reserved) আসন।

(২) বাঙলা—জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জিলার জন্য ১টি অসংরক্ষিত (Non-reserved) আসন।

(৩) যুক্তপ্রদেশ—দক্ষিণ মির্জাপুরের জন্য ১টি অংসরক্ষিত আসন, দেরাদুন জিলার জন্য ১টি অংসরক্ষিত আসন।

(৪) বিহার—ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় ৭টি সংরক্ষিত আসন (হরিজনদের জন্যও এই অঞ্চলে ৩টি আসন সংরক্ষিত আছে)।

(৫) উড়িষ্যা—মোট ৫টি সংরক্ষিত আসন। এর মধ্যে ৪টি আসনে সরকার কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হয়ে থাকে।

(৬) মাদ্রাজ—১টি সংরক্ষিত আসন।

(৭) মধ্যপ্রদেশ—১টি সংরক্ষিত আসন।

(৮) বোম্বাই—১টি সংরক্ষিত আসন।

মাত্র দেড় কোটি আদিবাসী সম্পূর্ণ বহির্ভূত এবং আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে বাস করে। বাকী ১ কোটি সাধারণ অঞ্চলেই থাকে। কিন্তু সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর সম্পর্কে গভর্ণরকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। "গভর্ণর যদি মনে করেন যে সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের আধিবাসীদের প্রতি অথবা প্রদেশের অন্যান্য অংশের আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকদের প্রতি ('to primitive sections of the population elsewhere') কর্তব্য পালনে তাঁর কোন সুবিধা হবে তবে তিনি একজন অফিসার নিয়োগ করে তার মারফৎ আদিবাসীদের উন্নতির জন্য বিহিত ব্যবস্থা করাবেন এবং তাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।"

গভর্ণরের এই প্রভূত বিশেষ ক্ষমতার বহর দেখে মনে প্রশ্ন ওঠে, যখন প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর ওপর এতটা বিশেষ ক্ষমতা গভর্ণরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন কতগুলি আদিবাসী অঞ্চলকে বহির্ভূত করার কি এমন প্রয়োজন ছিল। বহির্ভূত না ক'রেও তো গভর্ণর বিশেষ ক্ষমতার বলে আদিবাসী সমাজকে সস্নেহে শাসন করতে পারতেন। এত সতর্কতার মূল রহস্য হ'ল আদিবাসীকে ব্রিটিশ গভর্ণর কখনো একলা ছেড়ে দিতে পারবেন না; যদি হিন্দু তাদের বাগিয়ে ফেলে অথবা হিন্দুর প্রভাবে তারা বাগিত হয়ে যায়। আদিবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ রক্ষাব্যবস্থার সমস্ত নীতিটারই রহস্য এখানে স্পষ্ট হ

ঠে—আদিবাসীকে তার স্বদেশবাসী উন্নততর হিন্দুসমাজের প্রভাব থেকে রাখাই এই সকল তথাকথিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতি ও দ্দেশ্য।

আদিবাসীদের প্রতি গভর্ণমেণ্টের রক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান সোপান 'ল বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি ক'রে খাস গভর্ণরী বিবেচনা অনুযায়ী শাসন করা। ই ব্যবস্থা করবার সময় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটা দিক ভেবে দেখেন নি, অথবা করেই উপেক্ষা ক'রে গেছেন। এই সব বহির্ভূত অঞ্চলে হাজার হাজার সব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অধিবাসী রয়েছে যারা আদিবাসী নয়, যারা ভারতের াধারণ জাতি, সাধারণতঃ হিন্দু। আদিবাসীরা সম-অঞ্চলবাসী এই অ-আদিবাসী-সঙ্গে নানা সম্পর্কের সূত্রে যুক্ত এবং তারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। ভর্ণমেণ্ট বহির্ভূত অঞ্চলে বিশেষ রক্ষামূলক শাসন চালাবার সময় স্থানীয় অ-াদিবাসীর কথাটা আদৌ ভেবে দেখেন নি।

সম্পূর্ণ বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে অ-আদিবাসীর (Non-Aboriginal) র্থাৎ সাধারণ জাতির সংখ্যা কিরূপ তার কতগুলি হিসাব দেওয়া যাক্ :

অঞ্চল		সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে আদিবাসীরা শতকরা কত সংখ্যক ?
সাঁওতাল পরগণা	...	৪৫
সিংভূম	...	৭৬
মানভূম	...	৩২
পালামৌ	...	৪৯
রাঁচি	...	৮০
হাজারিবাগ	...	৩৪
সম্বলপুর	...	৩২
অঙ্গুল	...	১৮
দক্ষিণ মির্জাপুর	...	, ৬২

বিলাসপুর জমিদারী	...	৩৭
বৈহার তহশীল	...	৫৫.৮
মান্দলা তহশীল	...	৫১.২
চিন্দোয়ারা জমিদারী	...	৬৬.২
নন্দুরবার (পশ্চিম খান্দেশ)	...	৩০.২
শাহদা (,,)	...	৩১.৭
গড়চিরোলি তহশীল	...	৩৬.২
কল্যাণ তালুক	...	৪৮.৮
সাহাপুর (থানা জিলা)	...	২৭.৯
ডাহান্নু (,,)	...	৪৭.৯
উম্বেরগাঁও পেটা	...	৬৩.৭
মোখড়া পেটা	...	৮৩.৬
পেইণ্ট পেটা (নাসিক)	...	৯৮*

ওপরের হিসেব থেকে ধারণা হয় যে, এমন অনেক বহির্ভূত অঞ্চল আছে যেখানে সাধারণ (অ-আদিবাসী) জাতিরাই আদিবাসীদের চেয়ে সংখ্যাধিক। অন্যান্য কতগুলি বহির্ভূত অঞ্চলে সাধারণ জাতির লোকেরা সংখ্যায় আদিবাসীদের চেয়ে কম হলেও, নেহাৎ নগণ্য সংখ্যক নয়। বাকী যে যে অঞ্চলে আদিবাসী খুবই সংখ্যাধিক (শতকরা ৮০।৯০), সে অঞ্চল সম্বন্ধে অবশ্য আলোচ্য সমস্যার কথা ওঠে না।

আদিবাসী অধ্যুষিত এইসব বহির্ভূত অঞ্চলে প্রাদেশিক ভারতের সাধারণ জাতির লোকেরা (হিন্দু) শুধু শোষক হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং তারা সকলেই শোষক হিসাবে আজও রয়েছে, একথা সত্য নয়। অনেকক্ষেত্রে আদিবাসীরাই অ-আদিবাসীকে ডেকে এনে তাদের অঞ্চলে স্থান দিয়েছে। নাগপুরের মুণ্ডা সর্দারেরা ১৭ শতকের শেষ দিক থেকে আরম্ভ ক'রে পরবর্তী

* The Aborigines and their Future—G. S. Ghurye.

কালে বহু হিন্দু পরিবারকে আহ্বান ক'রে এনে নিজ অঞ্চলে বসতি করিয়েছে। (১) মান্দলা জিলাতেও বর্তমানে যে সব হিন্দু জমিদার রয়েছে তারা ১৭ শতাব্দীতে স্থানীয় আদিবাসী সর্দারদের কাছ থেকেই জমি লাভ করেছিলেন। মাদ্রাজের খন্দ অঞ্চলে পাহাড়ী সর্দাররা জাতিতে উড়িয়া, নয়-দশ পুরুষ আগে এদের পূর্ব-পুরুষেরা খন্দ অঞ্চলে গিয়েছিল। এটাও অনুমান করা যায় যে, তারা খন্দদের গোষ্ঠীগত বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েই সেখানে গিয়েছিল। (২) খন্দমালে কৃষির উন্নতির জন্য স্থানীয় সর্দারেরা কোল্‌টাদের (হিন্দু কৃষক-মহাজন) ডেকে এনে স্থান দিয়েছিল। এমন কি 'বহির্ভূত' তত্ত্ববাদী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও স্বয়ং আদিবাসী অঞ্চলে অ-আদিবাসী জনসাধারণকে বসতি করবার জন্য প্রথম দিকে উদ্যোগ করেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোল্‌হান অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর উক্ত অঞ্চলে সাধারণ ভারতীয়কে বসতি করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বহির্ভূত অঞ্চলে কৃষি ও আবাদ সফল করতে হ'লে হিন্দু কৃষকের সাহায্য অপরিহার্য, একথা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও বুঝতেন।

বহির্ভূত অঞ্চলে এইভাবে বহু হিন্দু বাস ক'রে আসছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বসতি দু'শ বছরেরও ওপর এবং কোন ক্ষেত্রে ৫০ বছর ধরে চলে আসছে। এটা সত্য যে, বহির্ভূত অঞ্চলের ঔপনিবেশিক এই হিন্দুদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ আদিবাসীকে নানাভাবে শোষণ করেছে। কিন্তু এটা মন্দের দিক মাত্র। ভাল দিকও আছে এবং সেটার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। হিন্দুরা যে অঞ্চলে আদিবাসীর প্রতিবেশী হয়ে থাকতে পেয়েছে, সেখানে মোটামুটি ভাবে একটা সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সমগ্রভাবে উন্নতিমূলক না হ'লেও এই পরিবর্তনটাই আদিবাসীদের একটা বড় লাভ। ব্রিটিশ সরকারী নীতির ফলে আদিবাসীদের পক্ষে অচল অনড় যাদুঘরের সামগ্রী হয়ে যাবারই কথা

(1) S. C. Roy, Journal of B & O Reserved Society, 1931.
(2) Manual of Administration of the Madras Presidency.

কিন্তু হিন্দু সংস্পর্শ সেই প্রাচীনতার কবচকে আঘাত ক'রে আদিবাসীকে যুগ-সচেতন করেছে।

বহির্ভূত অঞ্চলে যে সব সাধারণ ভারতবাসী বাস করে, তাদের আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতীর অধিকাংশ হ'ল সাধারণ প্রাদেশিক অঞ্চলের অধিবাসী যারা আধুনিকতর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে। কিন্তু নিজেরা বহির্ভূত অঞ্চলে থেকে উদ্ভট পুরাতন অফিসারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। এই দুর্ভোগের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে তারা বেচারা অনগ্রসর আদিবাসীকেই দোষী করে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অপরিচ্ছন্ন জঞ্জালভরা নীতিই অনর্থক এই বিদ্বেষের ভিত্তি সৃষ্টি করেছে। আদিবাসী সমাজকে কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি 'ঘিরে রাখবার' (Ring Fence Policies) সামর্থ্য তাদের নেই। নিজেদের স্বার্থের জন্য অ-আদিবাসীকে আদিবাসীর কাছে নিয়ে যেতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়েছেন, তবু আদিবাসীকে সরিয়ে রাখবার (Segregate) নীতিকেই তাঁরা আঁকড়ে রয়েছেন। সমগ্র ব্যাপারের পেছনে যেন একটা কূটনীতি কাজ করছে। যে ক্ষেত্রে সত্যিকারের 'তালগাছের বেড়া' তৈরী সম্ভব হয় নি, সে ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তৈরী বেড়া দিয়ে নীতি সার্থক করা হয়েছে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ এবং নেতারা বহুদিন থেকেই গভর্ণমেণ্টের আদিবাসী-পলিসির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে আসছেন। বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি করার ব্রিটিশ প্রচেষ্টাকে ভারতের জাতীয়তাবাদীরা বস্তুতঃ দেশ ও জাতিকে খণ্ডিত করার ব্যবস্থাই বলে মনে করেছেন। অনগ্রসর আদিবাসীরা 'বিশেষ রক্ষাব্যবস্থা' অবশ্যই দাবী করবে, এবং এই দাবী যুক্তিসঙ্গত। জাতীয় নেতারা এ বিষয়ে কোনই আপত্তি করেন না। আপত্তির প্রধান বিষয় হ'ল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ভাবে বিশেষ রক্ষাব্যবস্থা করছেন, সেই পদ্ধতিটা। এই পদ্ধতিকে জাতীয়তাবাদীরা সন্দেহের চক্ষে দেখেন, এবং এটাকে জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির পরিপন্থী ব'লে মনে করেন। আদিবাসীর প্রতি 'বিশেষ রক্ষার' ব্রিটিশ পদ্ধতি বস্তুতঃ জাতীয় অপমানের মত দেশপ্রেমিক জনসাধারণের চিত্তে আঘাত করেছে।

১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে গভর্ণরের একটা 'ভদ্রলোকের চুক্তি'ও (Gentlemen's Agreement) সম্পন্ন হয়। গভর্ণর কথার দ্বারা আশ্বাস দেন যে মন্ত্রীমণ্ডলের কার্যের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট মোটের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না এবং তাঁর আইনগত 'বিশেষ ক্ষমতা'র প্রয়োগ যথাসম্ভব না ক'রেই চলবেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি এবং গভর্ণরদিগের মধ্যে এ বিষয়ে প্রশংসনীয় মতৈক্য স্থাপিত হয়। র ফলে বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন ব্যাপারে গভর্ণরগণ তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে বস্তুতঃ একরকম প্রত্যাহার করেই নেন। উড়িষ্যার গভর্ণর আনুষ্ঠানিক ভাবে যে 'আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল তদন্ত কমিটি' নিয়োগ করেন, সেই কমিটির সদস্য নিয়োগ ও কার্য-পরিচালনার বিবিধ বিষয়ে মন্ত্রিরাই প্রধানতঃ উদ্যোগ করেছেন। মিঃ এলুইন ভারতের জাতীয়তাবাদীকে, তথা উন্নততর হিন্দুসমাজকে আদিবাসীর গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির শত্রু বলেই মনে করেন। কিন্তু তিনিই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে এক জায়গায় বলেছেন: "১৯৩৯ সালে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এই অর্ডার দেন যে বৈগা এবং অন্যান্য অরণ্যবাসী গোষ্ঠীরা তীরধনুক সঙ্গে রাখতে পারবে।" (১)

বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি ক'রে আদিবাসীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা সব দিক দিয়ে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে আদিবাসীকে রক্ষা করা বা উন্নত করা, কোনটাই সম্ভব হয় নি। সাধারণ প্রাদেশিক অঞ্চলের আদিবাসীরা যতটুকু সাধারণ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অধীনে এসেছে, তার ফলে তাদের অবনতিও হয় নি। হিন্দু সংস্পর্শও আদিবাসীকে রসাতলে টেনে নিয়ে যায় নি। সুতরাং বহির্ভূত করার 'গোল বেড়া' (Ring Fence) নীতির কোনই দরকার ছিল না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এসে এত বিষয়ে ভারতবাসীর হাতে 'দায়িত্ব' ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়েও আদিবাসীকে একটা প্রাচীন পরিবর্তনহীন জীবনে আবদ্ধ ক'রে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি ছাড়তে পারলেন না।

(১) Loss of Nerves—Elwin.

ব্রিটিশ শাসনকালের ভ্রান্তিকর নীতি ও ব্যবস্থার প্রসঙ্গ এবং পুরাতন বৃত্তান্ত ও ইতিহাসের আলোচনা ছেড়ে এবার সম্পূর্ণ একটা নতুন ও আধুনিকতম অধ্যায়ে আসা যাক্।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে চলেছে, স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনার ভার গণপরিষদের ওপর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ভারতের এই উদ্যোগে আদিবাসী সমাজের প্রতি কোন নতুন নীতির আভাস পাওয়া গেছে কি?

গণপরিষদের এক অধিবেশনে মৌলিক অধিকার সাব-কমিটির সুপারিশগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে ২৯শে এপ্রিল (১৯৪৭) তারিখে বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা ও কংগ্রেস নেতারা যে সব মন্তব্য ও অভিমত প্রকাশ করেন, তার মধ্যে আমরা ভবিষ্যৎ নীতির আভাস অবশ্যই পাই। উক্ত অধিবেশনের বিবরণীতে রেভারেণ্ড জে. জে. নিকল্‌স্‌ রায় বলেন:

"আদিবাসী অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষ ক'রে আসামের আদিবাসীরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা অসন্তোষ পোষণ করে। তাদের ভয়, ভবিষ্যতে তারা হয়তো শোষিত হবে। এই সন্দেহ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, তারা আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অথবা বর্মার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে। বিষয়টা যেমন আগে, তেমনি এখনো খুব বেশী জটিল হয়ে রয়েছে। আমি ইচ্ছা করি, ভারত গভর্ণমেণ্টের বহির্বিষয়ের (External Affairs) ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একটি বিবৃতি দিয়ে আদিবাসীদের আশঙ্কা দূর করবেন।"

মিঃ জয়পাল সিং বলেন:

"আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অনগ্রসর জাতির লোকেরা সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পেতে চায়। বর্তমানে তারা যে সব আইনগত রক্ষামূলক ব্যবস্থার সুবিধা উপভোগ করছে, সেগুলি যেন ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে। জমিই তাদের জীবিকার ভিত্তি ছিল এবং স্বাধীনতা যেন তাদের এমন অবস্থার দিকে টেনে না নিয়ে যায়, যার ফলে জমিই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উত্তরে বলেন :

"আমাকে মধ্যবর্তী (Interim) ভারত গভর্ণমেণ্টের বহির্বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত চিব হিসাবে বিবৃতি দেবার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এই গণপরিষদে আমি ভর্ণমেণ্টের সচিব হিসাবে আসিনি, এখানে আমি যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণের কজন প্রতিনিধি।......আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে এবং আমাদের অন্যান্য ভাগ্যহীন তাগণ যারা বিনা দোষে অনগ্রসর হয়ে রয়েছে, তাদের সকলকেই রক্ষা করা এবং বেশী সম্ভব প্রত্যেক বিষয়ে উন্নত হতে সাহায্য করা আমাদের ইচ্ছা। আমি নে করি ভবিষ্যৎ ভারতের যে কোন গভর্ণমেণ্টেরই এই নীতি হতে বাধ্য। দিবাসীদের প্রতি সমস্ত দেশের সহানুভূতি রয়েছে।"

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন :

"বর্তমানে প্রচলিত আইনের সাহায্যে আদিবাসীরা যে রক্ষামূলক সুবিধা উপভোগ করছে, ভবিষ্যতে সেই সব সুবিধা বাতিল ক'রে দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে য় করবার কিছু নেই। কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো : আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদের কি এই ইচ্ছা যে উপজাতি আদিবাসীকে চিরকাল উপজাতি (Tribes) করেই রাখা হোক্ ? আমি মনে করি এটা আদি-বাসীদের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। বরং সকলের পক্ষে এই চেষ্টা করা উচিত যাতে অনগ্রসর জাতির লোকদের জীবনযাত্রা মিঃ জয়পাল সিংয়ের জীবনযাত্রার সমান স্তরে উন্নীত হতে পারে ; এবং যাতে আজ থেকে দশ বৎসর পরে আদি-বাসীকে উন্নত করার জন্য যেন কোন আইনের সাহায্যের প্রয়োজন আর না হয়। দু'শ বছরের বৈদেশিক শাসনের জন্যই অনগ্রসর শ্রেণীগুলি, আদিবাসীদের সমস্যা এবং অস্পৃশ্যতা পূর্বে যে অবস্থায় ছিল আজও সেই অবস্থায় রয়েছে। অতীতের গভর্ণমেণ্ট এই সব ভেদ কায়েম রাখার জন্যই তৎপর ছিলেন। আদিবাসীরা বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সেই অবস্থাতেই তাদের ধরে রাখতে আমাদের আগ্রহও নেই, আকাঙ্খাও নেই।" (১)

(১) Hindusthan Standard, dated April 30, 1947.

আদিবাসী সমস্যা ও বিশেষজ্ঞের অভিমত

উপজাতীয় সমাজ-সংহতি অর্থাৎ আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সামাজিক জীবনের ভিত্তি প্রধানতঃ যে কারণে ভাঙতে আরম্ভ করেছে, সে সম্বন্ধে পূর্বপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এর প্রধান কারণ হ'ল ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন। শুধু আইন নয়, এই সব আইন যে ভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সেটাও গর্হি আংশিক বা সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের ওপর এত বেশী ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় যে, সেটা প্রায় অপব্যবহারের ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। একজন অফিসারের হাতেই শাসন ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। আদিবাসী অঞ্চলে এই অফিসারেরাই ইউনিয়ন বোর্ড বা তালুক বোর্ড বা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন। এভাবে আদিবাসী অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নীতি সমূহ ব্যর্থ করা হয়েছে।

এমন অনেক ব্যাপার আছে যেটা উপজাতীয় সমাজনীতি অনুসারে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। দৃষ্টান্ত—জোর ক'রে কোন মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। কিন্তু ব্রিটিশ আইনে এটা অপরাধ। এবং, ব্রিটিশ আইনের মহিমায় দীক্ষিত ভারতীয় হাকিম সুদূর সহরে ও সদরে বসে যখন এই ধরণের কোন মামলার বিচার করেন, তখন তাঁর পক্ষে সমস্ত ঘটনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা সম্ভব হয় না। বিচারটা একপেশে ও গোঁড়া বিচার হয়ে থাকে। আদিবাসীর পক্ষে ব্রিটিশ আদালতের ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা করাও সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আদালতের বিচারে শাস্তিলাভ ক'রে আদিবাসী অনেক সময় এই মনোবেদনাই লাভ ক'রে থাকে যে, বিনা অপরাধে তার শাস্তি হ'ল।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায় লিখেছেন: "ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন ও শাসন উপজাতীয়দের সংহতি আরও বিনষ্ট করেছে এবং তাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিজস্ব 'পঞ্চের' অর্থাৎ নিজস্ব সামাজিক কর্তৃত্বকে খর্ব ক'রে দিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে উপজাতীয় সামাজিক প্রথাগুলিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে

গভর্ণমেণ্ট যে সব নির্দেশ দিতেন, আদালত আবার সেগুলিকে অস্বীকার করতো। দৃষ্টান্ত —পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার। এই উপজাতীয় প্রথাকে অস্বীকার ক'রে আদালত ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রথা অনুসারে দায়াধিকার আইনের (Succession Act) বলে মামলার বিচার করতো, যেটা উপজাতীয়দের সামাজিক জীবনের মৌলিক ব্যবস্থা ও আত্মীয়তার নীতির বিরোধী।"

আদিবাসীদের জমি ধীরে ধীরে মহাজন, জমিদার প্রভৃতি লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে। এইভাবে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়ে আদিবাসীরা তাদের সমাজ সংহতিও হারিয়েছে। এই অধঃপতনের মূল কারণও হ'ল ব্রিটিশ পদ্ধতির ভূমি আইন। অবশ্য, এই অধঃপতন একমাত্র আদিবাসী চাষীর দুর্ভাগ্য নয়, ভারতের সর্বত্র সাধারণ চাষীকেও এই দুর্ভাগ্যে ভুগতে হচ্ছে।

ভূমির ওপর থেকে চাষীর অর্থনৈতিক মূল উচ্ছিন্ন হলে তার সামাজিক মনোবলের ভিত্তিও থাকে না। এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য। ভারতের বর্তমান দুরবস্থাগ্রস্ত আদিবাসী সমাজের 'মনোবল হানির' যে কথা বহু নৃতাত্ত্বিক উল্লেখ করেছেন, তার প্রধান কারণ হ'ল, ভূমি থেকে অধিকারচ্যুত হওয়া। এবং এই 'মনোবল হানি' সৃষ্টির ব্যাপারে ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে।

"জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে চাষীকে, বিশেষ করে রায়তী অঞ্চলের চাষীকে ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসারে অবাধ অধিকার দিয়েছে। চাষী ইচ্ছে করলেই তার জমিকে পরের হাতে তুলে দিতে পারে, তার এই অধিকারকে বাধা দেবার কোন নীতি ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ছিল না। তারপর, ব্রিটিশ আইন অনুসারে যে ধরণের বিচারপদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তার ফলে ঋণদাতা মহাজন তার খাতকের ওপর বড় বেশী ক্ষমতা লাভ করে। এ ছাড়া, আবার তামাদি আইনের ফলে খাতক তার ঋণ-পত্রকে নির্দিষ্ট অল্পমেয়াদী কালের মধ্যেই নতুন ক'রে তৈরী করিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে খাতকের অবস্থা আরও খারাপ হয়। একজন চাষী প্রয়োজনে পড়ে ঋণ গ্রহণ করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক এবং এর মধ্যে বিশেষ রকমের দুর্ভাগ্য

আশঙ্কা করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু এইসব ব্রিটিশ পদ্ধতির অন্যান্য ব্যাপারগুলি সব মিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাতক চাষীকে বস্তুতঃ ক্রীতদাসে পরিণত করেছে······আদালতের সাহায্যে খাতকের কাছ থেকে এত সহজে প্রাপ্য টাকা উদ্ধার হয় বলেই মহাজনেরা বেশী ক'রে ঋণ দেবার জন্যে উৎসাহিত হয়েছিল। চাষীর আর্থিক অবস্থা যখন ভাল ছিল, তখন এইভাবে মহাজনের ঋণ দেওয়া ও আদায় করার প্রক্রিয়া ভালভাবেই সম্পন্ন হতে পেরেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন চাষীর অবস্থা খারাপ হয়ে এল, তখনি মহাজনের পক্ষে ঋণ আদায়ের ভরসাও সঙ্কুচিত হ'ল। এবং মহাজনও চাষীর কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায়ের ভরসা কম দেখে টাকার বদলে চাষীর 'জমি' আদায় ক'রে নেবার পথ ধরলো। এইবার চাষী বুঝতে পারলো, কোন্ অবস্থায় সে পৌঁছেছে। (১)

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বেও ভারতবর্ষে মহাজনী প্রথা ছিল, মহাজন চাষীকে ঋণ দিয়ে সুদ সুদ্ধ আদায় করতো। কিন্তু এই প্রাক্ ব্রিটিশ প্রথা ও বর্তমান ব্রিটিশ প্রথার মধ্যে একটা মৌলিক তারতম্য দেখা যায়। এ সম্পর্কে বি. এ. কলিন্স (B. A. Collins) নামক জনৈক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের অভিমত উধৃত করা গেল :

"ব্রিটিশ প্রবর্তিত সাধারণ সিভিল শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি চাষীকে তার কৃষিজাত সামগ্রীর লভ্যাংশ এবং তার জমি থেকে তাকে বঞ্চিত করার যন্ত্রস্বরূপ কাজ ক'রে থাকে। অতীতে (ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে) নিরক্ষর খাতক এবং সামান্য সাক্ষর মহাজনের মধ্যে শুধু মৌখিক চুক্তি অনুসারে লেন দেন হতো। কিন্তু সেই মৌখিক চুক্তির প্রথা উঠে গিয়ে একটা কেতাদুরস্ত লিখিত-পড়িত চুক্তির প্রথা স্থানলাভ করেছে। এই প্রথা একপেশে, হিসাবের দিকটা একমাত্র মহাজনই বুঝতে পারে এবং তার হাতেই থাকে, কারণ সে বর্তমানে চাষীর মত নিরক্ষর নয়। এর ফলে চাষী অসহায়ভাবে মহাজনের কাছে ক্রীতদাসের অবস্থায় বাঁধা পড়তে থাকে।" (২)

---

(1) Industrial Evolution of India—Prof. D. R. Gadgil.
(2) The Economic Development of India—Dr. V. Anstey.

নিরক্ষর আদিবাসী চাষী তো মহাজনের তমস্সুকটিতে টিপ সই দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তমস্সুকে কি লেখা আছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা তার নেই, অথচ আদালতের কাছে এই তথাকথিত আইনসম্মতভাবে রচিত তমস্সুকখানাই একমাত্র প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস্য বস্তু। আদালত মহাজনের পক্ষে ডিগ্রী দেবার সময় আর অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না।

ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য অনেক দেশেও কোন না কোন প্রকার জমিদার প্রথা আছে কিন্তু এক্ষেত্রে একটা পার্থক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের জমিদার নামে ভূস্বামী খাজনা আদায়কারী ব্যক্তিমাত্র এবং তার প্রজাপত্তনী জমিতে কৃষিকাজের ব্যাপারের সঙ্গে সে কোন সম্পর্ক রাখে না। অন্য দেশের ভূস্বামী এরকম নয়। তাদের জমিতে অন্য চাষী যে সব কৃষিকাজ ক'রে থাকে, সেই কৃষিকাজের সঙ্গে লাভালাভ নিয়ে সে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

তাছাড়া ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে জমিদারী ও মহাজনী ব্যাপারে আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জমিদার এবং মহাজন অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন অঞ্চলের লোক হয়ে থাকেন। চাষীরা এক সমাজের লোক এবং জমিদার বা মহাজন আর এক সমাজের লোক। বিশেষভাবে আদিবাসী অঞ্চলে এই ব্যাপার সবচেয়ে বেশী সত্য। ভারতের রাজকীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্টে এই মন্তব্য করা হয়েছে:

"জমিদার এবং মহাজনেরা প্রায়ই স্থানীয় অঞ্চলের লোক নয়, তারা ভিন্ন সমাজের লোক। এই কারণে তার জমিদারী অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তার মনে কোন স্বাভাবিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্কবোধ নেই। সে তার অধিকারযুক্ত জমিদারীকে একটা সম্পত্তি মনে ক'রে শুধু শোষণ করার জন্যেই উৎসাহিত।"

ভূমি ঋণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ আইন ও ব্যবস্থা ভারতের চাষী সমাজকে কি ভাবে বিপর্যস্ত করেছে, তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া গেল। এই সম্পর্কে শুধু আর একটা মন্তব্য করা যায় যে, উক্ত আইন ও ব্যবস্থায় আদিবাসীরাই সমাজের সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত ও শোষিত হয়েছে, কারণ আদিবাসীরাই বিশেষভাবে অজ্ঞ, নিরক্ষর এবং দরিদ্র একটি সমাজ।

ব্রিটিশ শাসন আমলে প্রজা ও চাষীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন আইন করা হয় নি তা নয়। ভূমি ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়ে এই ব্রিটিশ আইন ও নীতির বিবর্তনের তিনটি ধাপ দেখা যায়।

(১) প্রথম অধ্যায়: জমিদার ও মহাজনের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন প্রবর্তন।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়: চাষী, প্রজা ও খাতকের স্বার্থের জন্য জমি সম্বন্ধে হস্তান্তরবিরোধী ও রক্ষামূলক আইন প্রবর্তন।

(৩) তৃতীয় অধ্যায়: শোষিত চাষী, প্রজা ও খাতকের বোঝা লাঘব করার জন্য মকুবমূলক আইন পরিবর্তন।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটিশ নীতি দ্বারা প্রজা শোষণের ব্যবস্থাটি কায়েম করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শোষণের কুক্রিয়ার কিছুটা গতিরোধ করার চেষ্টা হয়, কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। অগত্যা, তৃতীয় অধ্যায়ে, ঋণ মকুব প্রভৃতি রিলিফ বা প্রত্যক্ষ সাহায্যমূলক উদ্যোগ কিছুটা করা হয়। (১)

কিন্তু আইনঘটিত এইসব উদ্যোগ দ্বারা চাষীপ্রজার আংশিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্ভব হলেও তার যথার্থ অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব হয় নি। সহজে জমি হস্তান্তর করার সুযোগ থাকলে, গরীব চাষী প্রজা অর্থাভাবে জমি হস্তান্তর করবেই। সুতরাং এবিষয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবন্ধক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান হ'ল, যাতে চাষী প্রজা অর্থাভাবে না পড়ে, এবং সেটা

(১) প্রথম অধ্যায়ের আইনগুলি হ'ল, যথা:

Court of Wards Acts—Talukdar Acts—Encumbered Estates Acts, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আইনগুলি হ'ল, যথা:

Tenancy Acts—Land Alienation Acts—Redemption of Mortgages Acts, ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আইনগুলি হল, যথা:

Agriculturists Relief Acts—Usurious Loans Acts—Debtor's Relief Acts—Money Lenders Acts—Debts Conciliation Acts, ইত্যাদি।

স্তব করার জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানে আরও কিছু গঠনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন, থা চাষীপ্রজাকে কৃষিকার্যের জন্য মূলধন যোগান দেওয়া, বিনা সুদে বা অল্পসুদে রকারী ঋণ পাইয়ে দেওয়া, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারতের সাধারণ চাষীপ্রজার যে সব সমস্যার কথা এবং তার সমাধানের কথা বলা হ'ল, তার প্রত্যেকটি আদিবাসী সমাজের সম্বন্ধে খাটে। মার সামাজিক অবনতির কথা ধরলে, আদিবাসীর সে সমস্যাও হরিজন সমাজের সমস্যার মত। হরিজনদের সামাজিক উন্নতির জন্য যে পদ্ধতির উদ্যোগ প্রয়োজন, আদিবাসীর সামাজিক উন্নতির জন্যেও সেই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

শুধু একটি বিষয়ে আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন। আদিবাসীদের সামাজিক জীবনে এখনো গোষ্ঠীবদ্ধ গঠন রয়েছে, আদিবাসীদের রুচি অনুসারে তাদের কতগুলি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই দিক দিয়ে তাদের সমস্যা অন্য সাধারণ চাষীপ্রজার সমস্যা থেকে পৃথক।

সুতরাং আদিবাসী সমাজের এই বিশেষ সমস্যাগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করে, বিশেষভাবে তার সমাধানের চেষ্টাই আদিবাসী সেবার প্রকৃত নীতি হওয়া উচিত। তাছাড়া সমস্ত বিষয় ধরলেও, দেখা যায় যে, আদিবাসীরা অন্যান্য অনুন্নত সমাজের (হরিজন ইত্যাদি) তুলনায় একটু বেশী দরিদ্র, একটু বেশী নিরক্ষর, একটু বেশী অবহেলিত। সেই কারণে মিঃ গ্রীগসনের অভিমত সমর্থন করেই বলা যায় যে, আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একটু বেশী উদ্যোগ এবং একটা বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। (২)

(2) "Nearly everything that I advocate for the Gond, the Korku, the Baiga and the Bhil is necessary, if not always in the same degree, for all the castes and tribes of the backward areas, save in so far as, because of greater backwardness, inferior economic conditions or linguistic difficulties, there are problems peculiar to the aboriginals"—Grigson (The Aboriginal Problem in the Balaghat District).

ভারতের আদিবাসী সমাজের সমস্যা কি, এবং তার সমাধানের পদ্ধতি কি? বহু বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনেক বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন, অনেক বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ এবং অনেক বিষয়ে অবিসংবাদিতভাবে এক। ভারতের আদিবাসীদের সম্বন্ধে যে সব বিশেষজ্ঞের অভিমত আমরা পেয়ে থাকি, তাঁরাও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিত। প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের অভিমত আমরা পেয়ে থাকি—(১) নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ, (২) সরকারী অফিসার বিশেষজ্ঞ এবং (৩) সমাজ-সংস্কারক বিশেষজ্ঞ।

আরও জটিল ব্যাপার হ'ল, আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে এক নৃতাত্ত্বিক ও আর এক নৃতাত্ত্বিকের মধ্যে, এক অভিজ্ঞ অফিসার ও আর এক অভিজ্ঞ অফিসারের মধ্যে এবং এক সমাজ-সংস্কারক ও আর এক সমাজ-সংস্কারকের মধ্যে মতবৈষম্য আছে। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই এই মত-পার্থক্যের প্রধান কারণ। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকের পরামর্শকেই গ্রাহ্য করা উচিত। অভিজ্ঞ সরকারী অফিসারও তাঁর অভিমতকেই প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হবার দাবী করেন। সমাজ-সংস্কারক তাঁর আদর্শগত নীতিকেই বা অগ্রাহ্য হতে দেবেন কেন? তিনিও সমভাবে তাঁর অভিমতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জোর দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

সম্পূর্ণ সত্য না হলেও এটা কিছুটা সত্য যে, নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞেরা আদিবাসী সমাজকে তাঁর ল্যাবরেটারী উপাদান বলেই মনে করেন এবং তাঁদের দৃষ্টিটাও নিছক গবেষকের দৃষ্টি, আগ্রহটা নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

অভিজ্ঞ সরকারী অফিসারের দৃষ্টিতে প্রায়ই একটা ভ্রান্ত ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা শাসকের চক্ষু নিয়ে আদিবাসীকে নিছক শান্ত ও সুবাধ্য প্রজা হিসেবেই দেখতে চান এবং সেইজন্য তাঁদের অভিমতগুলি প্রায়ই একটা আইনবিলাসের তত্ত্ব হয়ে ওঠে।

সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিভঙ্গীতেও অনেক ক্ষেত্রে একপেশে গোঁড়ামি দেখা যায়। হয় ধর্মীয় গোঁড়ামি, নয় একটা পলিটিক্যাল গোঁড়ামি। আদিবাসী সমাজকে উন্নত

করতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় আদিবাসীকে খাঁটি হিন্দু আর খাঁটি খৃষ্টানে পরিণত করবার দাবী ক'রে থাকেন।

এই জটিল মতারণ্যের মধ্যে বেচারা আদিবাসীকে কোন্ মতে পথ ক'রে দিতে হবে, সেটাই প্রশ্ন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজে হবে না, যদি না তার আগে একটি নীতি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ আদিবাসীর উন্নয়নের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট বা কোন সেবক প্রতিষ্ঠান কোন্ নীতিকে তাঁদের কর্মপন্থার নিয়ামক বলে গ্রহণ করবেন?

উত্তর হিসাবে বলতে পারা যায়—জাতীয়তার নীতি। আদিবাসী সমাজকে ভারতের জাতিদেহের অঙ্গীভূত করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, আদিবাসী তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সাধারণ বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, মারাঠীর মত হয়ে যায়, কারণ, এই রকম একরূপ হয়ে যাওয়া ভারতীয় জাতীয়-তার ধর্মই নয়। বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত হয়ে থাকাই ভারতীয় জাতীয়তার নীতি, এক কথায় বলা যায় ভারতের সামাজিক-ঐতিহাসিক নীতি। বর্তমানের দুঃখী দুর্বল অনুন্নত সাঁওতাল উন্নত সাঁওতাল হয়েই ভারতীয় সমাজজীবনে অন্য সকল সমাজের মত দায়িত্বে, নেতৃত্বে ও সেবকত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। এক দেহে লীন করে দেবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করলে সেটা বস্তুতঃ সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজম হয়ে উঠবে। কোন নৃতাত্ত্বিক বা গভর্ণমেণ্টের অফিসার বা সমাজসংস্কারক যদি জাতীয়তার অর্থ 'এক দেহে-লীন' ক'রে দেওয়া মনে করেন, তাহলে ভুল করবেন। পোলট্রি-বিশারদের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি দিয়ে মানুষের সমাজতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের কল্পনা গর্হিত মূঢ়তা মাত্র। ভারতের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে আদি-বাসীর বংশ সংমিশ্রণ এক বিরাট সমাজবিপ্লবের ব্যাপার। এত বিরাট একটা পরিবর্তন ঐতিহাসিক নিয়তির হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। উন্নতির একটা বিশেষ ছাঁচ কল্পনা করে নিয়ে সব আদিবাসীকে সেই ছাঁচে একসঙ্গে ঢালাই ক'রে গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ মাত্র। তা না ক'রে যাতে আদিবাসী-দের ছাঁচটাই উন্নত ও যুগোচিত হয়ে গড়ে ওঠে, তার ব্যবস্থাই একমাত্র সভ্যতা-

সঙ্গত পদ্ধতি। বলা যায়—আত্মবিকাশের (Self-Development) পদ্ধতি এবং এটাই হ'ল ঐতিহাসিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হলেই বরং অদূর বা দূর ভবিষ্যতে একদেহে লীন হওয়া অর্থাৎ শোণিত সমন্বয় হওয়া স্বাভাবিক ভাবে সিদ্ধ হবে। স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় একদেহে লীন হওয়া অর্থে এই বোঝায় যে, আদিবাসী সমাজ তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সমগ্র ভারতীয় জাতীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত ক'রে দিয়ে, স্বয়ং ভারতের সকল সমাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে ও সামাজিকতায় এক হয়ে গেল। কিন্তু এত বড় একটা ভবিষ্যতের পরিণামকে সম্ভব করার জন্য কোন পণ্ডিত তাঁর বর্তমান বুদ্ধির সামর্থ্য দিয়ে আজই কোন পরিকল্পনা করতে পারেন না। কাজেই বর্তমানের আদিবাসী সমাজের সমস্যা সমাধানে আত্মবিকাশের নীতিকেই একমাত্র নীতি বলে গ্রহণ করা কর্তব্য।

পূর্ব প্রসংগে আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বহু অভিমত উধৃত করা হয়েছে। পরস্পরের অভিমত সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ধারণা যাতে সম্ভব হতে পারে, তারই জন্য এই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বিশেষজ্ঞদের অভিমত পরিবেশন করা হ'ল।

ডাঃ হাটন—ব্রিটিশ আগমনের বহু আগে থেকেই আদিবাসী সমাজের পরিবর্তন হয়ে আসছিল, কিন্তু সে পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত মন্দগতি। সেই কারণে আদিবাসীরা পরিবর্তনের সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো, কিন্তু ব্রিটিশ আসবার পর রেল ও রাস্তা বেশী ক'রে তৈরী হবার-সঙ্গে বাইরের সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে পরিবর্তনের গতি হঠাৎ এত বেশী দ্রুত হয়ে গেছে যে, তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার সামর্থ্য আদিবাসীদের নেই। জঙ্গল সংরক্ষণ, আদিবাসী অঞ্চলে খনির কাজের প্রসার, ঘরে-তৈরী হাঁড়িয়া বা পচাই মদ বন্ধ ক'রে আবগারী স্পিরিট মেশানো নম্বরী মদের প্রচার, জমি সম্পর্কে আইন ও ভূমিকর প্রথার প্রবর্তন, ঋণ সম্পর্কে আইন, আদিবাসী অঞ্চলে ভিন্ন অঞ্চলের লোকের বসতি বিস্তার, এই সব কারণে আদিবাসীদের সামাজিক জীবন ভেঙে যাচ্ছে।

এই অবস্থা চলতে থাকলে আদিবাসী সমাজ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মত 'দৈহিক অবনতি ও মানসিক উৎসাহহীনতার ('physical decline and psychical apathy') কারণে একটা দুর্বল উপজাতীয় জীবন বহন ক'রে চলবে।

"সমস্যা সমাধানের উপায় হ'ল—আত্মশাসন ব্যবস্থা সম্বলিত এক একটি উপজাতীয় অঞ্চল সৃষ্টি করা, যেখানে আদিবাসীরা পার্শ্ববর্তী বা চারিদিকে অবস্থিত প্রদেশগুলির অধীন না থেকে স্বাধীনভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।" (১) আদিবাসীকে 'বিশেষভাবে রক্ষা' করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে সব বহির্ভূত অঞ্চল (Excluded Area) সৃষ্টি করেছেন, তাতে আদিবাসীদের ভাল হয়েছে।

মিঃ শুবার্ট—মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে এই ধারণা হয় যে, বাইরের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আদিবাসীদের জীবনে কোন বিপর্যয় হয় নি। সম্ভবতঃ, দূর অতীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি এখানে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে এবং বহু শতাব্দী ধরে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি পাশাপাশি চলে আসছে। বাইরের সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এই প্রদেশের আদিবাসীরা অন্য দেশের আদিবাসীর মত লুপ্ত হয়ে যাওয়া দূরে থাক, বরং সবচেয়ে বেশী বংশ বৃদ্ধি করেছে। (২)

"বাইরের ব্যবসায়ী ও মিশনারীদের কার্যকলাপের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক দেশের আদিবাসীদের জীবনে ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতের মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রয়োগ করা যায়

---

(1) "The solution of problem would appear to be to create Self-Governing tribal areas with free power of self-determination in regard to surrounding or adjacent provincial units."—Dr. Hutton (Census of India Report, 1931.)

(2) "So far from the race dying out as has happened to the aborigines in other parts of the world, it has continued to form the most fecund element in the Provinces"—Shoobert (Census of India, C. P. & Berar Report, 1931.)

না। এই প্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা আর অন্য কোন দেশের ধ্বংসশীল আদি-বাসীদের অবস্থা, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আরোপ করা সঙ্গত হবে না" (৩)

অবশ্য কতগুলি ব্যবস্থা আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। হাঁড়িয়ার বদলে আবগারী মদ পান করতে বাধ্য হওয়া—গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদকের ব্যবহার বৃদ্ধি—কাপড়ের সংস্থান করার ক্ষমতা নেই, তবু কাপড় পরার অভ্যাস। নরবলি, ডাইনী পোড়ানো ইত্যাদি বীভৎস প্রথা বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত, তবে আদিবাসী সমাজে জোর-করে-ধরে-নিয়ে কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রথা বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না। ঝুম চাষও রহিত করা ঠিক নয়।

কিন্তু উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজের যতটা 'ক্ষতি' হয়েছে, তার তুলনায় 'লাভ' হয়েছে অনেক বেশী। গোষ্ঠী সর্দারদের স্বৈরাচারী প্রভুত্বের তুলনায় একটা আইনবদ্ধ গভর্ণমেণ্টের শাসন ঢের ভাল ব্যবস্থা।

প্রতিবেশী সভ্যতর অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে চললে আদিবাসীদের উন্নতি হবে।

শরৎচন্দ্র রায়—দেখা গেছে সমতলবাসী ভুইয়া সমাজ ভিন্ন সমাজের সভ্যতর প্রতিবেশীর সংস্পর্শে এসে উন্নত হয়েছে, যদিও এর ফলে তাদের আদিম তেজস্বিতা ('Primitive virility') কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পাহাড়ী ভুইয়া সমাজের তুলনায় সমতলবাসী ভুইয়া উন্নত। সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে ভুইয়াদের মধ্যে কোন সামাজিক অসুবিধা অথবা মনের দিক দিয়ে কোন নৈরাশ্যবাদ (Pessimism) দেখা দেয় নি। (৪)

খাড়িয়া সমাজের মধ্যে দুধ-খাড়িয়া গোষ্ঠী হিন্দু ও খৃষ্টান সমাজ এবং সভ্যতার খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু এর ফলে এই দুধ-খাড়িয়া সমাজের উপ-জাতীয় সংস্কৃতি লুপ্ত হয় নি। বরং তারা হিন্দু সংস্কৃতি থেকে এমন সব প্রথা এবং

(৩) গুবার্ট—উক্ত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।
(4) The Hill Bhuiyas of Orissa—S. C. Roy.

উপাদান গ্রহণ করেছে, যা তাদেরই উপজাতীয় সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানরূপে একাঙ্গীভূত হয়েছে। (৫)

মিশনারীদের উদ্যোগে প্রচারিত খৃষ্টধর্মের সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজের মোটের ওপর ভালই হয়েছে। ব্রিটিশ আইনের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার ফল খারাপ হয়েছে। কতগুলি কুপ্রথা দূর হয়েছে ঠিকই কিন্তু আদিবাসীরা তাদের জমি হারিয়েছে এবং তাদের অনেক ঐতিহ্যপুষ্ট অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ডাঃ ডি. এন. মজুমদার—কোল্‌হান অঞ্চলের হো সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, তারা পূর্ব-পুরুষদের তুলনায় অল্পায়ু ও দুর্বল দেহ হয়েছে, যদিও বংশবৃদ্ধির হার আগের তুলনায় বেশী। ঔদাসীন্য, উৎসাহহীনতা, নৈরাশ্য-বাদ প্রভৃতি মনোবলহীনতার যে সব লক্ষণ আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেগুলি অবশ্য বেশী শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছায় নি। নতুন পরিপার্শ্ব ও পরিবর্তন বরণ ক'রে নিয়ে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হো সমাজ শিখেছে। (৬)

আদিবাসীদের দুরবস্থার কারণ :

(১) আবগারি আইন, চোলাই প্রথার (Outstill System) ফলে আদিবাসী-দের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস বেড়েছে।

(২) আদিবাসীদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের কর্তব্যচ্যুত ক'রে সরকারী শাসন কর্মচারী নিয়োগ গোষ্ঠীগত জীবনের সংহতি নষ্ট করেছে।

(৩) যে সব জমিতে আদিবাসীরা ঝুম চাষ করতো সে সব জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

(৪) আদিবাসী অঞ্চলের জমির নীচে খনিজ পদার্থ থাকলেও, আদিবাসীরা মোটা টাকা জমা দিয়ে লাইসেন্স না নিলে সে সব খনিজ তুলতে পারে না।

---

(5) The Kharias—S. C. Roy. & R. C. Roy.

(6) A Tribe in Transition—D. N. Majumdar.

(৫) ঝুম চাষের পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, লাঙ্গল চাষ পদ্ধতিতে আদিবাসীরা অভ্যস্ত নয়।

(৬) ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে জোর ক'রে মেয়ে ধরে নিয়ে বিয়ে করা ('marriage by capture') নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (৭)

(৭) বর্তমান হাট, বাজার ও মেলা প্রভৃতি ব্যাপারে আকৃষ্ট হবার ফলে আদিবাসীদের আর্থিক ধ্বংস হয়ে চলেছে।

(৮) যে ধরণের শিক্ষা (education) বর্তমানে আদিবাসীদের দেওয়া হচ্ছে, তাতে ভাল'র বদলে ক্ষতি বেশী হচ্ছে।

(৯) সরকারী বিচার বিভাগের রাজকর্মচারীরা আদিবাসীদের সামাজিক প্রথা, ভাষা এবং মানসিক গঠন সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে আদিবাসীদের বাদবিবাদে ন্যায়সঙ্গত বিচার করতে পারেন না।

(১০) মিশনারীদের কার্যকলাপের ফলে আদিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে।

(১১) সভ্য সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে আদিবাসীদের মধ্যে নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব হয়েছে। এই সব রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাদের ঐতিহ্যগত ভেষজ-বিধির মধ্যেও কোন ব্যবস্থা নেই। (৮)

এই সব কারণে ভারতের আদিবাসী সমাজের বংশাবনতি এবং জনসংখ্যা হ্রাসের লক্ষণ ('tendency to decline') দেখা দিয়েছে।

ভাই অমৃতলাল ঠক্কর—আদিবাসী সমাজ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার পর্যায়ে রয়েছে। এদের সমস্যা হ'ল: (১) দারিদ্র্য, (২) নিরক্ষরতা, (৩) স্বাস্থ্য

(৭) কন্যাপণ দেবার প্রচলিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই আদিবাসী যুবক কোন মেয়েকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে; কারণ কন্যাপণ দেবার সামর্থ্য অনেকেরই নেই। জোর ক'রে কোন মেয়েকে নিয়ে গিয়ে একবার বিয়ে ক'রে ফেলতে পারলেই উপজাতীয় সমাজনীতি অনুসারে সেই বিবাহ সিদ্ধ বলেই বিবেচিত হয়।

(8) Primitive Society & Its Discomforts— D. N. Majumder. (নিখিল ভারত জনসংখ্যা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

হীনতা, (৪) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের দুর্গম্যতা, (৫) শাসনব্যবস্থার ত্রুটি, (৬) নেতৃত্বের অভাব।

আদিবাসীরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির, তার ওপর ঝুম চাষ, মদ্যপান, বেগার প্রথা ইত্যাদির জন্য নিতান্ত দরিদ্র সমাজে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে ম্যালেরিয়া এবং যৌনরোগের প্রাবল্য দেখা যায়।

সভ্য সমাজের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত। আদিবাসী অঞ্চলে পথঘাটের প্রসার, শিল্প ও বাণিজ্যের পত্তন ও শিক্ষাবিস্তার হওয়া উচিত। গোষ্ঠীগত পঞ্চায়েৎগুলিকে পুনর্জীবিত করতে হবে। প্রাদেশিক আইনসভায় আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের জন্য আসন-সংখ্যা আরও বেশী সংরক্ষিত করতে হবে। আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সাধারণ শাসন কর্তৃত্বের বহির্ভূত ক'রে রাখার নীতি আদৌ সমর্থন করতে পারা যায় না। অ-খৃষ্টান আদিবাসী সমাজে এমন শিক্ষিত ও যোগ্য লোকের সংখ্যা কম, যাঁরা তাঁদের সমাজের নেতৃত্ব করতে পারেন, সেই কারণে অন্য সমাজের সেবকমনোভাবসম্পন্ন যোগ্য কর্মীদেরই আদিবাসী সমাজের নেতৃত্ব নিতে হবে, যতদিন না আদিবাসী সমাজ থেকেই যোগ্য নেতৃদলের আবির্ভাব সম্ভব হয়।

আদিবাসী সমাজকে ভারতের অন্যান্য সমাজ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা চলতে পারে না। "আদিবাসী সমাজকে দুর্গম পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চলে স্বতন্ত্র ক'রে ও আবদ্ধ ক'রে রাখার অর্থ বলতে গেলে কতগুলি নৃতত্ত্ববিলাসী পণ্ডিতের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য আদিবাসীকে তত্ত্ব পরীক্ষার উপাদানের মত কাঁচের পাত্রে আবদ্ধ ক'রে রাখার ব্যাপার।" (৯)

আদিবাসী সমাজকে আমাদের দেশেরই সভ্য সমাজের একটি অংশরূপে পরিণত করতে হবে। দেশের কোন একটা প্রচলিত ধর্মের অবলম্বী সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যে নয়, দেশের সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অন্য সকল

(9) The Problem of Aborigines ... ...

অগ্রসর সমাজের সঙ্গে তাঁদেরও সমান সুযোগ ও অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আদিবাসীকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখার থিওরী একটা ক্ষতিকর থিওরী। এ থিওরী আমাদের জাতীয় সংহতির মূলে গিয়ে আঘাত করছে। (১০)

মিঃ ভেরিয়েরের এলুইন: আদিবাসী সমাজকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম, জমিদার ভূস্বামী ও সর্দার শ্রেণীর আদিবাসী যারা হিন্দুসমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ ক'রে একটা অভিজাত সমাজে পরিণত হতে পেরেছে এবং যাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল।

দ্বিতীয়, যারা হিন্দু সমাজের সান্নিধ্যের ফলে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই সব শ্রেণীর আদিবাসী।

তৃতীয়, যারা পাহাড় ও জঙ্গল অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত জীবন যাপন করছে।

উক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিবাসীদেরই মনোবলহীনতা বা স্নায়বিক হানি (loss of nerve) হয়েছে, তাদের মন একটা ব্যর্থতাবোধ দ্বারা পীড়িত। এর কারণ হ'ল (১) আবাদ জমি হাতছাড়া হওয়া, (২) জঙ্গলের সামগ্রী আহরণের অবাধ অধিকার বিনষ্ট হওয়া, (৩) অর্থনৈতিক শোষণ, (৪) উপজাতীয় শিল্পকর্ম বিনষ্ট হওয়া এবং সৃষ্টি করার আগ্রহের ব্যর্থতা, (৫) আইনের প্রকোপে পড়ায় নৈতিক ও স্নায়বিক অবসাদ, (৬) ধর্মীয় শিকার-উৎসবের প্রথা লুপ্ত হওয়া, (৭) ঘরে মদ তৈরীর পুরাতন পদ্ধতিকে উচ্ছেদ ক'রে দেওয়া, (৮) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন, (৯) অন্য ধর্মের সঙ্গে আদিবাসীর

(10) The aborigines should form part of the civilized communities of our country not for the purpose of swelling the figures of this religion or that, but to share with the advanced communities the privileges and duties on equal terms in the general social and political life of the country"—A. V. Thakkar (The Problem of Aborigines).

উপজাতীয় ধর্মের সংস্পর্শ এবং (১০) আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন বাইরের সঙ্ঘের উদ্যোগে সংস্কারমূলক আন্দোলন। (১)

প্রথম শ্রেণীর আদিবাসী অর্থাৎ অভিজাত সমাজ সংখ্যায় খুবই কম। এদের ওপর অপরের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ জয়লাভ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দুত্ব প্রভাবিত মনোবলহীন আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, সংখ্যায় প্রায় দুই কোটি। তৃতীয় শ্রেণীর আদিবাসী সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে দূরান্তরিত, এই বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত সমাজের আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ।

প্রথম শ্রেণী সম্পর্কে কোন সমস্যা নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্যা হ'ল প্রকৃত আদিবাসী সমস্যা। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্যার রূপও পরস্পর থেকে বিভিন্ন, সুতরাং সমাধানের পদ্ধতিও বিভিন্ন হওয়া উচিত।

"যে দু' কোটি আদিবাসী (অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিবাসী) কোনরকম সভ্যতার সংস্পর্শে ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে, তারা নিকট ভবিষ্যতে সেই সংস্কৃতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হবে। সুতরাং এই শ্রেণীর আদিবাসীর সমস্যা ভারতের অন্যান্য চাষী সমাজের সমস্যা থেকে খুব বেশী পৃথক নয়।......এটা ভারতের সাধারণ পল্লী উন্নয়নের সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।......এই দু' কোটি অর্ধ-সভ্যতাসম্পন্ন আদিবাসীকে ভারতের সাধারণ জনসমাজের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করতে হবে।" (২)

প্রকৃত সমস্যা হ'ল তৃতীয় শ্রেণীর আদিবাসীকে নিয়ে। এদের সভ্য করা বা 'উন্নয়ন' করার চেষ্টা ভ্রান্ত পথ, সেটা করলে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এদের সমস্যা সমাধানের পথ হ'ল 'ন্যাশনাল পার্ক প্রতিষ্ঠা'। এই ৫০ লক্ষ বন্য আদিবাসীর জীবনে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না ক'রে তাদের বিষয় সম্পূর্ণভাবে তাদেরই হাতে ছেড়ে দিতে হবে। গভর্ণমেণ্ট শুধু এক একটি বন্য অঞ্চলকে 'সম্পূর্ণ আদিবাসী এলাকা' রূপে নির্দিষ্ট ক'রে দেবেন, যেখানে আদিবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে

---

(1) Loss of Nerve—Elwin.

(2) The Aboriginals—Elwin.

তাদের খাঁটি উপজাতীয় সংস্কার ও প্রথা নিয়ে অবাধভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

ডাঃ এস. জি. ঘুর্য্যেঃ আদিবাসী সমাজ ঐতিহাসিক সত্য অনুসারে ভারতীয় সমাজ। ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুসারে আদিবাসীরা হ'ল প্রায়-হিন্দু সংস্কৃতির মানুষ। বর্তমানের অশিক্ষিত, দরিদ্র ও পীড়িত আদিবাসী সমাজ ভারতের কোটি কোটি দুঃস্থ কৃষকসমাজের মতই; জমিদার, মহাজন, সরকারী কর্মচারী ও আইন দ্বারা শোষিত আদিবাসী সমাজকে 'অবনত হিন্দু'ই (Backward Hindu) বলা যেতে পারে। আদিবাসীদের প্রত্যেকটি সমস্যা বিচার করলে দেখা যায় যে, এঁদের অর্থনৈতিক সমস্যা হ'ল সাধারণ ভারতীয় কৃষকের অথবা গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা হ'ল হিন্দু সংস্কৃতির সমস্যা। (৩)

'বহির্ভূত এলাকা' সৃষ্টি ক'রে অথবা 'ন্যাশনাল পার্ক' সৃষ্টি ক'রে কৃত্রিম উপায়ে আদিবাসীর সমস্যা সমাধান করা যায় না। ভারতের সাধারণ সমস্যার অংশ হিসেবেই আদিবাসীর সমস্যার সমাধান করলে সেটাই সর্বোত্তম সমাধান হবে। (৪)

কয়েকজন বিশেষজ্ঞের যে অভিমত উল্লিখিত হ'ল, তা থেকে আদিবাসীদের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে প্রধানতঃ দু'রকমের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। একদল বিশেষজ্ঞকে বলা যায়—স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist)। এঁরা মনে করেন, ভারতের সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের ক্ষতি

---

(3) The main problem of the aborigines, therefore, is very similar to the problems of non-aboriginal agriculturists.—Ghurye (The Aborigines —'So-called'—And their Future.)

(4) It is, therefore, best tried to be solved along with the general problems. The obvious method of artificially segregating the so-called aborigines may prove to be a retrograde step rather than a solution affording scope for progress.—Ghurye.

হয়েছে, সুতরাং আদিবাসী সমাজকে স্বতন্ত্রভাবে থাকবার একটা ব্যবস্থা করা বিধেয়। বিশেষ ক'রে ইংরাজ অফিসার বিশেষজ্ঞ এবং কতিপয় ইংরাজ নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের এই অভিমত।

আর একদল বিশেষজ্ঞকে বলা যায়—সংমিশ্রণবাদী (Assimilationist)। এঁরা মনে করেন, সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের উন্নতি হয়েছে এবং যাতে আদিবাসী এই সভ্য সমাজের সজীব অঙ্গ হিসাবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ ক'রে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষ ক'রে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক, সমাজ সংস্কারক ও কংগ্রেসের জাতীয় নীতি এই অভিমতের সমর্থক।

উপজাতীয়-সমাজ-সংহতি

উপজাতীয় আদিবাসী সমাজের সংহতি আগের তুলনায় কোথাও ভেঙে পড়েছে, কোথাও ভেঙে যাচ্ছে। সামাজিক সংহতি ভেঙে পড়বার ব্যাপারে প্রথম দু'টি কারণ হ'ল—(১) হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া; (২) খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা।

এই দু'টি ব্যাপারকে ঠিক আক্রমণমূলক ঘটনা বলা যায় না। কোন আইনের জোরে নয়, বাধ্যতামূলক নির্দেশ বা রেগুলেশনের জোরে নয়, আদিবাসী সমাজের বহু গোষ্ঠী বা দল স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণেই সংস্কৃতিগত টানে হিন্দু সমাজে স্থান গ্রহণ করেছে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে নীচ জাতের ঠাঁই গ্রহণ করেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার দরুণ তারা আর্থিক বিষয়ে বা শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে আগের তুলনায় দীন হয়েছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়ে থাকলে অন্য কারণে হয়েছে, হিন্দু সমাজভুক্তির জন্যে নয়।

ঠিক তেমনি যে সব আদিবাসী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারাও আর্থিক বা অন্যান্য বিষয়ে হীনতর হয় নি। ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ ক'রে তারা একটা ভিন্ন সমাজে পরিণত হয়েছে, ব্যক্তিগত ভাবে কোন হানি হয় নি।

উল্লিখিত এই দু'টি সমাজান্তরের প্রক্রিয়া একটা গর্হিত ব্যাপার অবশ্যই নয়। কিন্তু এর ফলে উপজাতীয় সমাজের ভাঙন সম্ভব হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে এসে উন্নত হবার মত ব্যাপার। যারা চলে এল, তারা 'উন্নত' হ'ল ঠিকই; কিন্তু গ্রাম অবনত ও দীনতর হয়ে রইল। সুতরাং এই দু'টি প্রক্রিয়াকে বলতে পারা যায়, ব্যক্তিগত উন্নতির ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। বহু আদিবাসী নিজ উপজাতীয় সমাজ ছেড়ে দিয়ে হিন্দু বা খৃষ্টানরূপে 'উন্নত' হয়েছে, তার ফলে উপজাতীয় সমাজের সংহতি ও শক্তি অনেকখানি অবনত হয়েছে।

কিন্তু আসল হানিকর ব্যাপার হ'ল ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি। উপজাতীয় সমাজের সংহতিকে যদি সত্যি সত্যি কেউ বিনষ্ট ক'রে থাকে, তবে সেটা করেছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট। ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি উপজাতীয় সংসারে নিছক ভাঙনের

নীতি নিয়েই প্রবেশ করেছিল। কিছু গড়ে তোলবার, উন্নত করবার, এমন কি, পরিবর্তন করবারও কোন নীতি ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতিতে ছিল না। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া আদিবাসীর সমাজ-জীবনে শুধু পুরাতন উপজাতীয় ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েই এসেছে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার যে সব ক্রিয়াকলাপ আদিবাসীর উপজাতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ওপর আঘাত দিয়েছে, সেগুলি হ'ল—

(১) ব্রিটিশের কর সংগ্রহের পদ্ধতি

(২) ব্রিটিশের পুলিশী পদ্ধতি

(৩) ব্রিটিশের বিচার পদ্ধতি।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উক্ত তিনটি পদ্ধতিই হ'ল কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি। দূর সহরে বা রাজধানীতে এই সব ব্যাপারের শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত। আইন ও এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা এই কেন্দ্র থেকে চালিত হয়ে উপজাতীয় সমাজের ওপর কর্তৃত্ব করছে। কেন্দ্রীভূত এই সব শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটা কি? উপ-জাতীয় সমাজকে সাহায্য করা বা উন্নত করা নিশ্চয় নয়। উপজাতীয়দের রুচি ও মনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব ব্যবস্থা করা হয় নি। এটা বাইরে থেকে চাপানো, বাইরের মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং বাইরের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পিত একটা শাসনব্যবস্থা। উপজাতীয়কে সাহায্য করার জন্য নয়, উপজাতীয়েরা যাতে এই শাসনব্যবস্থাকে সাহায্য করে, তারই জন্য সমস্ত বিধানগুলি রচিত। সুতরাং উপজাতীয় সমাজ নিজে ভেঙে যেতে বাধ্য হয়েছে। নিজে ভেঙে গিয়ে বাইরের থেকে চাপানো একটা ব্যবস্থাকে তারা অটুট রেখে চলেছে। আদিবাসীর গোষ্ঠী পঞ্চায়েৎ শক্তিহীন হয়ে গেল, গোষ্ঠী সর্দার তুচ্ছ হয়ে গেল। শ্রদ্ধাস্পদ গোষ্ঠী সর্দারের চেয়ে উর্দিপরা ও পাঁচ টাকা মাইনের চৌকীদার আদিবাসীর ওপর ঢের বেশি প্রভুত্বের অধিকারী হ'ল। এল দারোগা ও তহশীলদার, আদিবাসীর সমাজের ওপর অগাধ প্রভুত্বের সুযোগ নিয়ে। পঞ্চায়েতের অধিকার লুপ্ত হয়ে গেল, সামান্য একটা মুর্গী নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করতে আদিবাসী বাদী ও বিবাদীকে সহরে এসে উকীলবাবুর আর আদালতের শরণ নিতে হ'ল।

এর মধ্যে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার যোগ্য। ব্রিটিশ শাসনে, উপজাতীয়ের গোষ্ঠী পঞ্চায়েৎ যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি সাধারণ ভারতবাসীর গ্রাম পঞ্চায়েৎও নষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা এবং বৈদেশিক উগ্রতার ফলে সাধারণ ভারতবাসী এবং আদিবাসী উভয়েরই স্বয়ংচালিত আত্ম-শাসনের 'সাধারণতন্ত্র' নষ্ট হয়েছে। উপজাতীয় সমাজের সংহতি বিনষ্ট হওয়া, উপজাতীয়দেরই বিশেষ দুঃখ নয়। এটা সাধারণ গ্রামীন ভারতের দুঃখ। সুতরাং আদিবাসীর এই সমাজ-সংহতির সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই। এটাও নিখিল ভারতীয় সমস্যা এবং সারা ভারতবর্ষের গ্রামীন মানুষের পঞ্চায়েৎ প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হবে, আদিবাসী সমাজের সমস্যারও সেই সঙ্গে সমাধান হয়ে যাবে।

জঙ্গল সমস্যার কথাই ধরা যাক্। আদিবাসীরা অরণ্য অঞ্চলে থাকে; সুতরাং জঙ্গলের ওপর তাদের অধিকার এবং জঙ্গলের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে আদিবাসীর উন্নতি বা অবনতির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হ'ল, এই জঙ্গল সমস্যা নিছক আদিবাসীর সমস্যা নয়, এটা ভারতের গ্রামবাসী সকল মানুষের সমস্যা। ব্রিটিশ বন-নীতি ও আইনের জন্য যেমন অরণ্যবাসী আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সাধারণ গ্রামবাসী ভারতীয়ও ঠিক সেই পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে।

সমস্যাটির আর একটি দিক আছে। আদিবাসীদের দাবী মেনে নিয়ে এবং তাদেরই ভাল'র জন্য যদি বন-নীতি স্থির করা হয়, তাহলেই ন্যায় বিচার হয় না। এমন আদিবাসী গোষ্ঠী আছে যারা বনকে অল্পদিনে উচ্ছেদ ক'রে, বেপরোয়া বনের পশু সংহার ক'রে অথবা বন পুড়িয়ে ঝুম চাষ ক'রে জীবন নির্বাহ করতে চায়। কিন্তু এই বনের পাশেই হয়তো কৃষিপ্রবণ সাধারণ ভারতবাসীর গ্রাম আছে, বনের ভালমন্দের ওপর তাদের ভালমন্দ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বনকে উচ্ছেদ করার সুযোগ দিয়ে আদিবাসীর মঙ্গল করতে গিয়ে ভারতীয় গ্রামবাসীর অর্থ-নৈতিক জীবনের ক্ষতি করা কি উচিত? এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক

ভারতবাসী ও অ-কৃষক আদিবাসীর স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রশ্ন, এক্ষেত্রে কার স্বার্থ দেখতে হবে ?

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জঙ্গল সংরক্ষণের (Reserve) নীতি যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে আদিবাসী ও সাধারণ ভারতবাসী উভয়েরই ক্ষতি হয়েছে। আদিবাসী যেমন জঙ্গলে ইচ্ছামত শিকার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তেমনি গ্রামের ভারতীয় কৃষকও জঙ্গলে গরু চরাবার সুযোগ, শুকনো পাতা কুড়োবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসন ব্যবস্থার সমস্ত নীতির মত বন-নীতির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য আছে—নিষেধমূলক নীতি। বনকে সংরক্ষণ ক'রে বনবাসী এবং গ্রামবাসী উভয়ের অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হ'ল। কিন্তু গ্রামবাসী বা আদিবাসীর ওপর বন সৃষ্টি বা উন্নত করার কোন কর্তব্য দেওয়া হ'ল না। গঠনমূলক কোন নীতি—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মস্তিষ্কের মধ্যে স্থান লাভ করে নি। তাঁরা শুধু নিষিদ্ধ করতে জানতেন। বনের ওপর জনসাধারণের যেমন ভোগ করবার অধিকার থাকবে, তেমনি বনকে সংরক্ষণ ও উন্নত করবার দায়িত্বও জনসাধারণের ওপর থাকবে—গভর্ণমেণ্টের নীতি এইভাবে নির্দিষ্ট ও পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট শুধু নিষিদ্ধ করতেই জানেন। বনের ওপর জনসাধারণের ভোগের অধিকার নিষিদ্ধ করা হ'ল কিন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারে জনসাধারণকে কোন কর্তব্যে উৎসাহিত করা হ'ল না। গভর্ণমেণ্টের বন-নীতির ত্রুটি রাজকীয় কৃষি কমিশনের মন্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। "গ্রামের পাশে বনকে গ্রামের লোকের স্বার্থের জন্য গ্রামের লোকদের দ্বারাই তত্ত্বাবধান করালে তার দ্বারা এত রকম ভাল কাজ হতে পারে যে, এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করার জন্য সকল রকম চেষ্টা করা উচিত।" (১)

(1) "The management by the people, for the people, of the forests close to their villages, possess so many desirable feature that every effort should be made to ensure its success"—Royal Commission on Agriculture in India, Report.

বন সম্পর্কে যে সমস্যার কথা বিবৃত করা হ'ল, তার মধ্যে এই ক'টি বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বন-নীতি সাধারণ গ্রামবাসী ভারতীয় ও উপজাতীয় আদিবাসী উভয়েরই অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে। এই দিক দিয়ে উভয়ের সমস্যা একই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, বন সম্পর্কে গোঁড়া উপ-জাতীয় দাবী এবং ভারতীয় কৃষক গ্রামবাসীর দাবী, ঠিক এক নয়, বরং পরস্পর-বিরুদ্ধ।

এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পরিষ্কার পথটি হ'ল—বনের ও বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে প্রধান লক্ষ্য রেখে, বন-নীতি নির্ধারিত করা। বিশেষ কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর অ-কৃষকোচিত সংস্কারকে তুষ্ট করতে গিয়ে বন নষ্ট করার সুযোগ দেওয়া যায় না। আদিবাসীকে কৃষিতে উৎসাহিত করা, এবং বন সংরক্ষণে ও পরিচালনায় ভারতীয় ও আদিবাসী কৃষক সমাজের ওপর দায়িত্ব নির্দেশ করা —বন-নীতির মধ্যে এই দু'টি ব্যবস্থা আবশ্যক। কোন জমিদার, ঠিকাদার, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থের জন্য নয়, বন-সম্পদকে সমগ্র ভারতের জাতীয় ঐশ্বর্যরূপে স্বীকার ক'রে নিয়ে বনশাসনের ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। বনের উন্নতি আদিবাসী সমাজেরই উন্নতি।

মজুরী সমস্যার বিভিন্ন দিক্

পূর্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে মজুরিগিরিও জীবিকা হিসেবে স্থান লাভ করেছে। নানা শ্রেণীর মজুররূপে আদিবাসীকে দেখা যায়। টাটানগরের ইস্পাত কারখানায়, কয়লার খনিতে, চা বাগানে এবং পাব্লিক ওয়ার্কসের সড়ক তৈরীর জন্য পাথর বিছানোর কাজে। এদের সমস্যা সাধারণ সমজীবিকাসম্পন্ন ভারতীয় মজুরের সমস্যার মতই।

তাছাড়া আদিবাসীদের মধ্যে ক্ষেতমজুরও আছে। এই ক্ষেতমজুর প্রথা আজকের দিনের নতুন প্রথা নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু অতীত থেকেই ক্ষেত মজুরের আবির্ভাব হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বেও এরা ছিল এবং এখনও

াছে। মজুরীর বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কাজ করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু জুরগিরি করতে বাধ্য করা একটা অসঙ্গত প্রথা নিশ্চয়। ভারতবর্ষে দূর অতীত থকে বাধ্যতামূলক মজুরগিরির (Compulsory Labour) (২) প্রথা চলে াসছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক বলেই যে ব্যাপারটি সমূহভাবে নিন্দনীয় তা নয়। দখতে হবে, কি উদ্দেশ্যে এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ছিল। জনপদের সকলের ন্য ইস্টাপূর্তের কাজে যদি সকলকে কিছু কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেটা ঠিক যত্যাচারের দৃষ্টান্ত বলে ধরা যায় না। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বাপী, কূপ, ড়াগ ও পথ নির্মাণে প্রাচীন ভারতের গ্রামপঞ্চায়েৎ সকলকে কাজ করতে বাধ্য করতো। এটা হওয়াই উচিত, এটাকে সেবাকার্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলা যেতে পারে।

কিন্তু জনমঙ্গলের ব্যাপার ছাড়া যেটা নিতান্ত ব্যক্তিস্বার্থের ব্যাপার সেখানে বাধ্যতামূলক মজুরগিরির প্রথা নিশ্চয় নিন্দার্হ। প্রাচীনকালেও ভারতের ভূস্বামী-বর্গ যে তাঁদের প্রজাদের এইভাবে জোর ক'রে খাটাতে বাধ্য করতেন না, একথা বলা যায় না। এটাই গর্হিত ব্যাপার এবং এই ব্যাপার আজও চলে আসছে। এই বাধ্যতামূলক মজুরগিরির প্রথাই বেগার, বেথি ইত্যাদি নামে পরিচিত। বর্তমানের জমিদার থেকে আরম্ভ ক'রে সরকারী কর্মচারিবৃন্দ আদিবাসী প্রজাকে এইভাবে জোর ক'রে খাটতে বাধ্য ক'রে থাকেন। আইনে এই প্রথা নিষিদ্ধ থাকলেও কার্যতঃ এবং প্রথা হিসাবে এটা চলে আসছে। বোম্বাই প্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ক'রে মিঃ সিমিংটন যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে তিনি আদিবাসীকে জোর ক'রে কাজ করাবার গর্হিত প্রথাটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। জোর ক'রে কাজ করানো, কাজ না করলে মারধর করা এবং মজুরী

---

(২) "Compulsory Labour in the interest of the village community has been in existence, in some form or other, in nearly every part of India."—John Matthai (Village Government in India).

দৈনিক এক আনা মাত্র। (৩) মিঃ সিমিংটন আরও অভিযোগ করেছেন যে, জমিদারেরা শুধু আদিবাসী প্রজাকে মজুরগিরি করতে বাধ্য ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, তাদের কাম-লালসা চরিতার্থ করতে আদিবাসী নারীকেও বাধ্য করে।

জোর ক'রে কাজ করাবার যে উদাহরণ দেওয়া হ'ল, সেটা কিন্তু একমাত্র আদিবাসী প্রজারই দুঃখ নয়। এটা ভারতের গরীব প্রজাসাধারণের দুঃখ ভারতের বহু অঞ্চলে ভারতীয় প্রজাকে জমিদার বা সরকারী কর্মচারীর স্বার্থের জন্য কাজ করতে বাধ্য করানো হয়। গতর খেটে জমিদারের খাজনা শোধ ক'রে দেবার প্রথাও আছে। দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও গরীব ভারতীয় প্রজা এবং আদিবাসী প্রজা উভয়ের সমস্যা এক। উভয়েই একই শোষণপ্রথার বলি। সুতরাং আদিবাসী সমাজের এই সমস্যা ভারতীয় সমস্যারই একটি অংশ।

আদিবাসীদের মধ্যে আর এক ধরণের মজুরগিরি আছে—চুক্তিবদ্ধ শ্রম (Bonded Labour)। চলতি কথায় এর নানারকম নাম আছে। ছোটনাগপুরে বলে কামিয়ৌতি, উড়িষ্যায় বলে গোঠি ইত্যাদি। এই প্রথা বস্তুতঃ ক্রীতদাস প্রথা। জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গরীব প্রজা বা খাতক খেটে শোধ করার জন্য প্রতিশ্রুত থাকে। কিন্তু ঋণের হিসেবে এমনই জুয়াচুরির খেলা চলতে থাকে, বছরের পর বছর খেটে গেলেও খাতকের ঋণ শোধ হয় না। এই কামিয়া বা খাতক মরে গেলে, তার ছেলে এই ঋণ শোধ করার জন্য দায়ী হয়। পুরুষানুক্রমে এই দাসমজুরগিরি চলতে থাকে।

এই কামিয়ৌতি বা গোঠী প্রথাও নিছক আদিবাসী সমাজের দুঃখ নয়। গরীব ভারতীয় প্রজাও অভাবে পড়ে জমিদার ও মহাজনের কাছে এইভাবে আত্মবিক্রীত

(3) "All jungle tract tenants are liable to be called upon to work for their landlords. This forced labour is demanded for as many days as are necessary for the landlord's requirements. If they refuse or procastinate they are liable to assault or beatings...The maximum remuneration of forced labour is one anna per diem. More often rice is given, barely sufficient for one man for one meal."

সাধারণতঃ নিম্নজাতের হিন্দু বিয়ে করার জন্য কন্যাপণ সংগ্রহের চেষ্টায় বা
ন্য কোন সামাজিক কাজের জন্য থোক টাকার অভাব অনুভব ক'রে থাকে, এবং
ই সময় ধার করতে বাধ্য হয়। ভারতীয় কৃষি কমিশনে (Royal Com-
ission on Agriculture in India) মন্তব্য করেছেন যে, এই দাসমজুরেরা
ইন সম্বন্ধে অজ্ঞ বলেই এত দুর্ভোগ ভুগে থাকে। কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে
ন আছে। দাসমজুর খুব ভাল ক'রেই জানে যে, সরকারী আইনে এই ধরণের
াষণের প্রশ্রয় নেই। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? দাসমজুর জানে, এই
ইনের সাহায্য নিয়ে তার আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। আদালতে মামলা করার
চ তার সামর্থ্য নেই এবং জমিদার বা মহাজনের শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা করারও
র সামর্থ্য নেই। প্রতিবাদ করলে কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। আত্ম-
ার জন্য থানা পুলিশ উকীল আদালত—এ সব ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হলে যে
রিমাণ পয়সা খরচ করতে হয়, সে সঙ্গতি তার নেই। এই জন্যেই সে নিষ্ক্রিয়,
াদৌ অজ্ঞতার জন্যে নয়।

কিন্তু আদিবাসী দাসমজুরের সম্বন্ধে রাজকীয় কৃষি কমিশনের মন্তব্য অনেক-
নি সত্য। আদিবাসীরা সত্যিই আইন সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। সুতরাং তারা
রও বেশী শোষিত এবং অত্যাচারিত হয়।

জমিদার, মহাজন এবং সরকারী কর্মচারী—এই তিনের উদ্যোগেই দাসমজুর
থা চলছে। এর বিরুদ্ধে আইন কাগজে কলমে থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে তার
ান প্রয়োগ নেই। বরং একটি বীভৎস ঐতিহ্যরূপে এই প্রথাটি উদাসীন
ভর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে চলে আসছে।

আদিবাসীর সাংস্কৃতিক সমস্যা

ভারতের আদিবাসী সমাজের ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা কর্ হয়েছে। এখন প্রশ্ন, আদিবাসীদের ভাষার স্থায়িত্ব, উন্নতি ও উৎকর্ষ ইত্যা বিষয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে তার সমাধানের উপা বা কি?

আদিবাসীদের ভাষা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করা যায়:—এদের ভাষা হ'ল ক কথিত ভাষা। লিখিত ভাষা নয়, অর্থাৎ ভাষাকে লিপিবদ্ধ ক'রে রূপ দেবার ম কোন অক্ষর আবিষ্কৃত হয় নি। উপজাতীয় ভাষা আছে, কিন্তু উপজাতীয় অক্ষর লিপি নেই।

খৃস্টান মিশনারীরা প্রথম উপজাতীয় আদিবাসীদের ভাষাকে লিখিতভাবে র দেবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাঁরা রোম্যান অক্ষরকেই গ্রহণ করেছেন। কে কোন উপজাতীয় ভাষার একটা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াসও মিশনারী সম্প্রদা করেছেন। বাইবেল প্রচার করার জন্যই প্রধানতঃ মিশনারী সম্প্রদায় উপজাতি ভাষার জন্য এই উৎকর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ১৮৬৬ সালেই স্যার রিচার্ড টেম্পল এই অভিমত প্রকাশ ক'রে গেছে যে, আদিবাসীদের ভাষার জন্য দেবনাগরী অক্ষরই প্রকাশভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি তিনি বলেছেন, রোম্যান অক্ষরে গন্দি ও অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাকে রূপ দেও সম্ভব হলেও দেবনাগরী অক্ষর এ বিষয়ে বেশী উপযুক্ত। (১)

আর একটা কথা। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে আদিবাসীরা প্রধানতঃ দ্বি-ভা (Bilingual)। একটি তাদের নিজস্ব উপজাতীয় ভাষা, পারিবারিক জীব উপজাতীয় ভাষা তারা ব্যবহার করে। কিন্তু বর্তমান বৈষয়িক জীবনে বৃহ সমাজের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হওয়ায় আদিবাসীরা আর একটা সমতল প্রদে ভাষায় (হিন্দী, তেলেগু, বাঙালা ইত্যাদি) সমান দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে শিখেছে

---

(1) Aboriginal Tribes of the Central Provinces—Hislop.

অবস্থায় আদিবাসীরা যদি লেখাপড়ার ব্যাপারে রোম্যান অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত
{ক, তবে হিন্দী, তেলেগু এবং বাঙলা ইত্যাদি উন্নত সাহিত্য তাদের কাছে
হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ যদি নিজস্ব উপজাতীয় ভাষার জন্যই দেবনাগরী বা
ঞ্চলিক উন্নত ভাষার (বাঙলা, তেলেগু ইত্যাদি) অক্ষর তারা গ্রহণ করে, তবে
ই সঙ্গে দু'টি উপকার তাদের কাছে সুলভ হয়ে উঠতে পারে। নিজস্ব উপজাতীয়
ষাকে লিপিবদ্ধ করতে পারবে এবং আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও প্রবেশ সহজ
ব। আদিবাসীদের মত সঙ্গতিহীন সমাজের পক্ষে এক সঙ্গে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন
ণের অক্ষর প্রণালী শেখবার চেষ্টা বস্তুতঃ আদিবাসীকে বিড়ম্বিত করা। সাধারণ
রতবাসীর ছেলে তার মাতৃভাষায় একটিমাত্র অক্ষর প্রণালীর সাহায্যে বিদ্যারম্ভ
কিন্তু আদিবাসী ছেলেকে দুই ধরণের অক্ষর প্রণালীর দ্বারা অত্যাচার
া কি উচিত?

ষ্টান মিশনারীরা বলবেন, একটি মাত্র অক্ষর প্রণালীই হোক্, কিন্তু সেটা
ব রোম্যান অক্ষর। কিন্তু এর ফলে আদিবাসী মানুষ তার হিন্দী, বাঙলা,
তলেগু প্রভৃতি একটি আঞ্চলিক ভাষার দক্ষতা সত্ত্বেও সেই ভাষার সাহিত্য
ত বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ একটা উন্নত ভাষা আয়ত্ত ক'রেও সেই ভাষার
ংস্কৃতিক শক্তি তার কাছে অনায়ত্ত হয়ে থাকবে, পড়তে না পারার জন্য। অথচ
ই আঞ্চলিক ভাষা তার জীবনের প্রতি পদে প্রয়োজন। হাটে, ঘাটে, মাঠে,
জারে, আদালতে, সভা মঞ্চে, আইন পরিষদে—সর্বত্র আদিবাসীকে তার বক্তব্য
ভাব প্রকাশের জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এই আঞ্চলিক
ষাকে মুখে মুখে ও মনে মনে শিখেও, শুধু অক্ষর পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়ে কেন
তার শিক্ষাকে অপূর্ণ করে রাখবে?

চিরকাল ইংরাজ শাসন, ফরাসী শাসন বা জার্মান শাসন যদি ভারতবর্ষে থাকে,
ব ইংরাজী, ফরাসী বা জার্মান ভাষা অবশ্য সরকারী ব্যাপারে প্রধান ভাষা হয়ে
বে এবং সে ক্ষেত্রে রোম্যান অক্ষরে পরিচিত হবার একটা সার্থকতা আছে।

কিন্তু সে রকম বৈদেশিক শাসন তো কোন দেশের পক্ষে সনাতন রীতি নয়
স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য ঘুচে যা
তা ছাড়া ইংরাজী ভাষা শিখে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবার সম্ভাবনা ক'জন আদিবাসী
ছিল? খুব অল্প সংখ্যক? সুতরাং অল্পসংখ্যক ভাবী সরকারী কর্মচারী
জন্য সমগ্র জনশিক্ষার বিষয় ইংরাজী অক্ষরে (অর্থাৎ রোম্যান অক্ষরে) পরিচাল
করার কোন অর্থ হতে পারে না। আদিবাসী জনসাধারণের পক্ষে হাটে বাজা
ভারতীয় ভাষা প্রয়োজন। সুতরাং আদিবাসীদের জন্য কোন ভারতীয় ভাষ
অক্ষরই গ্রহণ করার বস্তু। ভারতীয় ভাষার অক্ষর গ্রহণ করলে, যেমন উপজাতি
ভাষার সাহিত্যরচনা লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত করা সহজসাধ্য হবে, তেমনি আঞ্চলি
ভাষার সাহিত্যেও দখল সহজতর হবে। এর ফলে উভয়ের উন্নতি। আদিবাসী
নিজস্ব উপজাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ এবং ভারতীয় সাহিত্যে আদিবাসী
লেখক ও চিন্তাশীলের দান সম্ভব হবে।

আদিবাসী সমাজের প্রত্যেক উপজাতীয় ভাষা এক একটা সমৃদ্ধ ব্যঞ্জনাপ্র
ভাষা নয়। অধিকাংশ ভাষাই শত শত অপভ্রংশে পরিণত। একই গন্দি
সাঁওতালী ভাষা জেলায়-জেলায় জঙ্গলে-জঙ্গলে উপত্যকায়-উপত্যকায় স্থানী
বৈশিষ্ট্য এবং বিকৃতি অনুসারে পরস্পর থেকে অল্প বিস্তর পৃথক। সিংভূম জেলা
আদিবাসীদের মধ্যে নয়টি উপভাষা (dialect) প্রচলিত। আদিবাসী সমাজে
সুদীর্ঘ ইতিহাসে তাদের ভাষাগত বিপর্যয়ের বহু ঘটনা হয়ে গেছে। কোন কো
গোষ্ঠী তার আদি ভাষাটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বা বর্জন ক'রে নতুন একটি উপ
জাতীয় বা ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করেছে। ভাষায় ভাষায় সংমিশ্রণ হয়ে বহু সং
ভাষার উদ্ভব হয়েছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এই সব
ভাষাগুলি নিতান্ত দুর্বল ভাষা। এই দুর্বলতার কারণ প্রধানতঃ হ'ল, ভাষীদে
সংখ্যাল্পতা, অল্প সংখ্যক মানুষের মুখে কথিত হয়ে কোন ভাষা বড় হয়ে উঠতে
পারে না। বরং দিন দিন সে ভাষার শক্তি ও ভাবপ্রকাশের সামর্থ্য কমে আসতে
থাকে। কিন্তু দেখা গেছে ভাষা জিনিসটা দুর্মর। এই দুর্বল অপভ্রংশবহু

ভাষাগুলি লুপ্ত হতে বহু সময় নেয়। অকেজো হয়েও এই দুর্বল উপভাষাগুলি
ক আছে। মাত্র সাঁওতালী, গন্দি প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতীয় ভাষা, ভাষীদের
ধ্যাগুরুত্বের জন্য ভালভাবেই বেঁচে আছে। ১৯২১ সালের সেন্সাস কমিশনার
: ট্যালেণ্টস আরও স্পষ্ট ক'রে এই মন্তব্য করেছেন যে—"এই সব অপরিণত
ঃসৃষ্ট কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে এমন কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই যা সংরক্ষণ ক'রে
খার যোগ্য। সমতল প্রদেশের বেশী ঐশ্বর্যপূর্ণ সাধারণ ভারতীয় ভাষাগুলির
ধ্যে এই সব উপজাতীয় ভাষা মিশে লুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য এবং সেজন্য দুঃখিত
বার কোন কারণ নেই। (২)

মিঃ গ্রীগসন বলেন—"উপজাতীয়েরা নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেললে এই একটা
াভ অবশ্যই হয় যে, তাদের লেখাপড়া শেখবার সমস্যাটি সহজে সমাধান করা
ম্ভব হয়। (৩)

মিঃ সিমিংটন ভীলদের শিক্ষা সমস্যা আলোচনা ক'রে এই মন্তব্য করেছেন যে,
ীলি অথবা অন্য কোন উপভাষায় তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করাই উচিত। মিঃ
সিমিংটন কোন ভারতীয় ভাষাতেই ভীলদের শিক্ষা বিধানের সার্থকতা সমর্থন
রেন। কারণ উপভাষাগুলির দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা সম্বন্ধে মিঃ সিমিংটন যথেষ্ট
চেতন। এক তালুক থেকে কিছু দূরে আর একটি তালুকে গেলেই উপভাষা-
লির পরস্পরের মধ্যে মাত্রাহীন পার্থক্যের রূপটা উপলব্ধি করা যায়। এখানে
ক রকম ওখানে আর একরকম। এ ভাষাগুলি বস্তুতঃ ভাষাই নয়। বলতে
গেলে বলা যায়, কতগুলি 'বাক্যের বিকৃতি।' (৪)

---

(2) "There is nothing that is worth preserving in these rudimentary ndigenous tongues, and their inevitable absorption in the more copious ngua franca of the plains is not at all to be regretted"—Tallents. (Census India, 1921).

(3) Notes on the Aboriginal Problems in the Mandla District.

(4) "These dialects besides varying from taluka to taluka, are so far as an ascertain, merely corruptions of good speech."—D. Symington. eport on the Aboriginal & Hill Tribes of the Partially Excluded Areas the Province of Bombay, 1940).

তবে মিঃ সিমিংটন প্রস্তাব করেছেন যে, যে সব শিক্ষক আদিবাসী সমাজে ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করবেন, তাঁরা যেন স্থানীয় আদিবাসীর উপজাতীয় ভাষা বা উপভাষা সম্বন্ধে পারদর্শী থাকেন। উড়িষ্যার আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল সম্বন্ধে তদন্ত কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও মন্তব্য করা হয়েছে যে—"খন্দমাল, গঞ্জাম, কোরাপুট প্রভৃতি আদিবাসী অঞ্চলে স্কুলের শিক্ষকেরা অবশ্য উড়িয়া ভাষাতেই আদিবাসীকে শিক্ষাদান করেন, কিন্তু শিক্ষকদেরও স্থানীয় আদিবাসীর ভাষা সম্বন্ধে সম্যকভাবে পারদর্শী হতে হবে"।

আদিবাসীদের উপজাতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য, গুণ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেকে প্রশংসার উচ্ছ্বাস দেখিয়ে থাকেন। যেমন, মিঃ এলুইন। গন্দি ভাষায় কতগুলি লোক-সঙ্গীত ও গাথা অবশ্য আছে, সাঁওতালী ভাষায় অনেক ছড়া, গান, রূপকথা ও উপকথা আছে। সবই সত্যি। কিন্তু বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের তুলনায় এই সব উপজাতীয় ভাষার ঐশ্বর্য কতটুকু? শুনতে অনেকের খারাপ লাগলেও সত্য কথা হ'ল, এই সব উপজাতীয় ভাষা সাহিত্যগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে তেমন কিছুই নয়। সব চেয়ে বড় কথা হ'ল, বর্তমান যুগের উপযোগী নয়। এসব উপভাষা কয়েক হাজার বছর আগেকার আরণ্য জীবনের উপযোগী ভাষা। ভাষার যাদুঘর হিসেবে এই সব ভাষাকে সাজিয়ে রাখতে অনেকে ইচ্ছে করেন, কিন্তু সেটা হ'ল যাদুঘর দরদীর মনোবৃত্তি, আদিবাসী দরদীর মনোবৃত্তি নয়। আদিবাসীকে উন্নত করতে হ'লে, তাকে উন্নত ভাষার সুযোগ ও দীক্ষা দিতেই হবে।

"সিংভূমের আদিবাসী হো সমাজকে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্য বিষয়ে অনুন্নত হয়েও এই আদিবাসী সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করেছে।" (৫)

(5) A Tribe in Transition—D. N. Majumdar.

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর এমন অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন যে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করলে আদিবাসীর ক্ষতি হবে। হিন্দী ভাষা শিখে হো সমাজের কোন ক্ষতি হয় নি।

সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, ভাষা জীবনের কোন একটা লক্ষ্য নয়। একটা লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়, একটা পদ্ধতি। দেখতে হবে, আদিবাসীর জীবনকে উন্নতি করার জন্যই পদ্ধতি হিসেবে ভাষা ঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা। হিন্দী ভাষা শেখানো অর্থ হিন্দু সংস্কৃতিতে দীক্ষা দেওয়া নয়, অথবা আদিবাসী সংস্কৃতিকে লুপ্ত ক'রে দেওয়া নয়। হিন্দী ভাষাকে আদিবাসীর সংস্কৃতিগত জীবনের বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই অথবা আরও উন্নত করার জন্যই নিয়োজিত করা যায়। যাঁরা পরিবর্তন বিরোধী, একমাত্র তাঁরাই উল্টো কথা বলেন। কিন্তু আদিবাসী সামাজকে যাঁরা আধুনিক যুগের সমাজে পরিণত হতে দেখতে চান, তাঁরা অবশ্যই আদিবাসীদের জন্য যুগোপযোগী ভাষার সুপারিশ করবেন। হিন্দী ভাষার সাহায্যেই সুন্দর ও বিরাট 'সাঁওতালী সাহিত্য' রচিত হতে পারে। বাঙলা ভাষার সাহায্যেই বিশেষ একটি 'পাহাড়িয়া সাহিত্য' সৃষ্টি হতে পারে।

আদিবাসীর পক্ষে ভারতীয় ভাষা গ্রহণের প্রস্তাব একটা রাজনৈতিক অভিমত নয়। এর মধ্যে ভারতীয় করণের কোন আক্রমণমূলক নীতি নেই। এটা নিছক নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের অভিমত। একজন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক এ সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন দেখা যাক :

ডাঃ ম্যারেট তাঁর নৃতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে ভাষা অধ্যায়ে বলেছেন যে, উপজাতীয়দের সংস্কৃতিগত বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে যখন সভ্য প্রভুরা পরিবর্তন করতে চান, তখন তাঁদের পক্ষে একটু সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। আদিবাসীদের সংস্কৃতিগত বা সমাজগত বৈশিষ্ট্যের সবই বদলে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। যে সব উপজাতীয় ব্যবস্থা তাদের জীবনের উন্নতির পক্ষে হানিকর সেগুলিকে মাত্র অপসারিত করবার প্রয়াস আবশ্যক। হঠাৎ অথবা সব কিছু একদিনে বদলে দেবার চেষ্টা করলে

আদিবাসীদের মানসিক গঠনের সর্বনাশ করা হবে। কিন্তু সংস্কৃতিগত এই সূত্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে কথা সত্য, ভাষার ব্যাপারে সেটা সত্য নয়। উপজাতীয় ভাষা বদলে দিয়ে নতুন উন্নত ভাষা প্রচলিত করলে কোন ক্ষতি হবে না। (১)

লাঙল দিয়ে যে সাঁওতাল ক্ষেত চাষ ও শস্য উৎপাদন করে সেও কৃষক। আবার একজন রাজপুত বা ভূমিহার ব্রাহ্মণ যখন ক্ষেত চাষ করে, সেও কৃষক। কিন্তু সাঁওতাল কৃষক ও রাজপুত কৃষকের মধ্যে মনস্তত্ত্বগত প্রভেদ অনেকখানি। হিন্দী ভাষী রাজপুত কৃষক যে মনের অধিকারী, সাঁওতাল কৃষক সে ধরণের মনের অধিকারী নয়। একজন ভাষায় উন্নত, আর একজন ভাষায় অবনত। এক্ষেত্রে উভয়ের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবগ্রহণ ক্ষমতা ও জীবনে উন্নত হবার শক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য। এর প্রধান কারণ—ভাষাগত শক্তির তারতম্য।

আদিবাসী উপজাতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যই এবং বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক জীবনের পরীক্ষায় যোগ্য হবার জন্যই তাদের পক্ষে একটি উন্নত ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করা উচিত। ভারতীয় ভাষা আদিবাসীর পক্ষে নিতান্ত 'বৈদেশিক ভাষা' নয়। কারণ, ভারতীয় ভাষা যে সংস্কৃতির বাহন সেই সংস্কৃতি আদিবাসীর পক্ষে বৈদেশিক সংস্কৃতি নয়। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতি, উভয়ের ভিত্তি দূর অতীতের এক ঐতিহাসিক সম্পর্কে যুক্ত। আদিবাসী সংস্কৃতিকে প্রায় হিন্দু (Proto-Hindu) সংস্কৃতি বলা হয়েছে। সংস্কৃতিগত ঐতিহাসিক বনিয়াদ এক আছে বলেই, বর্তমানে ভাষাগত বনিয়াদ এক ক'রে দিলে কোন হানি হবে না।

(1) "Whereas it is the duty of the civilized overlords of primitive folk to leave them to their old institutions so far as they are not directly prejudicial to their gradual advancement in culture, since to lose touch with one's homeworld is for the savage to lose heart altogether and die; yet this consideration hardly applies at all to the native language. If the tongue of advanced peoples can be substituted, it is the good of all concerned."
—Dr. R. R. Marett ('Anthropology').

কংগ্রেস ও আদিবাসী

কংগ্রেসের আবির্ভাব ১৮৮৫ সালে। তখনকার 'রাজভক্ত' কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে যে সব বিষয়ে যতটুকু মুখ খুলে সমালোচনা করতেন এবং দেশ-হিতার্থে যে সব দাবী করতেন, তার মধ্যে আদিবাসীর স্বার্থের কথাটা একেবারে উপেক্ষিত হয় নি। ১৮৯১ সালেই কংগ্রেস প্রস্তাব (১০ম প্রস্তাব) গ্রহণ করে যে—'বনসংক্রান্ত আইনে দাক্ষিণাত্যে যে কঠোরতা অবলম্বিত হয় তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে।'

বনসংক্রান্ত আইনের কঠোরতা যে শ্রেণীর অধিবাসীকে পীড়িত করেছিল, তারা অধিকাংশই আদিবাসী, এটা অনুমান করা যেতে পারে। পর পর কয়েকটি বৎসরের কংগ্রেস অধিবেশনে বনসংক্রান্ত আইন ও তার প্রয়োগ রীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৯৩ সালের কংগ্রেসের প্রস্তাবে সুস্পষ্ট করেই বলা হয় 'বনসংক্রান্ত আইনে বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্য ও পাঞ্জাবের কোন কোন পাহাড়িয়া অঞ্চলে জনসাধারণের উপর অত্যন্ত অবিচার চলিতেছে।' পরবর্তী কয়েকটি অধিবেশনের প্রস্তাবে বন বিভাগের কর্মচারীদের আচরণের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা হয়।

এটা সত্য যে, কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ সে সময় যে স্তরে ছিল তাতে অবশ্যই তার মধ্যে আদিবাসীদের সম্বন্ধে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন বৃহত্তর আদর্শের দাবী করার মত চেতনা ছিল না। শুধু বনআইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই কংগ্রেস তখন কিছুটা যেন পরোক্ষভাবেই আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহের প্রমাণ দিয়েছিল। আবগারি আইন সম্পর্কে তখনকার কংগ্রেসের বহু প্রতি-বাদকেও পরোক্ষভাবে আদিবাসীর হিতরক্ষার প্রয়াস বলা যেতে পারে।

আদিবাসীদের সম্বন্ধে কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে একটা সামাজিক জাতীয় আদর্শ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে তার প্রথম প্রমাণ পাই ১৯০৩ সনের কংগ্রেসের ৯ম

প্রস্তাবে। বলা হয়, "বহুকাল হইতে রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও শাসননৈতিক-বিষয়ে ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধযুক্ত অঞ্চলসমূহকে 'বিচ্ছিন্ন' করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে নীতির অনুসরণ করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহাতে বিচলিত হইয়াছেন। বাঙলা প্রদেশ হইতে ঢাকা-ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম-ছোটনাগপুর বিভাগের কিয়দংশ অঞ্চলকে এবং মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে গঞ্জাম ও ভিজাগাপট্টম এজেন্সী অঞ্চলকে গভর্ণমেণ্ট বিচ্ছিন্ন করায় কংগ্রেস প্রতিবাদ করিতেছে।"

১৯০৩ সালের ৯ম প্রস্তাবেই কংগ্রেসের বৃহত্তর জাতীয়তাবোধের প্রমাণ দেখতে পাই। আদিবাসীকে জাতিদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে একটা 'রক্ষিত অঞ্চলে' আবদ্ধ ক'রে বিশেষভাবে শাসন করার কূটনৈতিক পদ্ধতিকে কংগ্রেস তখনই সন্দেহের চক্ষে দেখেছে এবং ক্ষুব্ধ হয়েছে।

এর পরের অধ্যায়— কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে যখন পরিণত হয় এবং তখন ব্রিটিশ কূটনীতিকে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হয় নি। ১৯৩৫ সালে যখন নতুন ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হ'ল, কংগ্রেস তখন আদিবাসীদের সম্বন্ধে আর অচেতন বা অস্পষ্ট-চেতন নয়। কংগ্রেসের আদিবাসী-নীতি তার আগেই একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ ক'রে ফেলেছে। ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত নতুন শাসন সংস্কারে আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে যেভাবে 'বহির্ভূত' করা হ'ল, কংগ্রেস সেই ব্রিটিশ কূটনীতির তাৎপর্য বুঝতে এবং মুখ খুলে বলতেও দেরী করে নি। ১৯৩৬ সালের কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে এক প্রস্তাবে বলা হয়— "দেশের সর্বত্র সমানভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব প্রতিহত করার জন্য অসঙ্গত আচরণের দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশের মানুষকে নানা ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করার উদ্দেশ্যে এই আর একটা চেষ্টা করিতেছেন (১)। দু'বছর পরে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনেও অনুরূপ মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

---

(1) "Yet another attempt to divide the people of India into different groups, with unjustifiable and discriminatory treatment, to obstruct the growth of uniform democratic institutions in the country".

আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে 'বহির্ভূত' করার পেছনে যে সত্যিই সাম্রাজ্যিক অভিসন্ধি আছে, সে সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় প্রমাণ মিঃ চার্চিলের একটা মন্তব্যের মধ্যেই সে সময় পাওয়া গিয়েছিল। মিঃ চার্চিল বলেছিলেন— 'সমস্ত ভারতবর্ষকেই 'বহির্ভূত অঞ্চল' করার জন্য যদি চেষ্টা করা হতো, তবুও আমি কোন আপত্তি তুলতাম না।" বহির্ভূত করার নীতি একটা বেশ পাকাপোক্ত সাম্রাজ্যবাদী নীতি বলেই ভারত শত্রু মিঃ চার্চিল সারা ভারতবর্ষের ওপর সেটা চাপাতে পারলে বেশী আনন্দিত হতেন। বহির্ভূত করার নীতির মধ্যে কিছুমাত্র গণতান্ত্রিকতা থাকলে মিঃ চার্চিল অবশ্যই সেটা সারা ভারতবর্ষের ওপর চাপাবার কথা আনন্দের সঙ্গে বলতে পারতেন না।

এ বিষয়ে জনমতকে আন্দোলনমুখী করার জন্য ভারতের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সচেতন হয়ে ওঠেন। দক্ষিণ ভারতে 'বহির্ভূত অঞ্চল সমিতি' (Excluded Areas Association) স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সালে প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস-প্রদেশের আইনসভায় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় 'বহির্ভূত-করা,' 'বিশেষ রক্ষা' ইত্যাদি ব্রিটিশ পলিসির বিরুদ্ধে বিতর্ক হয় এবং প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

অনেকেই জানেন, দেশসেবকের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে ১৮ দফা গঠনমূলক বা রচনাত্মক কর্মবিধি প্রণয়ন করেছেন, সেটা বস্তুতঃ দেশ ও জাতিকে 'শান্তিপূর্ণ বিপ্লবে' দীক্ষা দেবার ব্যাপার, যা সত্যিকারের স্বরাজের ভিত্তি এবং জনসাধারণকে দেশ ও জাতির পরিচালকরূপে পরিণত করার উদ্যোগ।

এই গঠনমূলক কর্মবিধি কংগ্রেস কর্তৃকও অনুমোদিত হয়েছে এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস সদস্যদের এই গঠনমূলক কাজ গ্রহণ করার জন্যও মাঝে মাঝে নির্দেশ দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় গঠনমূলক কাজকে কংগ্রেসী সদস্যেরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন নি। অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য এই দিকটা সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন। মাত্র অতি অল্পসংখ্যক কংগ্রেসী ও কংগ্রেসানুরাগী ব্যক্তি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির ১৬ নম্বরের নির্দেশটি হ'ল— আদিবাসী সেবা।, এই বিষয়ে স্বয়ং গান্ধীজী সংক্ষেপে তাঁর গঠনমূলক কর্মবিধির পুস্তিকায় যা লিখেছেন তা উধৃত করা হ'ল।

"আদিবাসী কথাটা নতুন তৈরী করা হয়েছে যেমন 'রানিপরাজ' কথাটা।* রানিপরাজ অর্থাৎ কালিপরাজ অর্থাৎ কালো মানুষ, যদিও কালিপরাজের ত্বক্ অন্ত কারও ত্বক্ অপেক্ষা বেশী কালো নয়। আমার ধারণা, কালিপরাজ কথাটা শ্রীজগৎরাম তৈরী করেছিলেন। ভীল, গন্দ এবং অন্যান্য যাদের পাহাড়ী গোষ্ঠী বা আদিম গোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে, তারাই হ'ল আদিবাসী। কথাটার বুৎপত্তি-গত অর্থ হ'ল আদি আদিবাসী। আমার ধারণা, ঠক্কর বাপা প্রথম এই কথাটি তৈরী করেছিলেন।

"আদিবাসী-সেবা গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ। যদিও এই কাজটিকে কর্মপদ্ধতির মধ্যে যোড়শতম স্থান দেওয়া হয়েছে, তবুও গুরুত্বের দিকে এই কাজ অপরাপর কোন কাজের চেয়ে ছোট নয়। আমাদের দেশ এত বৃহৎ এবং এত বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠী আছে যে, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সক্ষম লোকের পক্ষেও ভারতের সকল মানুষের ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা সম্ভব নয়। যখন কেউ এই ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারে, তখন সে এটাও বুঝতে পারে যে, আমাদের পক্ষে এক জাতীয়তার দাবী সার্থক করা কত কঠিন, যদি না দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি বা সমাজের চেতনায় সর্বসাধারণের বা সর্বসমাজের সঙ্গে একাত্মবোধ সজীব হয়ে ওঠে।

'সমগ্র ভারতে আদিবাসীরা সংখ্যায় দু'কোটীর ওপর। কয়েক বছর আগে বাপা গুজরাটে ভীলদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৪০ সালে থানা জেলাতে শ্রীযুত বালা সাহেব খের তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ নিয়ে এই অতি প্রয়োজনীয় সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বর্তমানে আদিবাসী সেবামণ্ডলের সভাপতি।

---

* 'রানিপরাজ' কথাটার শব্দগত অর্থ হ'ল 'জঙ্গলের প্রজা'।

"ভারতের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে আরও কয়েকজন কর্মী ও সেবক কাজ করছেন, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। এই বিষয়ে সত্যি সত্যি মন্তব্য করা যেতে পারে— 'ফসলের ভরসা খুবই ভাল ; কিন্তু ফসল তোলবার মত খাটিয়ের সংখ্যা কম।' এই ধরণের সেবাকার্য নিছক মানবসেবার কাজ নয়, এই কাজ খাঁটি জাতি গঠনের কাজ। এই কাজের দ্বারা যে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার দিকেই এগিয়ে যাব, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।" (১)

গান্ধীজী যদিও বলেছেন যে, খাদিপ্রচার, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, মাদকবর্জন প্রভৃতি অন্যান্য গঠনমূলক কর্মবিধির তুলনায় আদিবাসী সেবা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও দেশের গঠনমূলক কর্মীরা এ বিষয়ে তেমন মন দিতে পারেন নি এবং আজও দেখাতে পারেন নি। আদিবাসী সেবার গুরুত্ব উপেক্ষিত হয়েছে।

---

(1) "The term Adivasi, like Raniparaj, is a coined word. Raniparaj stands for Kaliparaj (meaning blaok people, though their skin is no more black than that of any other). It was coined, I think, by Sjt. Jugatram. The term Adivasi, (for Bhils, Gonds, or others variously described as Hill Tribes or Aboriginals) means literally original inhabitants and was coined, I believe, by Thakkar Bapa.

"Service of Adivasis is also a part of the constructive programme. Though they are the sixteenth number in this programme, they are not the least in point of importance. Our country is so vast and the races so varied that the best of us cannot know all there is to know of men and their condition. As one discovers this for oneself, one realises how difficult it is to make good our claim to be one nation, unless every unit has a living consciousness of being one with every other.

"The Adivasis are over two crores in all India. Bapa began work among the Bhils some years ago in Gujarat. In about 1940 Sjt. Balasaheb Kher threw himself with his usual zeal into this much-needed service in the Thana District. He is now President of the Adivasi Seva Mandal.

"There are several such other workers in other parts of India and yet they are too few. Truly 'the harvest is rich but the labourers are few.' Who can deny that all such service is not merely humanitarian but solidly national, and brings us nearer to true independence."

গান্ধীজীর গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রচারিত হবার পূর্বে এবং আদিবাসীর সম্বন্ধে কংগ্রেসী আগ্রহের বহু পূর্বেই খৃষ্টান মিশনারী সমাজ অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে সেবামূলক কাজ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু গঠনমূলক আদিবাসী-সেবার কাজ ও খৃষ্টান পাদরী সমাজের দ্বারা পরিচালিত সেবামূলক কাজের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। খৃষ্টান পাদরী সমাজের আদিবাসী-সেবা বস্তুতঃ ধর্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত। জাতি গঠনের আদর্শ তার মধ্যে ছিল না এবং বর্তমানেও নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বহুকাল পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজের কোন কোন প্রচারক আদিবাসীদের মধ্যে সেবামূলক ও শিক্ষামূলক কাজ করেছেন। খাসিয়া সমাজে শিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ৺নীলমণি দাসের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী সমাজে ব্রাহ্ম প্রচারকের কাজ অবশ্যই পরোক্ষভাবে আদিবাসীর মনে বৃহত্তর জাতীয়তা বা ভারতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছে। কিন্তু এ ধরণের উদ্যোগের দৃষ্টান্তও খুব কম।

১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন প্রতিযোগিতায় কংগ্রেস অবতীর্ণ হবার পূর্বে কংগ্রেসের তরফে জনসাধারণের কাছে যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচারিত হয়, তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট ঘোষণা ছিল।

"জনসমাজের মধ্যে যে সব সমাজ অনগ্রসর এবং দলিত তাঁরা যাতে দ্রুত উন্নতি লাভ করেন এবং জাতীয় জীবনে অন্যান্য সকলের মত সমান ও সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য রাষ্ট্র অনগ্রসর ও দলিত সমাজকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা ও বিশেষ সুবিধা ক'রে দেবে। বিশেষ ক'রে উপজাতীয় (আদিবাসী) অঞ্চলের জনসাধারণের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র এমনভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করবে যেটা উপজাতীয়দের গোষ্ঠীগত রুচি ও প্রতিভার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

তপশীলভুক্ত সমাজগুলির শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে।” (২)

নির্বাচনে সাফল্য লাভ করার পর কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন এবং আদিবাসীর উন্নতি সম্বন্ধে যতটুকু উদ্যোগের প্রমাণ দিয়েছেন, তার পরিচয় এ প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের কথা ধরা যাক্। বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট হরিজনদের উন্নতির উদ্দেশ্যে কয়েকটি আইন পাশ করেন। হরিজনদের সম্পর্কে উন্নতিমূলক এই আইন পরোক্ষভাবে আদিবাসীর উন্নতির পক্ষে কার্যকরী হয়েছে। তা ছাড়া প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে অনগ্রসর সমাজে (হরিজন ও আদি-বাসী) শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক উন্নতির জন্য এক কোটি টাকা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে ঠিক এই রকমের হরিজন উন্নতির জন্য বিশেষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই উদ্যোগ-আইনগুলি প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধার কিছু হয় নি।

আসামের শিক্ষা বাজেটে উপজাতীয় শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষভাবে বৃত্তি দেবার খরচ ধরা হয়েছে। উপজাতীয় উন্নতি কমিটি (Tribal Welfare Committee) নামে একটি কমিটিও আসাম গভর্ণমেণ্ট গঠন করেছেন। চা-বাগানের প্রাক্তন মজুরদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যই এই কমিটিকে আসাম গভর্ণমেণ্ট আর্থিক সাহায্য করে থাকেন।

(2) "The state shall further provide all necessary safeguards for the protection and the development of the backward and suppressed elements in the population so that they might make rapid progress and take a full and equal part in national life. In particular the State will help in the development of the people of the tribal areas in a manner most suited to their genius, and in the education and social and economic progress of the scheduled castes. "—Congress Election Manifesto, Dec., 1945.

প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের কালে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালেই উড়িষ্যার আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে ঐ তদন্ত সম্পূর্ণ হয় এবং রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তত দিনে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে জাতীয় সংগ্রামের জন্য আবার উদ্যোগী হতে আরম্ভ করেছে। কাজেই উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনাদৃত হয়েই পড়ে থাকে এবং পরে আবার ১৯৪৬ সালে বর্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই সুপারিশগুলি বিবেচিত হতে আরম্ভ হয়েছে। আদিবাসী জনসাধারণের উন্নতির কাজ পরিচালনা করার জন্য একজন বিশেষ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আদিবাসী সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থারও উদ্যোগ করা হয়েছে। উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট আদিবাসীদের উন্নতির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে এই সম্পর্কে তিন লক্ষ টাকা খরচের বরাদ্দ করা হয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আশ্রম ধরণের তিনটি বোর্ডিং সহ স্কুল স্থাপিত হয়েছে। আদিবাসীদের উন্নতি সম্বন্ধে উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি পরামর্শদাতা বোর্ডও গঠিত হয়েছে।

যুক্তপ্রদেশের আইনসভায় মুখ্যতঃ হরিজনদের উন্নতির জন্যেই একটি আইন পাশ হয়েছে। এই আইনের বিশেষত্ব হ'ল, বেগার খাটা প্রভৃতি কয়েকটি কুপ্রথার আক্রমণ থেকে হরিজনদের রক্ষা করা। যেহেতু বেগার খাটার বিভীষিকা আদিবাসীদেরও সমানভাবে পীড়িত ক'রে থাকে সেই হেতু এই আইন আদিবাসীদের পক্ষেও রক্ষামূলক হয়েছে।

বিহার গভর্ণমেণ্ট একটি সরকারী বিভাগই স্থাপন করেছেন—এর নাম 'উন্নতি বিভাগ' (Welfare Department)। আদিবাসী, হরিজন এবং মুসলিম সমাজের অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির উন্নতির জন্যই এই বিভাগ। বিশেষভাবে ৫ লক্ষ টাকা আদিবাসীদের উন্নতিমূলক কাজের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। বিহার গভর্ণমেণ্টের এই উন্নতিমূলক পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয় ছাড়া মোটামুটি বিষয়গুলি

হ'ল (ক) প্রত্যেক বড় আদিবাসী গ্রামে একটি ক'রে বাঁধ প্রতিষ্ঠা বা পুষ্করিণী খনন। (খ) আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যেক থানা এলাকায় একটি ক'রে শস্যের গোলা স্থাপন। (গ) আদিবাসী অঞ্চলে কয়েকটি কেন্দ্রে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য একটি ক'রে হোস্টেল স্থাপন।

এ ছাড়া বিহার গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক একটি সাংস্কৃতিক পরিষদ (cultural board) গঠন করেছেন। বিশেষ ক'রে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, ওরাওঁ, মুণ্ডা, হো ও খাড়িয়া ইত্যাদি বড় বড় সমাজগুলির জন্য এই সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক পরিষদগুলি বছরে দু'বার ক'রে সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির নীতি ও পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে, গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষ যে সব উদ্যোগ ও নীতি গ্রহণ করেছেন, তারই কিছুটা আভাস দেওয়া হ'ল। এ ছাড়া ভূমি, জঙ্গল, মাদক বর্জন, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি সাধারণ সকল বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট যে সব উন্নতিমূলক পরিবর্তন করছেন তার প্রভাব ও সুফল প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসীরাও সাধারণভাবে নিশ্চয় পেয়ে থাকেন।

গত নির্বাচনের পরে বাংলাদেশে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল, সেটা পুরোপুরি মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভার কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, বাংলাদেশের উনিশ লক্ষ আদিবাসীর উন্নতির জন্য বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা কোন বিশেষ উদ্যোগ করেন নি।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং ভারত বিভাগের পর আদিবাসীদের সমস্যার মধ্যে কয়েকটি নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্থানে (সিন্ধু, পশ্চিম

পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) আদিবাসী সমাজ নেই। (১) পূর্ব পাকিস্থানে র‍্যাডক্লিফ সাহেবের খেয়ালে চাকমা আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন আমলে বহির্ভূত এলাকা নামে এই খাস-শাসিত অঞ্চলকে পূর্ব বাংলার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিশেষ কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে এই কাণ্ড করা হয়েছে।

এ ছাড়া, সুসঙ্গ-সেরপুর পরগণা নামে আংশিক বহির্ভূত এলাকাটিও পূর্ব-বঙ্গের মধ্যে পড়েছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ হ'ল হাজং এবং গারো প্রভৃতি কৃষিপ্রবণ হিন্দুসংস্কৃতিসম্পন্ন আদিবাসী সমাজ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুসঙ্গ-সেরপুর পরগণাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিলে বাংলার আদিবাসী সমাজের ভৌগোলিক সংহতি অটুট থাকৃতো। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে বাংলা-দেশের শুধু হিন্দু ও মুসলমান সমাজই নয়, আদিবাসী সমাজও বিভক্ত হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে নেতৃ ও কর্তৃস্থানীয়দের উদ্যোগ এবং তৎপরতার যেটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে আদিবাসীদের মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবার কারণ আছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নিয়মতন্ত্র এখনো চূড়ান্তভাবে রচিত হয় নি। গণপরিষদ অতি দ্রুত এ বিষয়ে তাঁদের যথাবিহিত কর্তব্য করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে গণপরিষদের সংখ্যালঘু সাব-কমিটি (Minority Sub-Committee) এবং 'বহির্ভূত অঞ্চল কমিটি' (Excluded Areas Committee) নানারূপ তথ্যসংগ্রহ ক'রে, বিচার ও বিবেচনা ক'রে তাঁদের সুপারিশ রচনা করেছেন।

---

(১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে যাদের উপজাতীয় (tribal) লোক বলা হয়, তাদের 'আদিবাসী' বলা যায় না। ওয়াজিরি, মোমন্দ, ওরকজাই, সিনোয়ারি চিত্রলী, উত্‌মনজাই, ইয়ুসুফজাই ইত্যাদি যে সব উপজাতীয় গোষ্ঠীরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে থাকে, তারা হ'ল পাখ্‌তুন বা পাঠান মুসলমান। ভাষা পাখ্‌তু বা পুশ্‌তু। এরা আধুনিক মানুষ—নৃতত্ত্বের বিচারে ইরাণী, আফগান, আর্য ভারতীয় ইত্যাদির মতই। বৈশিষ্ট্য হ'ল পার্বত্য অঞ্চলে উপত্যকাবাসী হওয়ায় এরা এখনও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে।

মাত্র সিন্ধু প্রদেশে ভীল প্রভৃতি কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর লোক অল্পসংখ্যক আছে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানে দুর্ভাগ্যক্রমে যে সব আদিবাসী সমাজকে থাকতে বাধ্য করা হ'ল, তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তিত হবার কারণ আছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রকে 'ইসলামীয়' পদ্ধতিতে গড়া হবে—এই কথা জিন্না সাহেব থেকে আরম্ভ ক'রে আরও অনেক পাকিস্থানী নেতা ঘোষণা করেছেন। ডাঃ আম্বেদকর ও শ্রীজগজীবন রাম, ভারতের দুই হরিজন নেতা পাকিস্থানে হরিজনদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন আশঙ্কিত হয়েছেন, তেমনি আশঙ্কা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত আদিবাসীদের সম্বন্ধেও করা যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজের ভেতরে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন প্রচারকার্যের কিছু কিছু নমুনাও পাওয়া যাচ্ছে, যেটা মূলতঃ জাতীয়তাবিরোধী কাজ। উড়িষ্যার নীলগিরি নামে দেশীয় রাজ্যে আদিবাসীরা যে আচরণের প্রমাণ দিয়েছে, সেটা গর্হিত ব্যাপার এবং এর পেছনে বাইরের মতলবী দলের হাত আছে বলে মনে হয়। পৃথক্ ঝাড়খণ্ডের দাবীও মাঝে মাঝে যে রকম উগ্রতার সঙ্গে বিক্ষোভরূপে দেখা দিচ্ছে, সেটাও সুস্থ সামাজিক আদর্শের প্রেরণায় নয়। আসামের নাগা সমাজেও একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নাগা জাতীয় পরিষদের (Naga National Council) সভাপতি মিঃ আলিবা ইম্প্‌তি নাগা অঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই দাবী ক'রে বসে আছেন। অপরের এবং বাইরের অভিসন্ধিপ্রবণ কোন দল ও ব্যক্তির ইঙ্গিতেই যে নাগা নেতা মিঃ ইম্প্‌তি এই দাবী করেছেন, তা'ও বোঝা যায়।

কিন্তু ভারতের হিন্দুসমাজ হোক্, ভারতের মুসলিম সমাজ হোক্ বা ভারতের আদিবাসী সমাজ হোক্—ভেদবাদের দ্বারা এই সব সমাজকে খণ্ডভাবে বিচ্ছিন্ন করার কোন অপচেষ্টাকে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রশ্রয় দেবেন না, এটাই হ'ল স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি। আসামের নাগা সমাজের কোন কোন অংশের স্বতন্ত্রতার দাবী স্বীকার করা যেতে পারে না। আসামের আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যে একজাতীয়তার নীতি প্রয়োগ করবেন, সেটা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা

বিস্তার, স্বাস্থ্যবিধান, নতুন পথ নির্মাণ ইত্যাদি দ্বারা আসামের আদিবাসী অঞ্চলকে প্রাগৈতিহাসিক দশা থেকে উদ্ধার ক'রে বিংশ শতাব্দীর যোগ্য জনপদে অবশ্যই পরিণত করতে হবে। এ না হলে সমগ্র দেশ ও জাতির সঙ্গে আদিবাসী সমাজের ঐক্যবোধও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

নাম-গ্রাম-সংখ্যা

[ক]

১৯৪১ সালের আদম স্থমারী অন্থযায়ী সমগ্র ভারতের (প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য) উপজাতীয় আদিবাসীর (tribal people) সংখ্যা হ'ল :

পুরুষ—১২৮১৩১৯৮

স্ত্রী—১২৬২৮২৯১

মোট—২৫৪৪১৪৮৯

[খ]

ভারতের সমগ্র প্রদেশগুলির উপজাতীয় আদিবাসীর সংখ্যা হ'ল :

পুরুষ—৮৪০১২৯০

স্ত্রী—৮৩১১৯৬৬

মোট—১৬৭১৩২৫৬

[গ]

ভারতের সমগ্র দেশীয় রাজ্যের (এজেন্সি সমেত) উপজাতীয় আদিবাসীর খ্যা হ'ল :

পুরুষ—৪৪১১৯০৮

স্ত্রী—৪৩১৬৩২৫

মোট—৮৭২৮২৩৩

[ঘ]

প্রদেশ অন্থসারে উপজাতীয় আদিবাসীর সংখ্যা হ'ল :

মাদ্রাজ—৫৬২০২৯

বোম্বাই—১৬১৪২৯৮

বাংলা—১৮৮৯৩৮৯

যুক্তপ্রদেশ—২৮৯৪২২

পাঞ্জাব— ×

বিহার—৫০৫৫৬৪৭

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—২৯৩৭৩৬৪

আসাম—২৪৮৪৯৯৬

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ— ×

উড়িষ্যা—১৭২১০০৬

সিন্ধু—৩৬৮১৯

আজমীর মারবাড়—৯১৪৭২

আন্দামান ও নিকোবর—১১০৭৬ *

বেলুচিস্তান—৩

কুর্গ—১৯৭২৩

দিল্লী— ×

পন্থ পিপ্‌লোদা—১২

[ঙ]

দেশীয় রাজ্য ও এজেন্সি অনুসারে উপজাতীয় আদিবাসীর সংখ্যা হ'ল :—

আসাম—৩৩৯১৩৭

বেলুচিস্থান— ×

বড়োদা—৩৭৩২০৭

বাংলা—৭৫১০২২

মধ্যভারত—১১৩৭৭১৬

ছত্রিশগড়—১৮১৭৭১২

* আন্দামানের উপজাতীয় আদিবাসীর সংখ্যা শূন্য দেখান হয়েছে, শুধু নিকোবরেই ১১০৭৬ জন আদিবাসী।

কোচিন—৫১৮৩

দাক্ষিণাত্য (কোল্‌হাপুর সমেত)—৮৬৭৮

গুজরাট—৬২৬৮৯২

গোয়ালিয়র—২৪৫০৬৬

হায়দ্রাবাদ—৬৭৮১৪৯

কাশ্মীর—২৯৩৭৪

গিলগিট—×

মাদ্রাজ—৮

মহীশূর—৯৪০৫

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত—×

উড়িষ্যা—৮৬৪৯১৪

পাঞ্জাব—৭৭৯

পাঞ্জাব পার্বত্য রাজ্য—×

রাজপুতানা—১৬২৪৪৮৮

সিকিম—৬৩২০৬

ত্রিবাঙ্কুড়—১৩২৬৮২

যুক্তপ্রদেশ—৩৪০৪

পশ্চিমভারত—১৭২১১

[চ]

সমগ্র বাংলা, ত্রিপুরা রাজ্য, কুচবিহার রাজ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিকিম, এই সমস্ত অঞ্চলে আদিবাসী উপজাতীয় গোষ্ঠীর জনসংখ্যা কত তার একটা হিসেব ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে।

আদিবাসী গোষ্ঠী	মোট জনসংখ্যা	প্রধান বসতি অঞ্চল
(১) ভোটিয়া	২১০২৩	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম
(২) চাক্‌মা	১২৫৬২০	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা রাজ্য

(৩)	দামাই	১০৪৪৮	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম
(৪)	গুরুং	২৫১৫৮	কলিকাতা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং সিকিম
(৫)	হদি	৭৭৬২	ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম
(৬)	কামি	২৪৭৬৯	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম
(৭)	খাস	২৮৮	দার্জিলিং, সিকিম
(৮)	কুকি	৫১১১	পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা রাজ্য
(৯)	লেপ্‌চা	২৫০৪৩	দার্জিলিং, সিকিম
(১০)	লিম্বু	৩২০২০	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম
(১১)	মংগর	২৮১৬১	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম
(১২)	মেচ	১১৭৯৮	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, চট্টগ্রাম
(১৩)	মু	১৪৫৮৪	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম
(১৪)	মুণ্ডা	১০১৪৭৯	বাংলা প্রদেশের সর্বত্র
(১৫)	নেওয়ার	১৮৭১৫	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম
(১৬)	ওরাওঁ	২৪০৪৮৩	বাংলা প্রদেশের সর্বত্র
(১৭)	সাঁওতাল	৮২৯০২৫	বাংলা প্রদেশের সর্বত্র
(১৮)	সারকি	৪৩৩৫	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম
(১৯)	সুমুওয়ার	৫৯৬৯	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম
(২০)	টিপ্‌রা	৩৮৪০১	ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম

[ছ]

বাংলা দেশে জেলা হিসেবে কোথায় কত সংখ্যক আদিবাসী আছে, তার একটা হিসেব উধৃত করা হ'ল। [১৯৪১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্ট]

জিলা	আদিবাসীর জনসংখ্যা
বর্ধমান	১৫১৩৫৫
বীরভূম	৭৪০৮৪

বাঁকুড়া	১৫৪২৪৬
মেদিনীপুর	২৫৩৬২৫
হুগলী	৬৯৫০০
হাওড়া	৩৯১৯
চব্বিশ পরগণা	৫১০৮৫
কলিকাতা	১৬৮৮
নদীয়া	১২৬৭১
মুর্শিদাবাদ	২৬১৩৮
যশোহর	৪৯৭৮
খুলনা	২৬৭৫
রাজসাহী	৬৭২৯৮
দিনাজপুর	১৮২৮৯২
জলপাইগুড়ি	২৭৯২৯৬
দার্জিলিং	১৪১৩০১
রংপুর	১৮২০০
বগুড়া	১৪৩৮৭
পাবনা	৬৯০৬
মালদহ	৬৬৪৪৯
ঢাকা	৪০২৯
মৈমনসিংহ	৫৯৭২২
ফরিদপুর	১৩৬৩
বাখরগঞ্জ	২৮৪
ত্রিপুরা	১৫২৪

নোয়াখালি	৩৪
চট্টগ্রাম	৬৩৪৮
মোট	১৬৫৫৯৯৭*

এ ছাড়া আছে —

পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৩৩৩৯২
কুচবিহার রাজ্য	২৪৩৫
ত্রিপুরা রাজ্য	৩৩৬৩৩
সিকিম	৬৩২০৬

[জ]

বাংলার যে ৫টা জেলা র্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে বিভক্ত হয়েছে, সেই জেলাগুলির আদিবাসী সমাজ কিছু পশ্চিমবঙ্গে এবং কিছু পূর্ববঙ্গে পড়েছে। হিসেব করলে এই দাঁড়ায়:

* ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ খণ্ডিতও হয়। ভারত হতে বিচ্ছিন্ন অংশ পাকিস্থান নাম গ্রহণ করেছে। 'র্যাডক্লিফ' বাঁটোয়ারা অনুসারে ভারত ও পাকিস্থানের ভৌগলিক সীমানা নির্ধারিত হয়। ভারত বিভাগের জন্যই বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে দু'ভাগে ভাগ করতে হয়েছে, আর দু'ই ভাগ হয়েছে একটি মাত্র জিলা—আসামের শ্রীহট্ট।

বাংলা প্রদেশকে ভারতীয় পশ্চিম বঙ্গে এবং পাকিস্থানী পূর্ববঙ্গে দু'ভাগ করতে গিয়ে আবার কয়েকটি জিলাকে ভাগ করতে হয়েছে। যথা: দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, যশোহর, নদীয়া ও মালদহ।

(ক) নদীয়া জেলার যে ১১টি থানা পুরোপুরি এবং দৌলতপুর থানার যে অংশবিশেষ পূর্ববঙ্গে পড়েছে, তার সমগ্র আদিবাসী জনসংখ্যা হ'ল—২৩৩৯

(খ) মালদহ জেলার যে ৫টি থানা পূর্ববঙ্গে পড়েছে তার আদিবাসী জনসংখ্যা হ'ল—১৪৯৮৭

(গ) জলপাইগুড়ি জেলার যে পুরোপুরি ৫টি থানা ও ১টি থানার সামান্য অংশ পূর্ববঙ্গে পড়েছে তার আদিবাসী জনসংখ্যা হ'ল—১১২৫।

(ঘ) দিনাজপুরের যে ৯টি থানা পুরোপুরি এবং বালুরঘাট থানার অংশবিশেষ পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে, তার আদিবাসী সংখ্যা হ'ল—৯৯৫৭৫

(ঙ) যশোহর জেলার যে ২টি থানা পুরোপুরি পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে, তার আদিবাসী সং[খ্যা] হ'ল—২২৯৯

		পশ্চিমবঙ্গ এলাকার আদিবাসী জনসংখ্যা	পূর্ববঙ্গ এলাকার আদিবাসী জনসংখ্যা
(১)	দিনাজপুর	৯৯৫৭৫	৮৩৩১৭
(২)	মালদহ	৫১৪৬২	১৪৯৮৭
(৩)	জলপাইগুড়ি	২৭৮১৭১	১১২৫
(৪)	যশোহর	২২৯৯	২৬৭৯
(৫)	নদীয়া	১০৩৩২	২৩৩৯

[ঝ]

নবগঠিত ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ এবং পাকিস্থানী পূর্ববঙ্গ প্রদেশের আদিবাসী জনসংখ্যা ভাগাভাগির পর নতুন হিসেব অনুসারে দাঁড়ালো :

(ক) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী— ১৩৬৮৭৮০

(খ) পূর্ববঙ্গের আদিবাসী— ২৮৭২১৭

মোট ১৬৫৫৯৯৭†

---

† এই হিসেব হ'ল প্রাদেশিক পশ্চিমবঙ্গ ও প্রাদেশিক পূর্ববঙ্গের হিসেব।

সমগ্র ভৌগলিক পূর্ববঙ্গ ধরলে, তার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৩৩৩৯২ আদিবাসীর জনসংখ্যা আরও যুক্ত হবে, তা ছাড়াও শ্রীহট্ট জেলার একাংশের আদিবাসীর জনসংখ্যাও (কয়েক হাজার) সেই সঙ্গে যুক্ত হবে। এই ভাবে পূর্ব পাকিস্থানের বাসিন্দা আদিবাসী উপজাতীয়দের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ লক্ষের কিছু অধিক।

সমগ্র ভৌগলিক পশ্চিমবঙ্গ ধরলে প্রাদেশিক হিসেবের সঙ্গে কুচবিহার রাজ্যের আদিবাসীর জনসংখ্যা (২৪৩৫) যুক্ত হবে। সিকিমের বাসিন্দা উপজাতীয়দের জনসংখ্যা (৬৩২০৬) না হয় পশ্চিম বাংলার সঙ্গে নাই ধরা হ'ল। তবু পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসীর জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৪ লক্ষ।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের হিসেবের ওপরে নির্ভর ক'রে উল্লিখিত হিসেব জানান গেল। কিন্তু এ হিসেব একেবারে অঙ্কে অঙ্কে ঠিক হতে পারে না, কারণ ১৯৪১ সালের জনসংখ্যা গণনার ব্যাপারটাই নানা গোলমেলে অবস্থায় নানারকম ভুল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং নতুন ক'রে আবার শুদ্ধ পদ্ধতিতে জনসংখ্যার (গণনা) না হওয়া পর্যন্ত একেবারে নির্ভুল হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়।

[ঞ]

১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুসারে :

(ক) শাসনসংস্কার যুক্ত প্রাদেশিক বাংলার আদিবাসী জনসংখ্যা—১৬৫৫৯৯৭

(খ) শাসনসংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনসংখ্যা—২৩৩৩৯২

সুতরাং খাস ব্রিটিশ শাসিত বাংলার আদিবাসী জনসংখ্যা, মোট ১৮৮৯৩৮৯

[ট]

১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুসারে বাংলার দেশীয় রাজ্যের আদিবাসী জনসংখ্যা :

কুচবিহার রাজ্য— ২৪৩৫
ত্রিপুরা রাজ্য— ৩৩৬৩৩
সিকিম রাজ্য— ৬৩২০৬
মোট ৯৯২৭৪

কিন্তু ১৯৪১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্টে অন্যত্র ('ঙ' চিহ্নিত সংখ্যাতথ্য দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলার দেশীয় রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যা হ'ল ৭৫১০২২ ; একই রিপোর্টের দু'জায়গায় একই বিষয়ে দু'রকম হিসেব কেন ?

ব্যাপার এই, 'ঙ' চিহ্নিত সংখ্যাতথ্যে সিকিমকে ধরা হয় নি এবং ময়ূরভঞ্জের আদিবাসীর জনসংখ্যা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যথা :

(ক) কুচবিহার— ২৪৩৫
(খ) ত্রিপুরা— ৩৩৬৩৩
(গ) ময়ূরভঞ্জ—৭১৪৯৫৪ *
মোট ৭৫১০২২

* ১৯৪১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্টে দেশীয় রাজ্যের তালিকায় ময়ূরভঞ্জকে বাংলা দেশীয় রাজ্য গ্রুপের মধ্যে ধরা হয়েছে।

[ঠ]

সমগ্র ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতীয়ের নাম ও প্রধান বসতি অনুসারে জনসংখ্যা দেওয়া হ'ল। ১৯৪১ সালের আদম সুমারীর হিসেব :

(১) আগারিয়া

যুক্তপ্রদেশ— ৩৯৮১১

বিহার— ২৭৮৯

ছত্রিশগড়— ৫২২৮

যুক্ত প্রদেশ দেশীয় রাজ্য—৩১৫৭

(২) আহেরিয়া

যুক্ত প্রদেশ— ২৪২৪৫

(৩) অহম

আসাম— ৩০০২১৪

(৪) আন্ধ্

হায়দ্রাবাদ— ১৯৩১৩

মধ্য প্রদেশ ও বেরার— ৬৫১৮৮

(৫) আংগামি

আসাম— ৫২০৮০

(৬) আও

আসাম— ৪০০৬৩

(৭) আরানাডান

মাদ্রাজ— ৪৮৯

(৮) আসুর

বিহার— ৪৩৮৮

ছত্রিশগড়— ১৭৬

(৯) বডাগা

মাদ্রাজ—	৫৬০৪৭

(১০) বাগাটা

মাদ্রাজ—	১৯৫৩৬
উড়িষ্যা—	১০৯৫

(১১) বাহেলিয়া

যুক্তপ্রদেশ—	১৪০৩৭
ঐ দেশীয় রাজ্য—	৩৮

(১২) বৈগা

বিহার—	৫৪
মধ্য প্রদেশ ও বেরার—	৩২১৫৮
মধ্যভারত—	৫১৪২৩
ছত্রিশগড়—	৫৮১১
হায়দ্রাবাদ—	১৮

(১৩) বালোচ (বিলোচ)

সিন্ধু—	৭৪৮৭৯৯
বেলুচিস্তান—	১৩২৫১৬
ঐ দেশীয় রাজ্য—	১০৫০৮০
পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য—	৪৬১১২

(১৪) বনজারা

বিহার—	২৫৫
মধ্যভারত—	২৬৭২
দক্ষিণগড়—	৯২৭

(১৫) বাভ্‌চা

বোম্বাই— ১৪৪৫

বড়োদা— ১৫০১

(১৬) বাওয়ারিয়া

যুক্তপ্রদেশ— ৯০৬৮

(১৭) বেদিয়া

বিহার— ৩১৮১৩

মধ্যভারত— ৮৯৩

ছত্রিশগড়— ৩৮২

(১৮) বেরিয়া

যুক্তপ্রদেশ— ৫৮৩৩

(১৯) ভারিয়া ভূমিয়া

উড়িষ্যা— ১৯৬৮৫

মধ্যভারত— ৯২১২

(২০) ভীল

বোম্বাই— ৫৬৮৫৭৬

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার— ২৯৫৭০

সিন্ধু— ৮২১১৮

আজমীর মারবাড়— ৮৫১২

হায়দ্রাবাদ— ১৮০২১

বড়োদা— ৬৩০৩৩

মধ্যভারত— ৫২১৯১১

গুজরাট— ১৮৮৮৯৯

গোয়ালিয়র— ৯৮২৬৪

রাজপুতানা— ৭৪৯৭৪৮

পশ্চিমভারত দেশীয় রাজ্য—১৫৫৮

(২১) ভীলালা

মধ্যভারত—	২৩৭১৬৫
গোয়ালিয়র—	৪২৬৮৬

(২২) বিঁঝোয়ার

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	৪৫৬০৮

(২৩) ভোগ্‌টা

বিহার—	৭৫৯৬৫
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	২৫০৩
ছত্রিশগড়—	৮৫

(২৪) ভোক্‌সা

যুক্তপ্রদেশ—	২৭৪

(২৫) ভোটিয়া

বাংলা—	৭৮০৮
সিকিম—	১৩১৭৪

(২৬) ভুঁইহার

বিহার—	৫৪৭৮
ছত্রিশগড়—	১৫৮১১
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	২৭০২

(২৭) ভূমিজ

বিহার—	১৫২৯৯২
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	১৭৮৩৪
ছত্রিশগড়—	১২

(২৮) বিঁঝিয়া

বিহার—	৫৩১৭
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	৩২৬১
ছত্রিশগড়—	৪৪৮৩

(২৯) বিরহোর

বিহার—	২৪৯৯
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	৫৪
ছত্রিশগড়—	২০২

(৩০) বিরজিয়া

বিহার—	২০৭৫
ছত্রিশগড়—	১

*(৩১) ব্রাহুই

সিন্ধু—	৮২৩২৬
বেলুচিস্তান—	৩৪৮১৫
ঐ দেশীয় রাজ্য—	৯৩৫২১

(৩২) চাকমা

বাংলা—	১০৬১৬০
ঐ দেশীয় রাজ্য—	১৯৪৪৯

(৩৩) চেঞ্চু

মাদ্রাজ—	৮৯৯৫
হায়দ্রাবাদ—	৩৮৬৫
মাদ্রাজ দেশীয় রাজ্য—	৮

(৩৪) চেরো

বিহার—	১৯৩৩৭
ছত্রিশগড়—	৯০৩৬

(৩৫) চোঢ়রা

বোম্বাই—	৪৯৪৫৩
বড়োদা—	৪৩২০৫
গুজরাট—	৩৮২৭

*বেলুচিস্তানের ব্রাহুই উপজাতীয়েরা 'দ্রাবিড় ভাষী' মানুষ।

(৩৬) দামাই

বাংলা—	৮২২২
সিকিম—	২২২৬

(৩৭) • ঢানক (ঢানুকা)

বোম্বাই—	১৬৭৫
বড়োদা—	২৯০৩
গুজরাট—	১৭২৮০

(৩৮) ধানোয়ার

বিহার—	৮৪
ছত্রিশগড়—	১৩৪৭
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	১০১২

(৩৯) ঢোড়িয়া

বোম্বাই—	১০৭৪৮০
বড়োদা—	৩২৪৪৮
গুজরাট—	১৪৯৪২

(৪০) ধানুচি, কিংথারিয়া পাওয়ারিয়া

যুক্তপ্রদেশ—	২০৬৮

(৪১) ডোম্বো

মাদ্রাজ—	২০৬৬৮
উড়িষ্যা—	১০৪২৪৩

(৪২) ডুবলা ও তালাওইয়া

বোম্বাই—	১৫৭৪০০
বড়োদা—	৩৮৬৬৪
গুজরাট—	৪৯২৪

(৪৩) ডুসাদ

যুক্তপ্রদেশ— ৭৭৪৫৬

(৪৪) ভিয়ানন্দ্রা

হায়দ্রাবাদ— ১৭

(৪৫) এরাকালা

হায়দ্রাবাদ— ৪১৬১৫

(৪৬) এরাবালান

কোচিন— ৬৪২

(৪৭) গড়াবা

মাদ্রাজ— ১৪০৬৩

উড়িষ্যা— ৩৪৩১৫

(৪৮) গামিত, গামৃতা

বোম্বাই— ১১৬২৪

বড়োদা— ৬৯২৭১

গুজরাট— ৩৬৬৪

(৪৯) গারো

আসাম— ২২৬২৭৩

(৫০) গাওয়ারি

হায়দ্রাবাদ— ৪০৩৬

(৫১) ঘাসি

বিহার— ৪১৫১৩

(৫২) গিধিয়া

যুক্তপ্রদেশ— ৫৯৮

(৫৩) গিরাসিয়া

রাজপুতানা— ৫১৩৪৭

(৫৪) গন্দ

মাদ্রাজ—	৪৯৫
বোম্বাই—	১০[illegible]০
যুক্তপ্রদেশ—	১২০৬৯১
বিহার—	২১৬৯৩১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	২০৬৮১৭৯
উড়িষ্যা—	১৩৪৮৬৪
হায়দ্রাবাদ—	১৪২০২৬
মধ্যভারত—	৯২৭৫৫
ছত্রিশগড়—	৪২০২০৩
বাংলা দেশীয় রাজ্য—	১২৮৬৬
উড়িষ্যা '—'	১৭৭৫০০
যুক্তপ্রদেশ '—'	৩৪০৪

(৫৫) গোরাইত্

বিহার—	৯১৩৫
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	১৮৮

(৫৬) গুজর

উ. প. সীমান্ত প্রদেশ—	১১৪৭৪৬

(৫৭) গুলগুলিয়া

বিহার—	৭২৫

(৫৮) গুরুং

বাংলা—	১৬৬৬৫
সিকিম—	৮৪৯৩

(৫৯) হাবুরা

যুক্তপ্রদেশ—	২১৬৮

(৬০) হদি

বাংলা— ৭৭৬২

(৬১) হো

বিহার— ৩৪৯৬৪৫

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য— ৩৪০৯২

(৬২) জট

উ. প. সীমান্ত প্রদেশ— ৪৩০৪১

সিন্ধু— ৮৪৩৭২

বেলুচিস্থান— ২০১১১

ঐ দেশীয় রাজ্য ৮৩৪০

(৬৩) জটাপু

মাদ্রাজ— ৫৬৬৫১

উড়িষ্যা— ১৬৯৬০

(৬৪) কাছাড়ী

আসাম— ৪২৮৭৩৩

(৬৫) কাডান

মাদ্রাজ— ৬৪০

কোচিন— ৫৬৫

(৬৬) কামি

বাংলা— ১৯৫৮০

সিকিম— ৫১৮৯

(৬৭) কানিকরন্

ত্রিবাঙ্কুড়— ৭৫২৭

(৬৮) কঞ্জর

যুক্তপ্রদেশ— ১০১৭৫

ঐ দেশীয় রাজ্য— ১৩

(৬৯) কারিম্পলন্

মাদ্রাজ— ৪২৪২

(৭০) কুর্মালি

বিহার— ১০৯০২

(৭১) কত্‌কারি

বোম্বাই— ৬৪২৭৫

দাক্ষিণাত্য দেশীয় রাজ্য— ৪৮৯৫

(৭২) কট্টু-নায়কন্

মাদ্রাজ— ১৫২০

(৭৩) কাওয়ার

বিহার— ৫০২৯

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার— ১০৬০৭৭

ছত্রিশগড়— ১৪৫৬৫৬

(৭৪) খংগার

যুক্তপ্রদেশ— ২২৫৬৯

বিহার— ২৬৬

(৭৫) খাড়িয়া

বিহার— ৮৮৭৭

উড়িষ্যা— ১০৭৮

ছত্রিশগড় ৮৭২

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য— ৪৪৪৭

বাংলা „ — ১২৯৩

(৭৬) খারোয়ার

বিহার—	৭৭৭০২
ছত্রিশগড়—	৪১৭৫৫
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	৩১৩

(৭৭) খাস

বাংলা—	২৫৫
সিকিম—	৩৩

(৭৮) খাসি

আসাম—	১৯২৯১৯

(৭৯) খেতৌরি

বিহার—	২০৭০৮

(৮০) কোক্‌না

বোম্বাই—	৮৯১৮১
বড়োদা—	১০০২৫
গুজরাট—	২০২৬১

(৮১) কোল

যুক্তপ্রদেশ—	২৭৬৭৩
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	৯৩৯৪৪
মধ্যভারত—	৩২০৭৬

(৮২) কোলাম

হায়দ্রাবাদ—	৭৪৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	৩৬৫৯৫

(৮৩) কোল্‌ঘা

বড়োদা—	১২৪৫

(৮৪) কোলি ও দাগি

বোম্বাই—	৬৬৫৫৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	৪৩৩২৩
সিন্ধু—	১০১৪৫৬
হায়দ্রাবাদ—	২৩৭

(৮৫) কোল্লো

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	১০৮৯৫৪
ছত্রিশগড়—	৬৩১

(৮৬) খন্দ বা কন্দ

মাদ্রাজ—	৫৪৫৩৯
উড়িষ্যা—	৪৩৬২৬০
ছত্রিশগড়—	১৮৩১০৩
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	৭১০০২

(৮৭) কোণ্ডা ডোরা

মাদ্রাজ—	৯৮৭৪৭
উড়িষ্যা—	৬৬২৮১

(৮৮) কোনিয়াক

আসাম—	৯৭৪৪

(৮৯) কোরা

বিহার—	১৫৭৪৫
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	১৭৬৮৫

(৯০) কোম্বি

হায়দ্রাবাদ—	৪৪৫৬

(৯১) কোরোয়া (কোরকু)

যুক্তপ্রদেশ— ২৯১৯

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—১৮৪০১৯

মধ্যভারত— ১৮৭০০

(৯২) কোটা

মাদ্রাজ— ৯৫২

(৯৩) কোইয়া

মাদ্রাজ— ৯৫৬৩৩

উড়িষ্যা— ২৭৮৯১

হায়দ্রাবাদ— ৩১০৯৪

(৯৪) কুড়িয়া

মাদ্রাজ— ৩৪৯১

কুর্গ— ৪১৩

(৯৫) কুড়ুবি

মাদ্রাজ— ১১৮৮৫

(৯৬) কুকি

বাংলা— ৩৫৮৯

ঐ দেশীয় রাজ্য— ১৫২২

আসাম— ৮৪৪৭৯

(৯৭) কুরাবণ্

ত্রিবাঙ্কুর— ৯৯২০৯

(৯৮) কুরিচ্চান্

মাদ্রাজ— ১২১৩১

(৯৯) কুরুমান

মাদ্রাজ— ২২৪৪

(১০০) লালুং

আসাম— ৫১৩০৮

(১০১) লাম্বাড়ি

হায়দ্রাবাদ— ৪০১১২৫

(১০২) লাসি

বেলুচিস্তান— ১৬৬

ঐ দেশীয় রাজ্য— ৩৩৯০০

(১০৩) লেপচা

বাংলা— ১২৫২০

সিকিম— ১২৫২৩

(১০৪) লোহ্টা

আসাম— ১৯৩৭৪

(১০৫) লিম্বু

বাংলা— ১৯২০১

সিকিম— ১২৮১৯

(১০৬) লোহ্রা

বিহার— ৪৬৮৫৫

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য— ৬২৩৪

ছত্রিশগড়— ১৭৯৫

(১০৭) লুসাই

আসাম— ১৪২৩০২

(১০৮) মাহ্‌লি

বিহার— ৬০৩৮৫

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য— ২৪২৮

ছত্রিশগড়— ৭৭৪

(১০৯) মালপান্‌তারম্‌

ত্রিবাঙ্কুর— ১৭৬

(১১০) মালার

বিহার— ২৯৪২

ছত্রিশগড়— ৯৪৪

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য— ৯২

(১১১) মালাসার

মাদ্রাজ— ১০৬০২

(১১২) মালয়ান্‌ ও মালয়ারয়ান্‌

কোচিন— ৩০১১

ত্রিবাঙ্কুর— ২৯৩৯

(১১৩) মাল পাহাড়িয়া

বিহার— ৪০৪৯৪

(১১৪) মংগর

বাংলা— ২৪৫১৩

সিকিম— ৩৬৪৮

বিহার— ৫৩৬

(১১৫) মারিয়া

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য— ১৭০৬

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার— ৩৯৫৫৩

(১১৬) মারাটি

মাদ্রাজ— ৩৭৪৮৫

(১১৭) মাওলিক

বিহার— ৮৩৫

(১১৮) মাব্‌চি

বোম্বাই— ৪০৮৭৮

বড়োদা— ৩৫০

গুজরাট— ৯৭৯

(১১৯) মাথুলা

হায়দ্রাবাদ— ৩৪৮৯

(১২০) মেচ

বাংলা— ১১৭৯৮

(১২১) মেও (মিনা)

আজমীর মারবাড়— ৫৪৫৪

রাজপুতানা— ৭৫৯৪০০

(১২২) মেরাট

আজমীর মারবাড়— ১৯০১৮

রাজপুতানা— ৮৯৫৯

(১২৩) মিকির

আসাম— ১৪৯৭৪৯

(১২৪) মিরি

আসাম— ১০৬৯৫০

(১২৫) ম্রু

বাংলা— ১৪৫৮৪

(১২৬) মুণ্ডা

বাংলা—	১০১৪৭৯
উড়িষ্যা—	১০৫৩৭
বিহার—	৫১৯৭৪৩
বাংলা দেশীয় রাজ্য—	১৬৬৯
উড়িষ্যা ”—	৬১০০৩
ছত্রিশগড়—	৬৪৩৮

(১২৭) মুথুবান্

ত্রিবাঙ্কুর—	১৯৩১

(১২৮) নাগা

আসাম—	২৮০৩৭০

(১২৯) নাগেসিয়া

বিহার—	১৫০৮৮
ছত্রিশগড়—	৩৩৬৫০
উড়িষ্যা—	৭১১২৪

(১৩০) নাট

যুক্তপ্রদেশ—	৪১২০৯
ঐ দেশীয় রাজ্য—	৬৮৯

(১৩১) নায়ক

বোম্বাই—	৬৯৩৪৮
বড়োদা—	১৬২৭৬
গুজরাট—	৩৫৮৭৩
পশ্চিমভারত দেশীয় রাজ্য—	৭৮

(১৩২) নয়াড়ি

কোচিন— ১৭৫

ত্রিবাঙ্কুর— ৭৫

(১৩৩) নিকোবরী

আন্দমান নিকোবর দ্বীপ— ১১০৭৬

(১৩৪) নেওয়ার

বাংলা— ১৪৫২৯

সিকিম— ৪১৮৬

(১৩৫) ওরাঁও

বাংলা— ২৪০৪৮৩

বিহার— ৬৩৮৪৯০

উড়িষ্যা— ৭০২০

ছত্রিশগড়— ১৬৪৭৩১

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য— ৭২২০২

(১৩৬) পাহাড়িয়া

বিহার— ৯৫৭২

(১৩৭) পাহিরা

বিহার— ৪৮০

(১৩৮) পালিয়ান্

ত্রিবাঙ্কুর— ৫৯১

(১৩৯) পান

বিহার— ৩১০৭

ছত্রিশগড়— ৩৮৯২১

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য— ৯০২৪৫

(১৪০) পানো

মাদ্রাজ— ৫২২

উড়িষ্যা— ৬১৮৩৩

ঐ দেশীয় রাজ্য— ১৬১

(১৪১) পরধান

বিহার— ৬২৬

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার— ১২১৪৯৪

হায়দ্রাবাদ— ৬৩৮৮

ছত্রিশগড়— ৪৪৪

(১৪২) পারহাইয়া

বিহার— ১০১৩৪

ছত্রিশগড়— ৩৮৪১

(১৪৩) পাসি

যুক্তপ্রদেশ— ১৫৮৯৫১৬

ঐ দেশীয়রাজ্য— ১৬২৬২

(১৪৪) পাটেলিয়া

বোম্বাই— ২৩২১৩

(১৪৫) পরজা বা পোরোজা

মাদ্রাজ— ১৪৪৫৮

উড়িষ্যা— ১৪৫৭১৯

(১৪৬) রাভা

আসাম— ৮৪২৬৯

(১৪৭) রাওয়াত

আজমীর মাড়বার— ৫৮৪২৮

রাজপুতানা— ৫৫০৩২

(১৪৮) রেংমা

আসাম—	৪৯৬৮

(১৪৯) সাহারিয়া

যুক্তপ্রদেশ—	৭৪৯৪
মধ্যভারত—	৩৪০২

(১৫০) সান্সিয়া

যুক্তপ্রদেশ—	৯৭৪
মধ্যভারত—	২৪০৬৫
গোয়ালিয়র—	১০৪১১৬

(১৫১) সান্সি

কাশ্মীর—	১৬৬৫

(১৫২) সাঁওতাল

বাংলা—	৮২৯০২৫
বিহার—	১৫৩৪৬৪৬
উড়িষ্যা—	২২৩৭৯
ছত্রিশগড়—	৪৯৫৮
বাংলা দেশীয় রাজ্য—	২৮২৬৪২
উড়িষ্যা " —	৫৮৬১৬

(১৫৩) সাব্কি

বাংলা—	৪০৬৯
সিকিম—	২৬৬

(১৫৪) সাউন্তা

বিহার—	১৮৮

(১৫৫) সওরিয়া পাহাড়িয়া

বিহার—	৫৮৬৫৪

(১৫৬) শবর বা শাওরা

মাদ্রাজ—	১৪৬৯৬
বিহার—	২৭৫৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	৪৩০১০
উড়িষ্যা—	২৪৮৯৩৩
ছত্রিশগড়—	৩৫৮৮৪১
উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—	৫১৪৯৯

(১৫৭) সেমা

আসাম—	৩৫৭৪১

(১৫৮) শিন

কাশ্মীর—	৫৮২৩

(১৫৯) শোলাগার

মাদ্রাজ—	৪৪৬৩

(১৬০) সুমুওয়ার

বাংলা—	৫৩৭৩
সিকিম—	৫৯৬

(১৬১) সিন্‌টেং

আসাম—	৬৩৭৪১

(১৬২) ঠাকুর

বোম্বাই—	৯৭৭৯৫
দাক্ষিণাত্য দেশীয় রাজ্য—	১২০৪

(১৬৩) থারু

যুক্তপ্রদেশ—	২২৩৮১
বিহার—	৩৮৯৮২

(১৬৪) টিপ্‌রা

বাংলা—	৩৭৩৫২
ঐ দেশীয় রাজ্য—	১০৪৯

(১৬৫) টোডা

মাদ্রাজ—	৬৩০

(১৬৬) তুরী

বিহার—	৭১২৭৭
পশ্চিম ভারত দেশীয় রাজ্য—	৫৬৩

(১৬৭) উলাটান্

কোচিন—	৬৪৭
ত্রিবাঙ্কুর—	৪৯৮৭

(১৬৮) বল্‌বি

বোম্বাই—	৭৩০৩
বড়োদা—	৫৯১

(১৬৯) বর্লি

বোম্বাই—	১৪২২৯৪
বড়োদা	২২৬
গুজরাট—	১০৯৮৪

(১৭০) বাসাওয়া

বোম্বাই—	১৬৫২৫
বড়োদা—	২৬০৩৫

(১৭১) বেতান্

ত্রিবাঙ্কুর—	১১৬৬৭

(১৭২) বেট্টুবান্

ত্রিবাঙ্কুর—	২৩৬৭

(১৭৩) ইয়ানাড়ি

হায়দ্রাবাদ— ১৬৯

(১৭৪) ইয়াশ্‌কুন

কাশ্মীর— ২১৮৮৬

(১৭৫) জুয়াং

উড়িষ্যা— ১৭০৩২

(১৭৬) ভারিয়া

মধ্যভারত— ১৯১৯৮

ভারতের আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যার হিসেব বিভিন্ন আদম সুমারীর রিপোর্টে যেভাবে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে মনে করা যায় না। ১৯৩১ সালের হিসেবের সঙ্গে ১৯৪১ সালের হিসেবের মিল নেই। তেমনই পূর্ববর্তী ১৯১১ সালের হিসেবেও ১৯২১ সালের হিসেবের পরস্পরের মধ্যে অথবা অন্য কোন সালের হিসেবের সঙ্গে মিল নেই।

আদিবাসীর জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি বা স্থানান্তর গমনের কারণই এই হিসেবের অমিলের একমাত্র কারণ নয়। গণনার পদ্ধতির ভুলই হিসেব অমিলের প্রধান কারণ। কখনো ধর্ম হিসেবে আদিবাসীর জনসংখ্যার হিসেব ধরা হয়েছে, কখনো বা ধরা হয়েছে ভাষা হিসেবে। এটাই হিসেব গরমিলের প্রধান কারণ।

একই বছরের রিপোর্টে বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণিত হিসেব পরস্পর থেকে ভিন্ন, এমনও দেখা যায়। দৃষ্টান্ত, ১৯৪১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্টে একটি অধ্যায়ে দেখান হয়েছে যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কোন উপজাতীয় নেই ('ঘ' চিহ্নিত সংখ্যাতথ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আবার অন্য একটি অধ্যায়ে দেখান হয়েছে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গুজর, জাঠ প্রভৃতি কয়েক হাজার উপজাতীয় আছে ('ঠ' চিহ্নিত সংখ্যাতথ্যের ৫৬ নং ও ৬২ নং উপজাতি)।

প্রত্যেক উপজাতিই (tribe) বস্তুতঃ আদিবাসী উপজাতি (aboriginal tribes) নয়। গুজর, জাঠ, বালোচ, ইত্যাদি গোষ্ঠী অবশ্যই উপজাতীয়, কিন্তু তারা আদিবাসী নয়। তারা নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে হিন্দ্-আর্য (Indo-Aryan) বা অন্য কোন নরবংশের (races) মানুষ, ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমান ইত্যাদি। সুতরা 'ঘ' চিহ্নিত সংখ্যাতথ্যে যখন এই সকল অ-আদিবাসী উপজাতীয়কে বাদ দেওয় হ'ল, তখন 'ঠ' চিহ্নিত সংখ্যাতথ্যেও বাদ দেওয়া উচিত ছিল। তা না করলে হিসেবের সঙ্গতি থাকে কি ক'রে? আদিবাসী উপজাতীয় সমাজ এবং অ-আদিবাসী উপজাতীয় সমাজ উভয়ের ইতিহাস ভিন্ন এবং সমস্যাও ভিন্ন। সুতরাং প্রকৃত আদিবাসী উপজাতীয়ের সংখ্যা নিরূপণের জন্য অন্যভাবে এবং ভিন্নভাবে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উদ্যোগ করা উচিত ছিল।

আর একটা ব্যাপার আছে, বহু প্রকৃত আদিবাসী গোষ্ঠী জনসংখ্যা গণনার সময় নিজেকে 'হিন্দু' বলে পরিচয় লিখিয়েছে। ধর্ম হিসেবে নিজেকে হিন্দু বলতে কোন বাধা নেই, কারণ আদিবাসীর ধর্ম বহুবিচিত্র হিন্দুধর্মেরই একটি রূপ মাত্র কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, ধর্মের দিক দিয়ে হিন্দু বললেই কি সমাজের দিক দিয়ে আদিবাসী আদিবাসীত্ব বা উপজাতীয়ত্ব মিথ্যা হয়ে গেল? তা হয় না, যতক্ষণ গোষ্ঠীব উপজাতীয় পদ্ধতিতে তাদের সমাজ চলছে, ততক্ষণ তাদের আদিবাসী সমা বলেই গণ্য করতে হবে, কারণ ততক্ষণ তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা বৈশিষ্ট্যগুলিও লুপ্ত হয় না।

অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীকে ভুল ক'রে 'তপশীল জাতে'র (schedul caste) লোক বলে ধরা হয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা গোঁড়ামির বশে কোন কে আদিবাসীকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করে। কিন্তু কোন হিন্দু যে কোন আদিবাসীকে 'অস্পৃশ্য' মনে করলেই, তাকে তপশীলভুক্ত করতে হবে, এর কি অর্থ আছে যতক্ষণ সামাজিক জীবনে গোষ্ঠীবদ্ধতা আছে, ততক্ষণ তাকে গোষ্ঠী (tribe হিসেবেই গণ্য করা উচিত, 'জাত' (caste) হিসেবে নয়।

আবার বহু আদিবাসী সমাজ আছে, যারা গোষ্ঠীবদ্ধতা হারিয়ে হিন্দুসমাজে একটা ছোট বা বড় 'জাত' হিসেবে স্থান গ্রহণ করেছে। এদের সমস্যা ঠিক প্রকৃত গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসীর সমস্যার মত নয়। এদের কথা অবশ্য আলাদা।

'অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী' (criminal tribes) নামে একটা কথা ব্রিটিশ শাসনবিধির মধ্যে ছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশে কোন কোন 'জাত' বা সমাজ ব্রিটিশ শাসকের বিবেচনায় অপরাধীর জাত, অর্থাৎ অপরাধ করা তাদের জীবিকা বা পেশা, তাদের মনটাই নাকি অপরাধের ধাতু দিয়ে গড়া। পুলিশ এদের গতিবিধির ওপর সদা সতর্ক পাহারা রাখে। এরা ঠিক আদিবাসীও নয় এবং এদের সমাজ ঠিক গোষ্ঠীবদ্ধ উপজাতীয় সমাজের মতও নয়। তবুও এদের 'গোষ্ঠী' (tribe) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং ভুলক্রমে অনেকের নাম আদম সুমারীর উপজাতীয় তালিকায় স্থান পেয়েছে।

অনেক যাযাবর সমাজের নামও উপজাতীয় গোষ্ঠী হিসেবে উক্ত তালিকায় স্থান লাভ করেছে, যারা আদিবাসী সমাজের লোক নয়।

বাংলার আদিবাসী

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাংলার আদিবাসী ও উপজাতীয় সমাজের জনসংখ্যা হ'ল :

বাংলার সমস্ত জিলায়	১৬৫৫৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৩৩৩৯২
কুচবিহার রাজ্য	২৪৩৫
ত্রিপুরা রাজ্য	৩৩৬৬৩৬
সিকিম	৬৩২০৬

র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে বাংলা প্রদেশ দু'ভাগ হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশের আদিবাসী ও উপজাতীদের জনসংখ্যা যথাক্রমে দাঁড়িয়েছে :

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ	১৩৬৮৭৮
পূর্ববঙ্গ প্রদেশ	২৮৭২১৭

সমগ্র ভৌগোলিক পূর্ববঙ্গ ধরলে উক্ত প্রাদেশিক হিসেবের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীর জনসংখ্যা এবং শ্রীহট্ট জেলার একাংশের আদিবাসী জনসংখ্যাও যুক্ত হবে। এই হিসেব ধরলে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববঙ্গের সমগ্র আদিবাসী ও উপজাতীদের জনসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষের কিছু অধিক। আর মাত্র কুচবিহার রাজ্য নিয়ে সমগ্র ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ও উপজাতীয়ের জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৪ লক্ষ।

১৯৪১ সালের সেন্সাস অর্থাৎ আদম সুমারীর রিপোর্টে যে সব আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটাই কিন্তু সব নয়। ১৯৪১ সালের এই হিসেব বস্তুতঃ 'উপজাতীয় ভাষী' জনসংখ্যার হিসেব। উপজাতীয় ভাষায় যত সংখ্যক লোক কথা বলে, এটা তারই হিসেব।

কিন্তু আর একটা কথা আছে। ভারতের অন্যান্য অংশের মত বাংলা দেশেও এমন অনেক গোষ্ঠী আছে, যারা বংশের দিক দিয়ে উপজাতীয় আদিবাসী, কিন্তু তাদের মাতৃভাষা বর্তমানে প্রাদেশিক ভাষা হয়ে গেছে। সুতরাং বাংলা দেশের প্রকৃত আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যার হিসেব নিতে হলে শুধু ভাষাগত বিচার করলেই চলবে না। ভাষা যা-ই হোক্, সামাজিকভাবে যারা উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করছে, তাদের আদিবাসী বা উপজাতীয় বলেই গ্রহণ করা উচিত। কারণ, সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজ এবং আদিবাসী সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য খুব বেশী নয়। এমন কি ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে খুব বেশী উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তারতম্য দেখা যায় না। পার্থক্য হ'ল উভয়ের সামাজিক গঠনের পার্থক্যের মধ্যে। আদিবাসীরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে, আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত গোষ্ঠীবদ্ধতা নেই।

বাংলা দেশে আবার এমন কয়েকটি সমাজ আছে, যারা কোন কালে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজই ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে উপজাতীয়ত্ব এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কোন নিদর্শন নেই এবং তারা ধর্মে, ভাষায় ও সামাজিক আচারে সাধারণ হিন্দু হয়ে গেছে। সুতরাং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে এরা আদিবাসী হলেও, সামাজিক দিক দিয়ে আজ এরা হিন্দু।

দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন উপজাতীয় আদিবাসী সমাজ এবং বৃহত্তর হিন্দুসমাজ —উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণের যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বহুকাল হ'ল চলে আসছে, তার বিভিন্ন অপরিণত অর্ধপরিণত ও পরিণতরূপ হ'ল বাংলার বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ। সুতরাং বাংলার আদিবাসী সমাজের কুলজী বিচার ক'রে তিনটি পর্যায় দাঁড় করানো যেতে পারে :

(১) বংশ হিসেবে আদিবাসী, যাদের ভাষা উপজাতীয়, সমাজও উপজাতীয় অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ।

(২) বংশ হিসেবে আদিবাসী, যাদের ভাষা প্রাদেশিক অথচ সমাজ উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ স্তরেই আছে।

(৩) বংশ হিসেবে আদিবাসী, যারা প্রাদেশিক হিন্দুর ভাষা এবং হিন্দুর সমাজ গ্রহণ ক'রে একটা 'জাত' হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আদিবাসী হয়েও যাদের ভাষা উপজাতীয় নয়, সমাজও উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যে আর নেই।

হিন্দু সমাজভুক্তির এই প্রক্রিয়ার মধ্যে 'ধর্মের' স্থানও অবশ্যই আছে। কিন্তু ধর্ম দ্বারা ঠিক উপাজাতিত্ব বা আদিবাসীত্ব নির্ণয় করা যায় না। এর কারণ, পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ আদিবাসীর ধর্মকে হিন্দুধর্মেরই একটি রূপ বলতে কোন বাধা নেই। এবং খাঁটি উপজাতীয় আদিবাসীরাও নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে আপত্তি করে না। বিভিন্ন আদম স্থমারীর রিপোর্টের দিকে তাকালেই এই বিশেষ সত্যটি উপলব্ধি করা যায়। বহু আদিবাসী আছে, যাদের ভাষা এবং সমাজ দুই-ই খাঁটি উপজাতীয় স্বরূপে রয়েছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তারা নিজেকে 'হিন্দু' বলতে দ্বিধা করে না।

আদিবাসীর উপজাতীয় ধর্ম ও হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক ঐক্য সম্বন্ধে ডাঃ হাটনের সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণার বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মিঃ এলুইনও জোর করেই বলেছেন যে, ভারতের সমস্ত আদিবাসীর ধর্মকে 'হিন্দুধর্মের' অন্তর্গত বলেই গণ্য করা উচিত। শুধু আসামের আদিবাসী ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কোন অভিমত দেন নি। ভারতের আদিবাসীকে ধর্মের দিক দিয়ে (theologically) তিনি 'হিন্দু' বলে মনে করেন, এবং রাজনীতির দিক দিয়েও আদিবাসীকে হিন্দু বলে গণ্য করতে তিনি রাজী আছেন। এ সত্ত্বেও ঠিক ডাঃ হাটনের মতই কে জানে কিসের জন্য অখুশী হয়ে মিঃ এলুইনও আদিবাসীর ধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে একটা বিশিষ্ট ও পৃথক ব্যাপার (a thing distinct and apart) বলেছেন। কেন পৃথক? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আদিবাসীদের বিশিষ্ট কতগুলি ধর্মসংস্কারের

াম করেছেন যেগুলি ঠিক হিন্দুত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। যথা গরু বলি, অপ-
দেবতার পূজা, ধর্মানুষ্ঠানে রক্ত ও মন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি। (১)

মিঃ এলুইনের মন্তব্যের মধ্যে আমরা দু'টি সত্যের প্রমাণ পাই। প্রথম,
আদিবাসীদের ধর্মনীতি ও সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আছে, এবং দ্বিতীয়,
হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও ধারণা নেই। হিন্দুধর্মকে যদি একটা খারাপ
র্ম বলেও তিনি মনে করেন, তবুও তাঁর জানা উচিত যে, এই ধর্মের নীতি ও
ংস্কারের একটা গণ্ডীবদ্ধরূপ নেই। যদি হিন্দুধর্মকে খারাপ বলেই ধরা হয়, তবে
জেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতার বর্ণনার মতই মাত্রাহীন ব্যাপকতার দ্বারাই এই হিন্দু-
খারাপ—'কি না আছে হিন্দুধর্মে কি না আছে ভাই।' আদিবাসীদের যে সব
বশিষ্ট ও পৃথক্ (distinct and apart) সংস্কারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন,
খাঁজ করলে দেখবেন সে সবই হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাত, পাত, গোষ্ঠী ও পন্থীর
কান না কোন মানুষের সমাজে ধর্মসংস্কাররূপেই চলেছে। হিন্দুসমাজের মধ্যেই যে
ত শত সম্প্রদায়, শ্রেণী, আশ্রম ও জাত রয়েছে—এত বিভিন্ন ও বিচিত্র শাক্ত,
সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক রয়েছে—যারা পরস্পর থেকে বিশিষ্ট
বং পৃথক্, কিন্তু তারাই আবার অন্যদিক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এবং,
তারা হিন্দুই।

আদিবাসীকে এত ঘনিষ্ঠরূপে হিন্দু বলে বুঝতে পেরেও মিঃ এলুইন কেন যে
তাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যগুলির ওপর এত জোর দিয়েছেন তার কারণ ঠিক বোঝা
না। আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা ? হিন্দুসমাজের কুপ্রথাগুলি যাতে
তারা গ্রহণ না ক'রে তার জন্যে সাবধানতা ? এই যদি মিঃ এলুইনের উদ্দেশ্য হয়,
তবে ভালই। কিন্তু তার জন্যে আদিবাসীকে পৃথক্ ক'রে ধরবার কোন প্রয়োজন
নেই। কারণ সমস্ত সমস্যাটাই মোটামুটিভাবে 'হিন্দুর সামাজিক সমস্যা', আদিবাসী-
সমস্যা তারই একটি অংশ মাত্র। হিন্দুসমাজের সব সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এক নয়,

(I) The Aboriginals—V. Elwin.

এবং হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য হ'ল বহু সংস্কৃতির সমাবেশ। নিজের সংস্কৃতি বিসর্জন না দিয়েই আদিবাসীরা হিন্দুসমাজে আসতে পারে এবং এসেছেও। হিন্দুর সামাজিকতা আর খৃষ্টীয় সামাজিকতার মধ্যে এইখানে একটা বড় পার্থক্য। হিন্দুসমাজের সংস্কৃতি প্রযোজিত শিল্পের (Directorial Art) মত—একই দেহে বিভিন্ন অলঙ্কারের পরিসজ্জার মত, একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপ্রবণ সংস্কৃতির সমাবেশ। অপরের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ ক'রে অথবা অপরের সংস্কৃতিকে সর্বদা রূপান্তর করিয়ে দিলেই যে জাতিগত সংমিশ্রণ সহজ হয়, হিন্দুসমাজ এই সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজমের পদ্ধতি গ্রহণ করে নি। হিন্দুসমাজ আদিবাসীর সংস্কৃতিকে 'গ্রাস' করতে চাইলে অবশ্য পরিণাম খারাপ হবে, এবং যেখানে যতটুকু গ্রাসের ব্যাপার হয়েছে সেটাও খৃষ্টীয় মিশনারী সঙ্ঘের মত হিন্দুসমাজের টাকার জোরে ব গায়ের জোরে হয় নি। আদিবাসীর ইচ্ছাতেই এই 'ভুল' হয়েছে। মিঃ এলুই হয়তো বলবেন, অবনত দরিদ্র আদিবাসী বাধ্য হয়েই এই ভুল করেছে মিঃ এলুইনের সিদ্ধান্ত যদি সত্য বলেও মেনে নেওয়া হয়, তবে বল্‌তে হয় সমস্যাটা ঠিক সাংস্কৃতিক সমস্যা নয়, হিন্দুসংস্পর্শঘটিত অধঃপতনের সমস্যা নয়। মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতি যদি সম্ভ করা যেতে পারে তবে নিজেদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভালমন্দ বিচার ক তাদের কাছে সহজ হয়ে উঠবে। মিঃ এলুইনের আরও জানা উচিত, আদিবাসী অর্থনৈতিক সমস্যার কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকলেও, বিষয়টা বৃহত্তর এবং সমগ্র হি জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যার একটা অংশ।

আদিবাসীদের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি ব্যাপার বিশে ভাবে প্রণিধানের যোগ্য। দেখা গেছে যে, হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে মিশনারী প্রথায় ধর্মান্তরিত করার কোন উদ্যোগ না থাকলেও বহুকাল থেকে আপনা হতে আদিবাসীরা হিন্দুর ধর্ম ও সমাজে চলে আসছে। আর, খৃষ্টান মিশনারীদে উদ্যোগে কিছু কিছু আদিবাসী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলাম আদিবা মনের ওপর কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি। নিম্নশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ হিন্দু

ওপর ইসলামের প্রতিক্রিয়া খুবই সফল হয়েছে, বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল, আদিবাসীরা কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। ভারতে যখন মুসলমান রাজশক্তি ছিল, তখনো মোল্লা সমাজের দ্বারা চালিত ধর্মান্তরকরণের উদ্যোগ আদিবাসীদের কাছে এসে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বাংলা দেশে যে সব বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বাস ক'রে, তারা নৃতত্ত্ব, ভাষা ও সামাজিকতায় পরস্পর থেকে বিভিন্ন। এদের মধ্যে অধিকাংশকেই বাংলা দেশের বাইরের লোক বলা যেতে পারে। বহু অতীত থেকে বাংলায় বসতি ক'রে আসছে, এমন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা কম এবং এ ধরণের যারা আছে তারা আজ ভাষায় ধর্মে ও সমাজে একরকম হিন্দু হয়েই গেছে। বাংলা দেশে 'আগন্তুক' এই আদিবাসী সমাজকে তাদের মূল ভৌগলিক অধিষ্ঠান হিসেবে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) উত্তরের হিমালয় অঞ্চলের তিব্বতী-মঙ্গোলীয় বিভিন্ন উপজাতির গোষ্ঠী—যারা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এসে বসতি করেছে। উদাহরণ—ভোটিয়া, গুরুং, লেপচা, নেওয়ার প্রভৃতি।

(২) সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি—যারা ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে এসে বাংলায় বসতি করেছে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা প্রভৃতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কুকি প্রভৃতি সমাজ—যারা আরাকান ও বর্মার চীন-পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল হতে এসে বসতি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে যদিও এরা 'আগন্তুক', কিন্তু সেটা বহু অতীতের ঘটনা, আজ তারাই প্রকৃত স্থানীয় অধিবাসী এবং তারাই উক্ত অঞ্চলের বৃহত্তম সমাজ।

(৪) উত্তর-পূর্ব সীমান্তের চীনমঙ্গোলীয় বংশের উপজাতীয় গোষ্ঠী—যারা আসামের দিক থেকে এসে বাংলায় বসতি করেছে। উদাহরণ—গারো, কাছাড়ী, হদি, প্রভৃতি।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাংলা দেশে (সিকিম, কুচবিহার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্য সমেত) মোট ২০টি গোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মাত্র ভাষার ভিত্তিতেই এই ক'টি আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ ধরা হয়েছে। প্রকৃত আদিবাসী সমাজের সংখ্যা আরও বেশী। এ বিষয়ে বরং ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে আরও বিশদ এবং বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, যারা সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ।

উপজাতীয় বিভিন্ন ভাষা অনুসারে ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাংলা দেশে আদিবাসীদের যে বিশটি সমাজের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তারা হ'ল—

ভোটিয়া, চাক্‌মা, দামাই, গুরুং, হদি, কামি, খাস, কুকি, লেপচা, লিম্বু, মংগর, মেচ, ম্রু, মুণ্ডা, নেওয়ার, ওরাওঁ, সাঁওতাল, সারকি, সুনুওয়ার, টিপ্‌রা।

কিন্তু ভাষা অনুসারেই এই তালিকা নির্ভুল নয়। ভাষা অনুসারে সমাজ বিভাগ করলে আরও কয়েকটি বিশেষ আদিবাসী সমাজের নাম উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। যথা: খন্দ, লুসাই ইত্যাদি। খন্দ গোষ্ঠীর আদিবাসী বাংলা দেশে আছে এবং তাদের নিজস্ব ভাষাও আছে—খন্দি বা কন্দি বা কুই। লুসাইও একটি বিশিষ্ট ভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লুসাই ভাষাকে ছাত্র ও পরীক্ষার্থীর 'মাতৃভাষা'রূপে স্বীকারও করেছে। কিন্তু উল্লিখিত তালিকায় এই দুই সমাজের নাম নেই।

অথচ ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের এই তালিকায় চাক্‌মা সমাজের নাম স্থান পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা সমাজও মূলতঃ বাঙলা ভাষী, সে ভাষা বাঙলারই একটি উপভাষা।

আরও প্রশ্ন উঠবে উপজাতীয় ভাষী হদি সমাজের নাম যদি উল্লেখ করা হ'ল, তবে ময়মনসিংহের গারো, হাজং, কাছাড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট উপজাতীয় ভাষী সমাজের নাম কেন উল্লেখ করা হ'ল না?

যদিও হদি, হাজং, গারো ও কাছাড়ী এদের প্রত্যেকের উপভাষা (dialect) একই বোড়ো (কাছাড়ী) ভাষা গ্রুপের অন্তর্গত, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জনসংখ্যার হিসেব। বাংলার গারো ও হাজং-এর সমগ্র জনসংখ্যা কি হদি জনসংখ্যার মধ্যেই এক ক'রে ধরা হয়েছে ? তা ধরা হয় নি।

ভোটিয়া, দামাই, গুরুং, খাস, কামি, লেপচা, লিম্‌বু, মংগর, মেচ, নেওয়ার, সারকি, সুনুওয়ার—এই কয়টি গোষ্ঠীর ভাষা উপভাষা মাত্র, মূল তিব্বতী-চীন ভাষাবর্গের হিমালয় গ্রুপের অন্তর্গত। কিন্তু এদের নাম ভিন্ন ভিন্ন ক'রে দেখানো হয়েছে এবং সেটাই ঠিক। কারণ মূল ভাষাবর্গ এক হলেও এদের প্রত্যেকের উপভাষা পরস্পর থেকে বিশিষ্ট এবং তারা এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সমাজ। একটি সমাজ আর একটি সমাজ থেকে বিশিষ্ট। এই রীতি অনুসারে হদি, গারো ও হাজং ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের নাম ও জনসংখ্যা ভিন্ন ক'রে উল্লেখ করা উচিত ছিল।

আদমসুমারীর রিপোর্টের প্রধান ভ্রান্তি হ'ল, আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা গণনার সুনির্দিষ্ট একটা মান (standard) অনুসরণ করা হয় নি। কখনো ধর্ম, কখনো ভাষা গ্রুপ এবং কখনো বা উপভাষা হিসেবে শ্রেণীবিভাগ এবং জনসংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

বাংলার আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ হিসেবে মাত্র ২০টি গোষ্ঠীর নাম ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত রিপোর্টেরই অন্য অধ্যায়ে (সমগ্র ভারতের আদিবাসী সমাজের তালিকা) বিস্তৃতভাবে সমগ্র ভারতের যে ১৭৬টি উপজাতীয় গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়, যারা বাংলা দেশে স্বল্পবিস্তর আছে, অথচ প্রাদেশিক তালিকায় তাদের নাম উল্লিখিত হয় নি। যথা :

বেদিয়া, বাহেলিয়া, ভুইয়া (ভুঁইহার ?) বিঁঝিয়া, পান, পাসি, দোসাদ, রাভা, নাট, ঘাসি, কাছাড়ী, মাগেসিয়া, ভুমিজ, কোরা, থারু, মালপাহাড়িয়া, গারো, হাজং, খন্দ, লুসাই, হো, মাহলি, তুরী।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সর্বভারতের উপজাতীয় গোষ্ঠীর বিস্তৃত তালিকায় উল্লিখিত কয়েকটি গোষ্ঠীরও নাম আছে। এই সব গোষ্ঠী বাংলা দেশে কিছু না কিছু আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ঐ সালেরই বাংলার উপজাতী গোষ্ঠীর প্রাদেশিক তালিকায় এই কয়টি গোষ্ঠীর কোন উল্লেখ নেই। এক রিপোর্টে শ্রেণী বিভাগের ব্যাপারে দু'জায়গায় দু'রকমের হিসেব কেন ?

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাংলার উপজাতীয় গোষ্ঠীর নাম ও সংখ সম্বন্ধে যে প্রাদেশিক হিসেব ও তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে উপরে উধৃত দু' তালিকায় সব নামই পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ১৯৩১ সালের রিপোর্টে বাংলা উপজাতীয় গোষ্ঠীর নামের তালিকায় আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়, যার উল্লে ১৯৪১ সালের সর্বভারতীয় তালিকায় বা বাংলার প্রাদেশিক তালিকায় কোথা নেই। যথা :

দলু, বেরুয়া, বিন্দ, দোয়াই, জিমদার, খামবু, খামি, খিয়া কুর্মি, কওর, (কাওয়ার ?), মাল (মালার ?), কারেঙ্গা, মুরমি রায়, টোটো।

'শবর' নামে উপজাতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বাংলা দেশে বাঁকুড়া মেদিনীপুর অঞ্চলে আছে। ১৯৪১ ও ১৯৩১ সালের বাংলা দেশের সেন্স রিপোর্টে এই গোষ্ঠীর কোন উল্লেখ নেই। বাংলা দেশের শবর সমাজ সম্পূর্ণরূ হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছে এবং একটা জাত হিসেবে হিন্দুসমাজভুক্তও হয়ে গে সম্ভবতঃ এই কারণে শবর সমাজের কোন উল্লেখ নেই। বাংলা দেশে আদিবা গোষ্ঠীর এই রকম হিন্দুসমাজভুক্তির ইতিহাস বিচার করলে আরও কয়েকটি গোষ্ঠ নাম স্বভাবতঃ মনে পড়ে। সম্পূর্ণ হিন্দুত্ব লাভ হয়েছে, অর্থাৎ একটা 'জাত' হিসে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে গেছে, যদি এই কারণে শবর সমাজের নাম ১৯৩১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ না করা হয়ে থাকে, তবে আরও কয়েকটি সমাজের উল্লেখ না করা উচিত ছিল। যথা, ভূমিজ, ভূইয়া ও কুর্মি সমাজের না

ংলা দেশে বসতি করেছে, ঐ সব সমাজের মানুষ ধর্মে ও সমাজে হিন্দুই হয়ে উপজাতীয়ত্বের আর কিছু নেই। বাংলা দেশে এই রকম সম্পূর্ণ হিন্দুত্ব প্ত এবং হিন্দুসমাজভুক্ত উপজাতীয় সমাজের নাম ধরলে আর একটি তালিকা পারে। যথা:

ভুইয়া, ভুমিজ, কুর্মি, শবর, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী।*

নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এবং নিকট অতীতের ইতিহাস ধরলে ংলার উল্লিখিত সমাজগুলি উপজাতীয় সমাজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা হিন্দু-ভুক্ত। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি ব্যাপারে তাঁরা বাংলার হিন্দুসমাজেরই ন্তর্ভুক্ত। এঁদের উপজাতীয় অবস্থা থেকে সাধারণ হিন্দুসমাজে পরিণত হবার তিহাস বেশী অতীতের ঘটনা নয় বলেই এখনো এঁদের সমাজে বিশিষ্ট কতগুলি প্রাচীন উপজাতীয় সংস্কার বর্তমান আছে।

ভারতের অন্যান্য অংশের মত বাংলা দেশেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাযাবরসমাজ আছে, যাদের মধ্যে বর্তমান উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আছে। এদের উপজাতীয় না বলে উপসমাজই বলা ভাল। এই যাযাবর উপসমাজগুলির তিহাস ভিন্ন। এদের ঠিক আদিবাসীসমাজ বলা চলে না। শিক্ষা, দীক্ষা, ও সামাজিকতায় এই সব উপসমাজ খুবই অবনত। এদের এক-একটা জীবিকা অবশ্য। যেমন কারও পেশা পাখি ধরা, কারও শেয়াল মারা, কারও গো-সাপ কার করা ইত্যাদি। কোন কোন উপসমাজ বন্য ওষধি বিক্রী করে, কেউ-বা শ বা বেতের ডালা-ঝুড়ি তৈরি ক'রে বিক্রী করে। এই সব উপসমাজের আবার একেবারেই জীবিকাহীন। জীবিকাহীন হ'লে স্বাভাবিকভাবে নৈতিক অবনতি যেমন হয়ে থাকে, অনেক উপসমাজের মধ্যে সেটা খুবই হয়েছে। বৃটিশ শাসন-নীতি অনুসারে এই সব জীবিকাহীন উপসমাজের অনেককে 'অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী' (criminal tribes) নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

* ডাঃ হ্যামিল্টন এবং মিঃ রিজ্‌লি উভয়েই বলেছেন যে, কোচ, পালিয়া এবং রাজবংশী নৃতত্ত্বের চারে মূলতঃ একই উপজাতীয় সমাজের মানুষ।

এদের সম্পর্কে গোষ্ঠী বা 'ট্রাইব' (tribe) কথাটা ব্যবহৃত হলেও এদের উপজাতি না বলে উপসমাজই বলা উচিত। ভারতের অন্যান্য আদিবাসীসমাজের সঙ্গে এদের সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য খুব কম। এরা আদিবাসীও নয়, উপজাতীয় নয়। অনেক 'জাত'কেও (caste) অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন বাংলার অঞ্চলবিশেষের বাগ্‌দী।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ভারতের উপজাতীয় গোষ্ঠীর (tribe তালিকায় যে ১৭৬টি নাম দেখা যায়, তার মধ্যে ভুলক্রমে তথাকথিত 'অপরাধপ্রবণ' অনেক উপসমাজের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব অপরাধপ্রবণ উপসমাজের অনেকে বাংলা দেশেও আছে। (১) যথা:

নাট, বেদিয়া, দুসাদ, ঘাসি, পাসি, বাহেলিয়া।

(১) ভারতের 'অপরাধপ্রবণ জাতি'র তালিকায় হিন্দুসমাজের বহু অবনত জাতের নাম আছে ডোম, বাগ্‌দি, মুচি, চামার ইত্যাদি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ভারতের সর্বত্র ডোম, বাগ্‌দি, মুচি চামার 'অপরাধপ্রবণ' জাতিরূপে চিহ্নিত। ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মুচি, বা চামার প্রাদেশি গভর্ণমেণ্টের বিবেচনায় 'অপরাধপ্রবণ'রূপে চিহ্নিত। স্থানীয় কোন সমাজের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা আধিক্য দেখলে অর্থাৎ তারা অপরাধমূলক কাজকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে দেখলে, তবে সে স্থানীয় সমাজকেই 'অপরাধপ্রবণ জাতি' নাম দেওয়া হয়। যুক্তপ্রদেশের কোন অঞ্চলের চাম 'অপরাধপ্রবণ' জাতিরূপে চিহ্নিত, কিন্তু ভিন্ন অঞ্চলের এবং অন্য প্রদেশের আর সব অঞ্চলের চামা সমাজ 'অপরাধপ্রবণ' জাতিরূপে চিহ্নিত নয়। 'অপরাধপ্রবণ' জাতির তালিকায় হিন্দু ও মুসলমা উভয় ধর্মের উপসমাজ আছে। বাঁকুড়া জেলার ভুঁতিয়া মুসলমান, রাজপুতনায় বৈদ মুসলমান ইত্যা উপসমাজ অপরাধপ্রবণ জাতিরূপে চিহ্নিত।

বাঙলার আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক পরিচয়

পূর্ব-প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু আদিবাসী সমাজ বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। বাংলার আদিবাসী বললে মূলতঃ তাদেরই বোঝায়। এক একটি অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠী বিশিষ্ট এক এক ধরনের সংস্কৃতির অধিকারী। সুতরাং বাংলার আদিবাসী সমাজ প্রধানতঃ চারটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির মানুষ। বর্তমান প্রসঙ্গে সেই চারটি আঞ্চলিক ংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণিত হ'ল।

(১) **তিব্বতীয় হিমালয় অঞ্চল থেকে আগত**—ভোটিয়া, দামাই, কামি, াস, খাওয়াস, জিমদার, খাম্বু, লিম্বু, রায়, নেওয়ার, গুরুং, সারকি, সুনুওয়ার, ারু, মংগর, লেপ্চা, মুরমি।

ভোটিয়া : নেপাল, সিকিম, তিব্বত ও ভুটান, এই প্রত্যেক দেশেই 'ভোটিয়া' ধিবাসী আছে। কিন্তু এই চারিটি দেশের ভোটিয়া সমাজ ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি নুসারে একেবারে এক নয়। পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে। বাংলা দেশে ই প্রত্যেকটি দেশের ভোটিয়া কিছু না কিছু আছে। তবে নেপালী ভোটিয়ার খ্যাই সব চেয়ে বেশী। বাংলায় ভোটিয়া উপজাতির অধিকাংশ দার্জিলিং এবং লপাইগুড়ি অঞ্চলে থাকে। অধিকাংশ ভোটিয়া ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের বৌদ্ধ বলে রিচয় দিয়ে থাকে। 'শার্পা' নামে পরিচিত যে শ্রেণীর 'ভোটিয়া কুলি' হিমালয় ারোহী বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদের বোঝাবাহী সহচর হয়ে থাকে, তারা হ'ল নপালী ভোটিয়া। ভারতীয় ফৌজেও নেপালী ভোটিয়ারা অনেকে সৈনিকবৃত্তি হণ করেছে।

দামাই : দামাই সমাজ নেপালেরই একটি সমাজ, যাদের জাত-পেশা হ'ল রজীর কাজ।

কামি : কামি সমাজও নেপালের একটি সমাজ, যাদের জাত-পেশা হ'ল কামারের কাজ। এঁরা 'বিশ্বব্রাহ্মণ' নামে একটা জাতপদবী গ্রহণ করেছেন ধর্মমতে সবাই হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। নিখিল ভারত মেড় রাজপু সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এঁরা উন্নত 'জাত' হিসেবে গৃহীত হয়েছেন।

খাস : নেপালের একটি সমাজ, সম্প্রতি 'ছত্রি' জাত বলে নিজেদের অভিহি করেছেন।

খাওয়াস : নেপালের একটি দাস সমাজ। ১৯২৪ সালে নেপাল দরবারে নির্দেশ অনুসারে এই দাস সমাজের সামাজিক মুক্তি বিধান হয়। এঁরা 'শিবভক্ত একটা জাতপদবী গ্রহণেরও চেষ্টা করেছেন।

জিমদার, খাম্বু, লিম্বু, রায় : ভিন্ন ভিন্ন ন্যমে পরিচিত থাকলেও এই চার নেপালী সমাজ মূলতঃ একই সমাজ। এঁরা সকলেই নেপালের কিরান্তি (অর্থা 'পূর্বদেশীয়') গোষ্ঠীর লোক। প্রায় সকলেই হিন্দু। ভারতীয় ফৌজের গু রেজিমেণ্টগুলিতে এই সমাজের লোক অনেক আছে।

নেওয়ার, গুরুং : এরা নেপালের সমাজ, অধিকাংশ হিন্দু। নেওয়ার রাজবং প্রাচীনকালে নেপালে রাজত্ব করতো, তাদের পরাজিত ক'রে গুর্খারা (ভারতী রাজপুত) নেপালের শাসক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেওয়ারেরা আজকা ব্রাহ্মণত্ব দাবী করে। নেওয়ার ও গুরুং সমাজের খুব অল্পসংখ্যক লোক বৌ বলে পরিচয় দেয়।

সারকি, সুনুওয়ার, থারু, মংগর :—এরা সবই নেপালের এক একটি সমাজ সকলেই হিন্দু।

লেপ্‌চা : এরা অধিকাংশই বৌদ্ধ। অতি সামান্য সংখ্যক 'হিন্দু' 'উপজাতীয় ধর্ম' অবলম্বী বলে দাবী করে।

মুরমি : অধিকাংশ বৌদ্ধ।

(২) **উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে আগত**—ওরাওঁ, সাঁওতাল, খন্দ, হো, মুণ্ডা, মাল পাহাড়িয়া।

খন্দ সমাজ উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে এসেছে। ওরাওঁ, সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা ও মালপাহাড়িয়া হলো ছোটনাগপুর থেকে আগত সমাজ। এদের মধ্যে একমাত্র সাঁওতাল সমাজ বাঙলা দেশে এসে সত্যি ক'রেই একটি কৃষক সমাজ হিসেবে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে স্থায়ীভাবে বাস করছে। অন্যান্য সমাজগুলির অধিকাংশ হিসেবে এসেছে, কেউ চা-বাগানের মজুর, কেউ মাটিকাটা মজুর। তবে যেখানেই স্থায়ীভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, সেখানেই এই সব আদিবাসী চাষবাসও ধরেছে। মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠী রাজমহল অঞ্চলে থাকে, এবং খান থেকেই বাঙলা দেশে এসেছে। এরা এখানে এদের উপজাতীয় ভাষা বর্জন র নি, তবে স্থানীয় প্রাদেশিক ভাষাতেও এরা অভ্যস্ত। ধর্মের দিক দিয়েও প্রভাবিত, যদিও উপজাতীয় ধর্ম সংস্কার বর্জিত হয় নি। কিন্তু সকলের ধ্যে একটা আগ্রহ খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়, সকলেই 'হিন্দু' নামে পরিচিত ত চায়। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, উপজাতীয় সমাজ বং উপজাতীয় ধর্ম অক্ষুন্ন রেখেই এদের অধিকাংশ নিজেকে 'হিন্দু' বলে পরিচয় । উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর থেকে আগত এই সব উপজাতীয় সমাজের ধিকাংশ পশ্চিম বঙ্গে বসতি করেছে, কৃষকরূপে। তার পর চা-বাগান অঞ্চলে, রূপে। বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও অল্পসংখ্যায় মজুর হিসেবেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীর অধিকাংশ উত্তর বঙ্গের রাজসাহী, লপাইগুড়ি ও দিনাজপুরে দেখতে পাওয়া যায়।

(৩) **বর্মা অঞ্চল থেকে আগত**—কুকি, টিপ্‌রা, লুসাই, চাকমা, ম্রু, য়াং, খামি।

কুকি: ১৯৩১ সালের সেন্সাসে এদের মধ্যে মাত্র ৬০৮ জন খৃষ্টান, ২১১৭ জন পজাতীয় ধর্মের লোক পাওয়া যায়, বাকী সবাই 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়।

কুকিদের ঘর মাচান পদ্ধতিতে গঠিত। মেয়েরা পরপুরুষের সামনে ওড়না গায়ে দিয়ে বের হয়। বাঁশি বাজানো এদের খুবই প্রিয় একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন।

টিপ্‌রা : টিপ্‌রা সমাজে 'অগ্রসর' ও 'অনগ্রসর' সমাজ আছে। ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমাজও আছে। সমতলবাসী টিপ্‌রা সমাজ বাঙালী সংস্কৃতিতে দীক্ষিত। ধর্মে অধিকাংশ 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরাতেই অধিকাংশ বসতি। মৈমনসিংহেও 'টিপ্‌রা' নামে পরিচিত কিছু লোক আছে। অনগ্রসর সমাজের টিপ্‌রাদের মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতি দেখা যায় না। বরং তাদের মধ্যে নাগা সংস্কৃতির আধিক্য দেখা যায়।

লুসাই : লুসাই সমাজে খৃষ্টধর্ম খুবই প্রচারিত হয়েছে এবং অধিকাংশই খৃষ্টধর্মাবলম্বী। খুব অল্পসংখ্যক 'হিন্দু' এবং 'উপজাতীয়' ধর্মাবলম্বী নামে পরিচিত।

খিয়াং : পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি, ধর্মে 'বৌদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। এরাও বাঙালীর মত ধুতি পরিধান করে। ঘরগুলি মাচান ভঙ্গীতে গঠিত। এরা আরাকান অঞ্চল থেকে এসে এখানে বসতি করেছে বলে ধারণা হয়।

খামি : পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি, ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী জনসংখ্যা হ'ল ১৬১৬।

চাকমা : পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী সংস্কৃতিতে দীক্ষিত একটি সমাজ। ভাষা বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা বলতে পারা যায়। ধর্মে 'বৌদ্ধ' হিসেবে পরিচিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা ভারতের আদিবাসী সমাজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সমাজ। বর্তমানে এঁদের দেশ পাকিস্থানের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার অনাচারের ফলেই এই দশা হয়েছে। বাঙালী সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসারের একটি প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ হ'ল চাক্‌মা সমাজ।

১৯২৬ সালে আসামের নৃতাত্ত্বিক তথ্যের ডিরেক্টর (Director of Ethnography) মিঃ জে. পি. মিল্‌স্ (J. P Mills) পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা প্রভৃতি সমাজের এক বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। মিঃ মিল্‌সের বিবরণ অনুযায়ী চাক্‌মা সমাজ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উল্লিখিত হ'ল।

"বর্তমানে যিনি 'চাক্‌মা রাজা' তিনি ৪৫তম রাজা নামে অভিহিত। অর্থাৎ তাঁর পূর্বে ৪৪ পুরুষ রাজত্ব হয়ে গেছে। ১৮ শতাব্দীতে কক্স বাজার অঞ্চলের দিক থেকে এই সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। এঁরা আচারে ব্যবহারে ও সংস্কৃতিগত বিষয়ে খুববেশী বাঙালী হয়ে গেছেন ('most Bengalised tribe'), এঁদের ভাষা মূল বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা (dialect)। চাক্‌মা সমাজের একটি শাখা কিছুদিন আগেও মগ ভাষায় কথা বলতো। চাক্‌মাদের লিখবার অক্ষর বা লিপিগুলি হ'ল প্রাচীন বাংলা অক্ষর। গ্রীয়ার্সন বলেন এই লিপি হ'ল প্রাচীন 'মনখমের' লিপি। চেহারার দিক দিয়েও চাক্‌মাদের সঙ্গে বাঙালী সমাজের সাদৃশ্য রয়েছে। চেহারার মধ্যে মঙ্গোলীয়ত্বের খুব কম লক্ষণ দেখা যায় ('show little trace of their partially Mongol origin')। সম্পন্ন চাক্‌মা পুরুষ বাঙালীর মতনই ধুতি পরিধান করে। মেয়েদের পরিচ্ছদ অবশ্য বাঙালী মেয়ের পরিচ্ছদের মত নয়, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত স্কার্টের মত রঙীন (নীলবর্ণের) পরিচ্ছদ। যৌবন প্রাপ্ত হবার আগে পর্যন্ত মেয়েরা কোন বক্ষোবাস পরে না। উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত থাকে। যৌবনাগমের পরে রেশমী কাপড় দিয়ে কাঁচুলির মত ক'রে বুক বেঁধে রাখে। বাঙালী মেয়ের মতই নাকে ও কানে অলঙ্কার ধারণ করে। গলায় রূপোর হাঁসুলি এবং মাথার চুল ছিঁড়ে খোঁপার মত বাঁধা।

"চাক্‌মা গ্রামগুলি স্রোতের ধারে অবস্থিত। সম্পন্ন ব্যক্তিরা ইটের দালান বাড়িতে বাস করে, কিন্তু গরীবদের ঘরগুলি মগ কুটীরের মত। চাক্‌মা সমাজ গুলি 'গোজা'তে (clan) বিভক্ত। পূর্বে প্রত্যেক গোজার এক একটি ক'রে দেওয়ান' (প্রধান) ছিল। ব্রিটিশ আমলে এক একটি 'গোজা'র বসতি অঞ্চলকে

এক একটি মৌজা রূপে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। এবং ব্রিটিশ আমলেই দেওয়ান শাসিত গোষ্ঠীগত জীবনচর্যার প্রথা বিনষ্ট হয়ে যায়। ব্রিটিশ রীতি অনুসারে সার্কেল অফিসারে মত মৌজার এক একজন শাসনপরিচালক বস্তুতঃ প্রধান কর্তা হয়ে ওঠে।

"বর্তমানে চাকমা সমাজ ধর্মে বৌদ্ধ। কিন্তু ধর্মগত আচারগুলির মধ্যে বৌদ্ধত্বের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এরা নামেই বৌদ্ধ। ব্রিটিশ আমলেই কালিন্দী রাণী নামে চাকমা সমাজের এক রাণী ছিলেন। তিনিই একদিন সকলকে 'বৌদ্ধ' হবার জন্য নির্দেশ দেন। বর্তমানে চাকমা সমাজে একজন মাত্র বৌদ্ধ পুরোহিত দেখতে পাওয়া যায়। ১৮ শতাব্দীতে চাকমা সমাজে কিছু কিছু লোক মুসলমান হয়েছিল। চাকমা রাজা এবং সর্দারেরা ধর্মে মুসলমান না হয়েও সে সময় মুসলমান নাম গ্রহণ করেছিল। এর কিছুকাল পরে চাকমাদের আগ্রহ হিন্দুত্বের দিকেই প্রসারিত হয়।

"বর্তমানে চাকমা সমাজে শুধু রাজার ঘরের মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথা আছে দেখা যায়। এই প্রথা কালিন্দী রাণীর সময় থেকে প্রচলিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত প্রথম ব্রিটিশ অফিসার মিঃ লিউইন-এর (Lewin) সঙ্গে যেদিন কালিন্দী রাণী সাক্ষাৎ করেন, সেদিন তিনি ঘোম্‌টা দিয়ে মুখ ঢেকেছিলেন। সেই থেকে পর্দা বা ঘোম্‌টা প্রথা রাজবাড়ীর মেয়েদের মধ্যে চলে এসেছে।

"চাকমা গরীবেরা কপ্‌নির মত ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করে। চাকমা সমাজ লাঙ্গল প্রথায় কৃষি করে। মেয়েরা সুতো কাটতে ও বস্ত্র বুনতে পারদর্শিনী। এদের তাঁত ভারতীয় তাঁতের মত নয়, ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের তাঁতের মত।"

ম্রু: এরা আরকান থেকে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি করেছে। এরা ধর্মে 'বৌদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। ম্রুং নামে টিপ্‌রাদের যে একটি শাখা আছে তাদের সঙ্গে এই ম্রুং সমাজের কোন বংশগত সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নেই। এদের চেহারার মধ্যে মঙ্গোলীয় লক্ষণ একেবারেই দেখা যায় না। পুরুষেরা মালকোঁচা দিয়ে ছোট লাল রঙের বা সাদা ধুতি পরে। বস্ত্রশিল্প এদের ঘরের শিল্প। পুরুষেরা

পাগড়ী পরে। দাঁত কালো করা এদের একটা প্রসাধন প্রথা। পুরুষেরা মাকড়ি পরে। অল্পবয়সের ছেলেরা কোমরে পুঁতির মালা জড়ায়।

মেয়েরা নীল রঙের ছোট ছোট ঘাগ্‌রা পরে, হাঁটু পর্যন্ত বহর। স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক লজ্জাবোধের সংস্কার সাধারণ সভ্যতার সংস্কার থেকে পৃথক্‌। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে প্রকাশ্যভাবে একই স্থানে নগ্ন হয়ে স্নান করতে কোন দ্বিধা অনুভব করে না।

(৪) **আসাম অঞ্চল থেকে আগত**—দলু, দোয়াই, হদি, গারো, হাজং, মেচ, রাভা, কাছাড়ী।

এই কয়টি সমাজ আসাম অঞ্চল থেকে এসে উত্তরবঙ্গে বসতি করেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ সমাজই হিন্দুত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। একমাত্র গারো সমাজে হিন্দুত্বের প্রভাব বেশী বিস্তার লাভ করে নি। ভাষার বিচারে এই কয়টি উপজাতি মূলতঃ আসামের 'বোড়ো' বর্গের অন্তর্গত, নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে এদের মূল নরবংশও বোধ হয় একই। কিন্তু বর্তমানে উক্ত প্রত্যেকটি সমাজ সাংস্কৃতিক বিষয়ে এক নয়, পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। দলু, দোয়াই, হদি ও হাজং বংশ হিসেবে গারোদের সমগোত্র, কিন্তু বর্তমানে গারোদের সঙ্গে তাদের খুব বেশী সামাজিক সাদৃশ্য নাই।

দলু: গারো সমাজেরই একটি অংশ। সংস্কৃতি গারোদেরই মতন।

দোয়াই: রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলেই অধিকাংশের বসতি, বাকী অংশ বগুড়া ও মৈমনসিংহে।

হদি: অধিকাংশের বাস মৈমনসিংহে, এঁরা একটি হিন্দুত্বপ্রাপ্ত সমাজ। এঁরা ধর্মকর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগের প্রথা গ্রহণ করেছেন, সমাজে 'জাত' প্রথাও ঢুকেছে। পর্দা প্রথা বা নারী সমাজের পক্ষে ঘরের বাইরের কার্য নিষিদ্ধ করা, বাল্যবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহ নিষেধ ইত্যাদি সংস্কার এঁরা গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন হ'ল এঁরা নিজেদের হৈহয় ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন। পুরাণে একটি হৈহয় জাতির নাম শোনা যায় যাঁরা দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব

করতেন এবং চালুক্যরাজ বীনাদিত্য খৃষ্টোত্তর সপ্তম শতকে তাঁদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু সেই হৈহয়ের সঙ্গে মৈমনসিংহের হদি সমাজের ঐতিহাসিক সম্পর্ক যে কী থাক্‌তে পারে, তা অনুমান করা নেহাৎই কষ্টকল্পনা।

হাজং: হাজং সমাজ হিন্দুত্ব প্রভাবিত হলেও হদি সমাজের মত এত বেশী ভাবে হয় নি। এদের সমাজে নারীদের পর্দা প্রথা বা আবরণ প্রথা নাই। উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাস ও বিধি অজস্রভাবে এদের মধ্যে এখনো রয়েছে। এদের উপজাতীয় টোটেম দেবতাদের স্থানে ধীরে ধীরে হিন্দু দেবতারা স্থান লাভ করতে আরম্ভ করেছে। এঁরাও মৈমনসিংহ অঞ্চলেই থাকেন।

গারো: বাঙলা দেশের গারোসমাজও অধিকাংশ মৈমনসিংহেই থাকেন, কিছু জলপাইগুড়িতে থাকে। স্থানীয় ভাষায় এদের 'মান্দাই' বলা হয়, এদের উপজাতীয় সমাজগঠন এখনো অটুট আছে। ধর্মেও উপজাতীয় সংস্কার বর্তমান, আচার বিচার ও খাদ্য সম্পর্কে এদের মধ্যে কোন হিন্দুসুলভ সংস্কার নেই। একমাত্র বিড়াল ছাড়া আর সব জন্তু জানোয়ারই গারোর কাছে ভক্ষ্য রূপে অনুমোদিত। নাগাদের মতই এরা ডিম বা দুধ খায় না, কারণ আদিম সংস্কার অনুসারে এই দুইটি বস্তুকে পাখী ও পশুর পুরীষতুল্য বস্তু বলে এরা মনে করে। গারো সমাজের বংশধারা পিতৃপুরুষানুক্রমে গণ্য করা হয় না, মাতৃপুরুষ অনুসারেই (matrilineal) ধরা হয়।

কাছাড়ী: এরা সম্পূর্ণ হিন্দুত্বপ্রাপ্ত সমাজ, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং মৈমনসিংহেই এদের অধিকাংশ বসতি।

মেচ: এরা মুগা ও এণ্ডি শিল্পে অভ্যস্ত। উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুরে বসতি। এই সমাজের বহু পরিবার আসামে চলে গেছে। ১৯১১ সালের লোকগণনা অনুসারে এদের জনসংখ্যা ছিল ২০৭৩০, কিন্তু ১৯৩১ সালের গণনায় পাওয়া যায় ৯৯৮৪ জন। এই সংখ্যাহ্রাসের কারণ হ'ল আসামে চলে যাওয়া।

রাভা: রাভা সমাজের বসতি জলপাইগুড়িতে, এরা আসামেরই 'বোড়ো' গোষ্ঠীর মানুষ।

(৫) উত্তরবঙ্গে হিন্দুত্বপ্রাপ্ত আদিবাসী সমাজ—কোচ, পালিয়া, রাজবংশী।

কোচ: কোচ সমাজের অনেকে বর্তমানে নিজেদের 'পতিত ক্ষত্রিয়' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। ১৯২১ সালে কোচ সমাজের জনসংখ্যা ছিল ১৩১২৭৩, এবং ১৯৩১ সালের জনসংখ্যা হ'ল ৮১,২৯৯। জনসংখ্যায় এই হ্রাস সত্যি ক'রে হ্রাস নয়। বহুলোক জাতের পরিচয় 'ক্ষত্রিয়' বলে দেওয়ার ফলেই ১৯৩১ সালের গণনায় কোচসমাজের জনসংখ্যা এত কম দেখা যাচ্ছে। মৈমনসিংহ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, রঙ্গপুর ও বগুড়া—এই কয়টি জিলাতেই কোচসমাজের প্রধান বসতি।

পালিয়া: কোচসমাজেরই অনুরূপ এদের সংস্কৃতি ও সামাজিকতা। ১৯৩১ সালের গণনায় পালিয়া সমাজের জনসংখ্যা ছিল ৪৩১৬৩। মৈমনসিংহ জলপাই-গুড়ি, কুচবিহার, রঙ্গপুর ও বগুড়ায় প্রধান বসতি। কোচ এবং পালিয়া উভয় সমাজই অতীতে কুচবিহার অঞ্চলের উপজাতীয় সমাজ ছিল।

রাজবংশী: জাত হিসেবে এঁরা বাংলার তৃতীয় বৃহত্তম সমাজ। ১৯২১ সালের জনসংখ্যা হ'ল ১৭২৭১১১, এবং ১৯৩১ সালের জনসংখ্যা হ'ল ১৮০৬৩৯০। ধর্মে এরা সম্পূর্ণ হিন্দু, কিন্তু সামাজিকতায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। বিবাহ সম্বন্ধে এমন কয়েকটি প্রথা সমাজসম্মত ভাবে এখনো প্রচলিত আছে, যা অন্যান্য সমাজের তুলনায় বিশিষ্ট এবং পৃথক্। রাজবংশী সমাজে ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করার ফলে, সামাজিক প্রথায়ও তাঁরা বর্ণহিন্দুদের মত সংস্কারগুলি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছেন। ১৯৩১ সালের আদম সুমারিতে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত কতগুলি বিশেষ সামাজিক প্রথার উল্লেখ ডাঃ হাটন করেছেন। পত্যন্তর, বিধবা-বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা ছাড়া, আরও কয়েকটি সমাজানুমোদিত প্রথা আছে। যথা, "গা-গোছ" প্রথা যাকে প্রাক্‌বিবাহ দাম্পত্য ('companionate marriage') বলা যেতে পারে।*

*Dr. Hutton Census of India, Report, 1931.

ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনের ফলে রাজবংশী সমাজের অনেকে উপবীত গ্রহণ করেন এবং কাশ্যপ গোত্রও গ্রহণ করেন। কিন্তু আইন অনুসারে এই ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার ক'রে নিলে একটা বিষয়ে আপত্তির ব্যাপার ঘটে। এদের বিবাহকে আইন অনুসারে 'ক্ষত্রিয়-বিবাহ' বলবার পক্ষে বাধা ছিল। কারণ, সকলেই কাশ্যপ গোত্র এবং স্বগোত্র বিবাহ নিশ্চয়ই 'ক্ষত্রিয়-বিবাহ' হতে পারে না। কলকাতা হাইকোর্টের এই রুলিংয়ের পর রাজবংশী সমাজে গোত্রবিভাগ দেখা দেয়। শাণ্ডিল্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, গৌতম, কপিল, কৌশিক প্রভৃতি ১২টি বিভিন্ন গোত্র রাজবংশী সমাজে প্রচলিত হয়।

(৬) পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুত্বপ্রাপ্ত আদিবাসী সমাজ—ভুইয়া, ভূমিজ, কুর্মী, শবর, মাল, মাহ্‌লি, তুরী।

ভুইয়া: মেদিনীপুর এবং বর্ধমানেই সবচেয়ে বেশী বসতি। মেদিনীপুরে ১৪৭২৬ জন এবং বর্ধমানে ৯৯০৮ জন।

ভূমিজ: মেদিনীপুরে সবচেয়ে বেশী বসতি, ৪৫০৭৭৯ জন। এর পরেই বাঁকুড়া হ'ল ভূমিজদের প্রধান বসতি অঞ্চল, ১৮১০৬ জন।

কুর্মী: ১৯২১ সালে বাঙলা দেশে কুর্মীর সংখ্যা ছিল ১৮১৪৪৭ এবং ১৯৩১ সালে ১৯৪৬৫২ জন। এক মেদিনীপুরেই ৮৫৭১১ জনের বসতি। সম্প্রতি এই সমাজ নিজেকে কুর্ম-ক্ষত্রিয় নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছে। এদের পদবী হ'ল—মাহাতো।

মাহ্‌লি: রিজ্‌লির মতে এরা হ'ল 'দ্রাবিড়' গোষ্ঠীর লোক। বর্তমানে পাল্‌কি বেহারার কাজ ও বাঁশের কাজ করাই এদের প্রধান জীবিকা। জলপাই-গুড়িতে সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় এদের বসতি, ৭১৭১ জন। তার পরেই মেদিনীপুর (৩১৭৮ জন) এবং দিনাজপুর (৩১৫৩ জন) হ'ল এদের প্রধান বসতি অঞ্চল। সমগ্র মাহ্‌লি সমাজের সংখ্যা ১৯,১০১ জন। ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুসারে দেখা যায় যে, ১৬২০২ জন হিন্দু হিসেবে, ১৭৩৭ জন উপজাতীয় ধর্মাবলম্বী হিসেবে এবং ১১০৭ জন খৃষ্টান হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়।

বর্ধমানের মাহ্‌লি সমাজের বাঙালীত্ব ঘটেছে। ভাষা বর্তমানে বাংলা, কিন্তু তবু এদের ভাষার মধ্যে কতগুলি উপজাতীয় শব্দ এবং বাক্য আজও মুখে মুখে রয়ে গেছে। দাক্ (জল), দাকা (ভাত), গুড়া (ঘর), দানড়ী (গরু) এই সব শব্দ এখনো এদের মধ্যে প্রচলিত। তা ছাড়া, কতগুলি উপজাতীয় ভাষার শব্দসম্বলিত বাক্যও রয়ে গেছে। যথা—"দেলা হিজুক ছে," অর্থ, আমার কাছে এস। 'ওকাতে চালায়া', অর্থ, তুমি কোথায় যাচ্ছ? 'ওয়াতে চালা কানা', অর্থ, বাড়ী যাও।

মাল : ১৯২১ সালে ছিল ১১৭৫৩৭ জন, ১৯৩১ সালে দাঁড়ায় ১১১৪২২ জন। এর মধ্যে বীরভূমেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় মাল সমাজের বসতি, ৪০৯৯৯ জন। তারপরেই বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ এবং ময়মনসিংহে এদের প্রধান বসতি বলা যায়।

শবর : মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়াতেই অধিকাংশ শবরের বাস। এঁরাও নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিচ্ছেন এবং উপবীত গ্রহণ করছেন।

তুরী : ছোটনাগপুর, অঞ্চল থেকে আগত সমাজ। ঝুড়ি তৈরী করাই জাতপেশা। দিনাজপুর, মালদহ এবং জলপাইগুড়িতে অধিকাংশের বাস। মোট জনসংখ্যা ১৭৫০২, এর মধ্যে ১৩০২ জন উপজাতীয় ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেয় (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

(৭) কয়েকটি উপসমাজ—ঘাসি, পাসি, নাট, বিন্দ্, দোসাদ, ঝিঁঝিয়া, কওর, বাহেলিয়া, কারেঙ্গা, নাগেসিয়া, পান, কোরা, বেরুয়া, টোটো, বেদিয়া, রাজোয়ার, কাপুরিয়া।

উল্লিখিত সমাজগুলিকে বর্তমানে ঠিক আদিবাসী বলা যায় না, কারণ এদের জীবনযাত্রা বর্তমানে আর গোষ্ঠীবদ্ধ (tribal) প্রথায় চলে না। তবে অতীতে তারা আদিবাসী সমাজের লোক ছিল সন্দেহ নেই। এদের উপসমাজ বলা চলতে পারে। কোন কোন সরকারী সেন্সাস বিবরণীতে এবং নৃতাত্ত্বিকের বর্ণনাতে এই সব সমাজকে 'উপ-জাত (Sub-Caste) বলা হয়েছে। উল্লিখিত প্রত্যেকটি

উপসমাজ বাঙলার বাহির থেকে আগত এবং সরকারী খাতায় অনেকে অপরাধ প্রবণ জাতি (criminal tribes) রূপে চিহ্নিত।

ঘাসি : এরা মূলতঃ ছোটনাগপুর এবং মধ্যভারত অঞ্চলের মৎস্যশিকারী ও চাষী সমাজ। পুরুষেরা লোকের বিবাহ ইত্যাদি উৎসবমূলক অনুষ্ঠানে বাঁশী ও বাদ্য বাজায়, মেয়েরা ধাইয়ের কাজ করে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে এদের সংখ্যা দেখা যায় ৫৬৪০ জন। অর্ধেকের বেশী জলপাইগুড়িতে বাস করে (২৩৭৮ জন) এবং চব্বিশ পরগণাতে ১২১৭ জন। খুব অল্পসংখ্যক ঘাসি উপজাতীয় ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেয়, প্রায় সকলেই হিন্দু বলে পরিচিত।

পাসি : চব্বিশ পরগণাতে অধিকাংশের বাস। তাল এবং খেজুরের রস আহরণ এবং তাড়ি তৈরী করাই এদের জাতগত জীবিকা।

নাট : বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালিতে অধিকাংশের বাস। অনেকে যাযাবর জীবন যাপন করে।

বিন্দ্ : মালদহ জেলাতেই অর্ধেকের ওপর বিন্দ্ বাস করে। সমগ্র বাংলার বিন্দ্ সমাজের জনসংখ্যা হ'ল ১৯৫১৮ জন (১৯৩১ সালের সেন্সাস)। হুগলীতে ১০০২ জন, নদীয়াতে ১৮২৪ জন। মাটিকাটা, মাছধরা, জন্তুশিকার, গাছ-গাছড়ার শিকড় ইত্যাদি ওষধি বিক্রয় করা এবং সোরা তৈরী করা এদের জীবিকা।

ঝিঁঝিয়া : ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এদের সংখ্যা হ'ল ৫০২ জন মাত্র। দার্জিলিং, ত্রিপুরারাজ্য ও জলপাইগুড়িতে এদের বাস।

দোসাদ : বিহার ও ছোটনাগপুর থেকে আগত কৃষিপ্রবণ জাত। ঘোড়ার সহিস রূপে সাধারণতঃ এরা সহরে এসে কাজ গ্রহণ করে থাকে। ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী জনসংখ্যা হ'ল ৩৬৪২০ জন। বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, রঙ্গপুর, মালদহ, মৈমনসিংহ, চব্বিশ পরগণা এবং কলকাতায় এরা প্রধানতঃ বাস করে।

কওর : অধিকাংশ মৈমনসিংহে থাকে। ১৯৩১ সালে সমগ্র বাংলায় এদের মোট সংখ্যা ছিল ১৮০১ জন। ছোটনাগপুর থেকে আগত একটি সমাজ।

বাহেলিয়া : ১৯৩১ সালে বাংলা দেশে মোট ৪৪৪৯ জন বাহেলিয়া ছিল। মৈমনসিংহেই অর্ধেকের বেশীর বাস। কোন কোন বেদিয়া সমাজের মত জন্তু শিকার ক'রে এরা জীবিকা নির্বাহ করে।

কারেঙ্গা : পশ্চিম বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র সমাজ। কাঠের কাজ, মাটি কাটা এবং বিশেষ করে গরুর গাড়ীর চাকা তৈরী করা এদের জীবিকা। গরু এবং ছাগলকে খাসি করার কাজও এদের বিশেষ জীবিকা। ১৯৩১ সালে জনসংখ্যা ছিল মোট ৯৮৫৫, মেদিনীপুরেই অর্ধেকের ওপর কারেঙ্গার বসতি, বাকী অংশ হাওড়া জিলায়।

নাগেসিয়া : জলপাইগুড়িতে ১৬৪১ জন এবং দার্জিলিংয়ে ৩৫৮ জন, এই হ'ল নাগেসিয়া সমাজের জনসংখ্যা (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

পান : ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী চব্বিশ পরগণাতে ৩১২ জন, এবং মেদিনীপুরে ২৭০ জন পান সমাজের লোক আছে দেখা যায়। ঝুড়ি ডালা তৈয়ারী করা, বস্ত্র বয়ন এবং নিম্নশ্রেণীর চাকরের কাজ করা এদের জীবিকা।

কোরা : জনসংখ্যা ৪৯২৬৫ (১৯৩১ সালের সেন্সাস)। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে অধিকাংশের বাস।

বেরুয়া : পূর্ববঙ্গের একটি মৎস্যশিকারী ও কৃষিজীবী ক্ষুদ্র সমাজ। রিজ্‌লি বলেন, এরা প্রাচীন 'চণ্ডাল' গোষ্ঠীর একটি শাখা। ১৯৩১ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩১৩৫, চট্টগ্রামেই অধিকাংশের বাস (২৬৪৩ জন)। বেরুয়া সমাজের মধ্যে ২৭৬৮ জন নিজেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রূপে পরিচয় দেয়।

টোটো : টোটো একটি বিচিত্র সমাজ, মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ, জলপাইগুড়ি জিলার আলিপুর ডুয়ার্স মহকুমার উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে এই সমাজের বাস। এরা সংখ্যায় মাত্র ৩৩৪ (১৯৩১ সালের হিসেব)। এদের ধর্মচর্চায় নানারকম 'দেবী'-

পূজার প্রথা দেখা যায়। দেবীকে মুর্গি, শূকর প্রভৃতি জন্তু বলি দেবার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে।

রাজোয়ার: ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে আগত উপজাতীয় সমাজ। মেদিনীপুরে ৪৫৬১ জন, নদীয়ায় ৩৩৮১ জন, বর্ধমানে ২০৬৭ জন, ২৪ পরগণায় ১৭৩০ জন, মুর্শিদাবাদে ১৬২৩ জন, রাজসাহীতে ১৩৯৪ জন, রঙ্গপুরে ১৪০১ জন, এবং মালদহে ১১৯১ জন বাস করে (১৯৩১ সালের সেন্সাস)।

কাপুরিয়া: মূলতঃ মধ্য প্রদেশের একটি যাযাবর জাত। ঘোড়া বিক্রী করা এদের অন্যতম জীবিকা। ১৯৩১ সালের সেন্সাসের হিসেব অনুসারে জনসংখ্যা মাত্র ১৭০, সমাজের প্রায় অর্ধেক মেদিনীপুরে বাস করে, বাকী চব্বিশ পরগণায়।

বেদিয়া: রিজ্‌লি বলেন বাঙলার বেদিয়া সমাজ সাঁওতাল গোষ্ঠীর একটি শাখা। বেদিয়ারা একটি যাযাবর সমাজ। ১৯৩১ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৭২৬৩ জন।

এই সকল উপসমাজগুলি গোঁড়া হিন্দুদের কাছে "অস্পৃশ্য" রূপে বিবেচিত।

স্বাধীন ভারত ও আদিবাসী

ভারতে ব্রিটিশশাসন অন্তর্হিত হয়েছে। ভারতের আদিবাসী অঞ্চলের ওপর ব্রিটিশ শাসনের সুদীর্ঘ অধ্যায়ও সমাপ্ত হয়ে গেছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। এখন আরম্ভ হ'ল স্বাধীন ভারতের ইতিহাস। এর পর ভারতবাসী তার নিজের রচিত শাসনতন্ত্র অনুসারে নিজের দ্বারা নিজে শাসিত হবে। সেই শাসনতন্ত্রের খসড়াও রচিত হয়ে গেছে। ভারতের ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্ট বা প্রতিনিধি সভা শীঘ্রই এই শাসনতন্ত্রের খসড়াকে বিচার ও বিবেচনা ক'রে এবং অবশ্যই কিছুটা রদবদল ক'রে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করবেন।

স্বাধীন ভারতের এই শাসনতন্ত্রের খসড়ায় আদিবাসী সমাজের সম্পর্কে কতগুলি বিশেষ নীতি ও নির্দেশের উল্লেখ আছে।

ব্রিটিশ আমলে 'বহির্ভূত' অঞ্চল এবং 'আংশিক বহির্ভূত' অঞ্চল নামে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট আদিবাসী অঞ্চলের তালিকা, ইতিহাস এবং পরিচয় পূর্ব-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়াতেও আদিবাসী-অধ্যুষিত কতগুলি বিশেষ অঞ্চলের একটি তপশীল (Schedule) রচনা করা হয়েছে। এই তপশীলভুক্ত অঞ্চলের (Scheduled Area) তালিকাটি উধৃত করা গেল। ভারত-বর্ষের এক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্থানে পরিণত হয়েছে। সুতরাং অনেকগুলি আদিবাসী অঞ্চল পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভারতের বাইরেই চলে গেছে। বর্তমান ভারতের প্রাদেশিক সীমার মধ্যে নিম্নোক্ত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে তপশীলভুক্ত-করা হয়েছে :

(১) মাদ্রাজ : লাক্কাদ্বীপপুঞ্জ (মিনিকয় সমেত), আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ ; পূর্ব-গোদাবরী এজেন্সি।

(২) বোম্বাই : পশ্চিম খান্দেশের অন্তর্গত নবপুর পেঠা, আকরানি মহল এবং মেওয়াসি সর্দারদের অধীন কয়েকটি গ্রাম, যথা : (১) কাঠি পর্বি, (২) নল পর্বি, (৩) সিংপুর পর্বি, (৪) বলবি (গাওহালির অন্তর্গত), (৫) বসাওয়া (চিখ্‌লির অন্তর্গত), (৬) নবলপুর পর্বি।

পূর্ব খান্দেশের অন্তর্গত—সাতপুরা পাহাড়ের সংরক্ষিত জঙ্গল অঞ্চল। নাসিক জেলার অন্তর্গত কল্যাণ তালুক ও পেইন্ট পেঠা, থানা জিলার ডাহানু ও সাহাপুর তালুক এবং মোখাড়া ও উম্বেরগাঁও পেঠা।

(৩) যুক্ত প্রদেশ : জৌনসার-বাওয়ার পরগণা (দেরাদুন জিলা)। কৈমুর গিরিমালার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মির্জাপুর জিলার অংশ।

(৪) পূর্ব-পাঞ্জাব : কাংড়া জিলার অন্তর্গত স্পিতি ও লহৌল।

(৫) বিহার : রাঁচি ও সিংভূম জিলা। পালামৌ জিলার লাতেহার মহকুমা। সাঁওতাল পরগণা জিলা (গোডডা ও দেওঘর মহকুমা বাদ)।

(৬) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার : চন্দা জিলার অন্তর্গত এই কয়টি এলাকা—আহিরি জমিদারী অঞ্চল (সিরোঞ্চি তশীলের মধ্যে)। আর—ধানোরা, ভুড়মলা, গেবর্ধা, ঝারপাপ্‌রা, খুটগাঁও, কোটগল, মুরামগাঁও, পলাশগড়, রংগি, সিরস্থণ্ডি সোনসারি, চণ্ডালা, গিলগাঁও, পাই মুরাণ্ডা এবং পোটেগাঁও জমিদারী অঞ্চল (গড়চিরোলি তশীলের মধ্যে)।

চিন্দোওয়ারা জিলার এই কয়টি জাগীর—হররাই, গোরকঘাট, গোরপনি, বট্‌কাগড়, বর্দাগড়, প্রতাপগড়, আলমোড, সোনপুর ও পাচমারির অংশ। সমগ্র মান্দলা জিলা।

বিলাসপুর জিলার পেন্দ্রা, কেণ্ডা, মাতিন, লাপাহা, উপরোরা, ছুরি ও কোর্বা নামক জমিদারী অঞ্চল।

দ্রুগ জিলার আউন্ধি, কোরাচা, পানাবরাস ও অম্বাগড় চৌকি নামক জমিদারী অঞ্চল।

বলাঘাট জিলার বৈহার তশীল। অমরাওতী জিলার মেলঘাট তালুক। বেতুল জিলার ভঁইসডেহি তশীল।

(৭) উড়িষ্যা : গঞ্জাম এজেন্সী অঞ্চল (খন্দমল সমেত)। কোরাপুট জিলা।

আসাম প্রদেশের সম্পর্কে কতগুলি 'উপজাতীয় অঞ্চল' (tribal area) রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যথা :

(১) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় জিলা (শিলং সহর বাদ), (২) গারো পাহাড় জিলা, (৩) লুসাই পাহাড় জিলা, (৪) নাগা পাহাড় জিলা, (৫) উত্তর কাছাড় মহকুমা, (৬) নওগাঁ ও শিবসাগর জিলার অন্তর্গত মিকির উপজাতীয়দের বসতি অঞ্চল, (৭) সদিয়া ও বলিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল, (৮) টিরূপ সীমান্ত অঞ্চল (লখিমপুর সীমান্ত অঞ্চল বাদ) ও (৯) নাগা উপজাতীয় অঞ্চল।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়ায় উল্লিখিত এই 'তপশীলভুক্ত অঞ্চল' ও 'উপজাতীয় অঞ্চলে'র তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ব্রিটিশ আমলের বহির্ভূত' এবং 'আংশিক বহির্ভূত' অঞ্চলের তালিকা থেকে অনেক নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৯৪১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্টে উল্লিখিত উপজাতিসমূহের তালিকায় যে ভ্রান্তি আছে, সে সম্বন্ধে পূর্ব-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত উপজাতীয় আদিবাসী নয় সেই সব উপজাতি, 'অপরাধপ্রবণ' উপসমাজ এবং অর্ধপরিণত জাত Sub-Caste)—সব মিলিয়ে মিশিয়ে উক্ত রিপোর্টে একটা বিরাট তালিকা করা হয়েছে। সুখের বিষয় নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়ায় 'তপশীলভুক্ত উপজাতি'দের Scheduled Tribes) যে তালিকা তৈরী করা হয়েছে, সেটা ঐ ধরনের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তবু সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বলা যেতে পারে না। কি কি সামাজিক ক্ষণকে প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়ে এবং সেই অনুসারে বিচার ক'রে প্রকৃত আদিবাসীর সমাজের তালিকাটি তৈরী করা হয়েছে, তা ঠিক বোঝা যায় না। অনেক প্রকৃত আদিবাসী সমাজের নাম এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। আর কয়েকটি সমাজের নাম আছে যারা বর্তমানে ঠিক উপজাতীয় নয়, এবং আদিবাসী সুলভ সংস্কৃতিও তাদের নেই।

তপশীলভুক্ত অঞ্চলের শাসনের জন্য শাসনতন্ত্রের খসড়ায় এই প্রস্তাব কর হয়েছে যে, উক্ত অঞ্চলের শাসনাদি ব্যাপারে গভর্ণরকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি 'উপজাতীয় পরামর্শদাতা পরিষদ' (Tribes Advisory Council) গঠিত হবে সদস্য সংখ্যা দশ জনের কম এবং ২৫ জনের বেশী হবে না। মোট সদস্যসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন নির্বাচিত সদস্য হবে। গভর্ণর পরামর্শদাতা-বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে তপশীলভুক্ত অঞ্চলের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে পারবেন।

আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের শাসনের জন্য কিছুটা ভিন্ন রকমের প্রস্তাব করা হয়েছে। তালিকায় উল্লিখিত এক একটি উপজাতীয় অঞ্চল বস্তুতঃ এক একটি জেলা হিসাবে পরিগণিত হবে। একই জেলার ভেতর যদি ভিন্ন ভিন্ন উপজাতীয় সমাজের বসতি থাকে, তবে এক একটি উপজাতীয় সমাজের প্রতিনিধি নিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র 'মহাল পরিষদ' (Regional Council) গঠিত হবে।

জেলার অধিবাসীদের প্রতিনিধি নিয়ে এক একটি 'জেলা পরিষদ' (Distric Council) গঠিত হবে ; প্রতিনিধি বা সদস্যের সংখ্যা ৪০ জনের বেশী এবং ২ জনের কম হবে না। মোট সদস্যসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন নির্বাচিত হবে।

গভর্ণর এই জেলা পরিষদ ও মহল পরিষদের পরামর্শ নিয়ে বিশেষ আই প্রণয়ন ক'রে আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের শাসনকার্য চালনা করবেন।

নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়ায় প্রস্তাবিত সকল নির্দেশগুলিকে চুলচেরা বিচা করলে অবশ্য কিছু কিছু দোষ যে ধরা যাবে না তা-নয়। কিন্তু প্রস্তাবিত নির্দে গুলি সমগ্রভাবে যেদিকে লক্ষ্য করছে, সেটা হ'ল আদিবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রি শাসনের অধিকার। ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতিতে যা ছিল না, নতুন শাসন পদ্ধতি তারই প্রয়াস করা হচ্ছে। আদিবাসীকে নিজের উদ্যোগে নিজের মঙ্গ বিধান করার সুযোগ এবং ক্ষমতা দেওয়াই নতুন শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য এবং গভর্ণরের হাতে যে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেটা নিছক প্রভুত্বমূল ক্ষমতা নয়। আদিবাসী সমাজের ওপর কোন প্রগতিমূলক বা উন্নতিমূলক ব্যবস্থা জোর ক'রে চাপিয়ে দেবার নীতি এক্ষেত্রে বড় হয়ে ওঠে নি। ব্রিটিশ আমলে এ

বিশেষ ত্রুটি ছিল। ব্রিটিশ শাসক কখনো সদিচ্ছার বশে যে ব্যবস্থাকে মঙ্গলকর ব'লে মনে করতেন, সেই ব্যবস্থাকেও প্রয়োগ করার মধ্যে জোর জবরদস্তির আধিক্য দেখাতেন। তা ছাড়া, আর একটা ব্যাপার আছে। বিদেশী ব্রিটিশ যে বিষয়কে মঙ্গলকর মনে করতেন সেটা সত্যিই আদিবাসীর সামাজিক গঠন অনুসারে তাদের পক্ষে মঙ্গলকর কিনা, এই দিক্‌টা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বুঝতে চাইতেন না। কিন্তু স্বাধীন ভারতের শাসনিক ব্যাপারে নতুন মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট 'বিদেশী' না হয়েও আদিবাসীর ওপর নিজের কল্পিত মঙ্গলের ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে চান না। এক্ষেত্রে আদিবাসীর বিবেচনাকে, আদিবাসীর সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট যেমন প্রভুত্বের নীতি গ্রহণ করেন নি, তেমনি নির্লিপ্ত থাকার নীতিও গ্রহণ করেন নি। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভারত গভর্ণমেণ্ট 'পূর্ণ সাহায্যের' নীতি গ্রহণ করেছেন। আদিবাসী সমাজ নিজেই নিজেকে শাসন করবে, আর ভারত গভর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ আদিবাসীর এই আত্মশাসনের ব্যবস্থা এবং উদ্যোগকে সাহায্য করবেন। নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়ায় আদিবাসীদের সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলীর মধ্যেও ভারত গভর্ণমেণ্টের এই মূল নীতির ইঙ্গিতটি স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়।

নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়ায় আদিবাসীদের সম্পর্কে কতগুলি ভুল 'তথ্য' দেওয়া হয়েছে। 'বহির্ভূত' অঞ্চল সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করার জন্ত যে সাব-কমিটির ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল, সম্ভবতঃ তাঁরাই এই অনবধানতার জন্তই দায়ী। শেষ ক'রে আদিবাসীদের যে তপশীল বিবৃত করা হয়েছে, সেটা কিছু কিছু ভ্রম ও প্রমাদে পূর্ণ বলে মনে হয়। নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়ায় 'তপশীলভুক্ত আদিবাসীর' তালিকা * থেকে শুধু পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে উল্লিখিত আদিবাসী সমাজের তালিকাটি বিচার করা যাক্। পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী সমাজের তালিকায় অন্যান্য নামের সঙ্গে এই কয়টি নাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—চাক্‌মা, কুকি, লেপ্‌চা, ম্রু, মগ, টিপ্‌রা। কিন্তু এই সব সমাজের লোক আদৌ পশ্চিমবঙ্গে নেই।

* Eighth Schedule—Part (I-IX.)

উপসংহার

একলব্যের প্রতিভাকে অরণ্যের নিভৃতে নির্বাসিত ক'রে রাখা আর চল্‌তে পারে না। 'মহাভারতে' যে ভুল হয়েছে, নবভারতে সে ভুলের প্রশ্রয় আর না থাকাই উচিত। ভারতের সাধারণ সমাজ আর ভারত গভর্ণমেণ্ট, উভয়ে আদিবাসী সমাজের সম্পর্কে উদার ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবের দ্বারা চালিত হবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। এবং এই স্বাভাবিক উদারতার বশে আদিবাসীদের মঙ্গল করবার জন্য তাঁরা অবশ্যই তৎপর হবেন।

কিন্তু এই নিছক মঙ্গল করবার আগ্রহের মধ্যে একটা বিশেষ ভ্রান্তির বীজও সহজে প্রবেশ করার আশঙ্কা আছে। আদিবাসী সমাজের মঙ্গল সাধন ক'রে গেলেই সমস্যার সমাধান হবে না। আদিবাসী সমাজ যাতে বৃহৎ ভারতের মঙ্গলের সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করবার সুযোগ, অধিকার এবং আগ্রহ লাভ করে, তারই পথ মুক্ত ক'রে দেওয়াই সমস্যার প্রকৃত সমাধান।

সমস্যাটাই বা কি? যাকে আদিবাসী সমস্যা বলা হয়েছে, একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে যে মূলতঃ সেটা ভারতেরই জাতীয় সমস্যা। সাংস্কৃতিক, ধার্মিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে আদিবাসী সমাজ বৃহত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সমাজ নয়, বরং ঐতিহাসিক সম্পর্কে যুক্ত। ভারতের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতি ও প্রকৃতি বিচার ক'রে আমরা এইটুকুই বুঝতে পারি যে, বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই আদিবাসীদের সামাজিক চেতনা নানাভাবে নানা পথ খুঁজেছে, কিন্তু সোজা পথ তার পায় নি। নানা কারণে সেই সামাজিক সংযোগের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।

আদিবাসী সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের যে সম্পর্ক তাকে আমরা শাখা-নদীর সঙ্গে মহানদীর সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। উভয়ের মধ্যে গতি প্রকৃতি ও রূপের পার্থক্য আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই। এবং এই শাখানদীর স্রোত অতীতের ইতিহাসে বার বার বাধা পেয়েছে বলেই মহানদীর ঐশ্বর্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুতরাং এখন স্বাধীন ভারতের সম্মুখে দুইটি প্রধান ঐতিহাসিক কর্তব্য হ'ল—(১) আদিবাসী সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধন এবং (২) আদিবাসী সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির যোগাযোগ সাধন। এই দুই কর্তব্য একই সঙ্গে পালনীয়।

নৃত্যে, গীতে ও রূপকথায় সুললিত প্রাণ, আড়াই কোটি আদিবাসী! তার দারিদ্র্যখিন্ন নিরাভরণ মূর্তির অন্তরালে যে বৃহৎ সামাজিক সদ্‌গুণের ঐশ্বর্য আছে, তার মর্যাদা কি তুচ্ছ করা চলে? আধুনিক সভ্যতার বহু অভিশাপ থেকে মুক্ত আদিবাসী সমাজ থেকে বহু শিক্ষণীয় নীতি ভারতীয় সমাজে সাগ্রহে গৃহীত হবার যোগ্য। আদিবাসীর সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শের দিকে তাকিয়ে দেখলে আধুনিক সভ্যের পক্ষে গর্বিত না হ'য়ে কিছুটা লজ্জিত হওয়ারই কারণ আছে। সামাজিক সাম্যে সমৃদ্ধ আদিবাসীর সংসারে নারী অবলা নয়, অবমানিতাও নয়। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার ও সমমর্যাদা আদিবাসীর সংস্কৃতিকে আজও মহৎ ক'রে রেখেছে। বাল্যবিবাহ ও অস্পৃশ্যতা নামে দু'টি কুপ্রথা এই অরণ্যচারী ভারতীয়ের সংসারে প্রবেশ লাভ করতে পারে নি। সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতা যে একটি অভিশাপে পীড়িত হয়ে আছে, নারীর দেহ বিক্রয় বা পতিতাবৃত্তি নামে একটি প্রথা, আদিবাসী সমাজে সে অভিশাপ নেই, যদিও এর দ্বারা বোঝায় না যে আদিবাসী সমাজে যৌন অনাচার ও স্খলন নেই।

একদিকে এই সব সামাজিক ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও আদিবাসী সমাজ আর একদিকে নিতান্তই দীন ও অবনত। বহু প্রাগৈতিহাসিক মনোভাবে এবং আচরণে এদের সামাজিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও রুচির পরিবর্তন এদের মধ্যে সম্ভব হয় নি। রন্ধনকলা, স্নানাভ্যাস ইত্যাদি

সভ্যতার সাধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আদিবাসীর অজ্ঞতা তার বহু পীড়ার কারণ হয়েছে। সুতরাং আদিবাসীর সাংস্কৃতিক উন্নতির অর্থ এই নয় যে তার সকল সংস্কারকে চিরন্তন ক'রে রাখা। আদিবাসীকেও তার বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকে অনেক সংস্কারকে আবর্জনার মত দূরে অপসারণ করতে হবে। বহু নতুনকে গ্রহণ করতে হবে।

মোট কথা দাঁড়ায়, ঐতিহাসিক সত্য অনুসারে আদিবাসী সমাজ বস্তুতঃ একটি 'ভারতীয় হিন্দু' সমাজ। বর্তমানে তাঁরা অনগ্রসর ও অবনত। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়ের মতই তাঁদের সকল প্রতিভা, যোগ্যতা ও অধিকার নিয়ে ভারতীয় রূপে পরিণাম লাভ করতে হবে। নিজস্ব সংস্কৃতিকে বর্জন করে নয়, পরিবর্তিত ক'রে এবং উন্নত ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির আসরে একটি প্রধান প্রতিনিধিরূপে তাঁকে স্থান নিতে হবে। তাঁরা যে ভারতীয়, এই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে আদিবাসীর চেতনার দীক্ষা চাই। ভারতের সাধারণ অধিবাসী এবং আদিবাসী সমাজ, উভয়ের ইতিহাস যে ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত, এই গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ে সেই সূত্রের পরিচয় ও সন্ধান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহাসিক রূপ বিশ্লেষণ ক'রে জনৈক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এই ঐক্যের সূত্রটিই শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন।—উত্তরে সিন্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমগ্র উপত্যকা, এবং হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের ভূভাগ, সর্বত্র ভারতীয় শিল্পকলার বিভিন্ন রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কোল, গন্দ, খন্দ ও ভীল প্রভৃতি 'নিগ্রোবটু'বর্গের আদিবাসী সমাজের শিল্পকলা, দক্ষিণ অঞ্চলে দ্রাবিড়ের শিল্পকলা, পূর্বাঞ্চলে চীন-মঙ্গোলীয়ের শিল্পকলা, তা ছাড়া সমগ্র হিন্দুস্থানে ইরাণীয় প্রভাবিত মোগল ও আফগান শিল্পকলা। কিন্তু এই সব বর্বর কলারীতি, হিন্দু (ব্রাহ্মণ) কলারীতি অথবা মুসলমান কলারীতি—প্রতেক রীতির অন্তরে একটি সাধারণ মূল রীতি রয়েছে। বৈদিক আর্য তার উন্নত প্রতিভার দ্বারা কলাসৃষ্টির যে রীতি আবিষ্কার করেছিল, ঐ প্রত্যেকটি রীতির ওপর তারই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এটাই

ভারতীয় শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য এবং এই লক্ষণ দ্বারাই অন্যান্য পদ্ধতির শিল্পকলা থেকে প্রকৃত ভারতীয় শিল্পকলাকে চিনতে পারা যায়। *

ঠিক 'বৈদিক আর্য' পদ্ধতি বলতে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক কি বুঝেছেন, তা তিনি জানেন। কিন্তু ভারতের সমগ্র শিল্পকলার পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি মূল ঐক্যের যে সূত্রটি তিনি লক্ষ্য করেছেন তাই একটি বৃহৎ ঐতিহাসিক সত্য। সাধারণ ভারতীয় এবং আদিবাসী সমাজের মধ্যে এই ঐতিহাসিক ঐক্যের স্বরূপই আমাদের কাছে প্রধান শিক্ষার বিষয়। এক মাটি ও জলের সম্পর্কে এবং এক মূল ধর্মীয় সংস্কারের সম্পর্কে ভারতীয় হিন্দু ও আদিবাসীর সত্তা পরস্পরের আত্মীয়। এমন কি শোণিতের সম্পর্কেও হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে আদিবাসী সমাজ অনাত্মীয় নয়। লোকাচার ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও মূল ঐক্যের সূত্রে উভয়েই পরস্পরের আত্মীয়। এ গেল বহু পুরাতন আত্মীয়তার কথা।

বর্তমানেও, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বা শিক্ষার ক্ষেত্রে অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, আদিবাসী সমাজের নতুন সমস্যাকে আমরা সাধারণ গরীব ভারতবাসীর সমস্যারূপেই দেখতে পেয়েছি। দুঃখ দুর্দশা ও ক্লেশের সম্পর্কেও আদিবাসী সমাজ এবং সাধারণ

* "Within the limits of India proper, that is of the basins of the Indus and Ganges, and the whole Peninsula, southward from the Himalayas to Cape Comorin, we have in almost every province the Arts of the Kols, Gonds, Konds, Bhils and other Negroid aborigines, of the Dravidian immigrants into Southern, and the Indo-Chinese immigrants into Eastern India and of its Persianised Afghan and Mongol Conquerors throughout Hindustan, and the more accessible provinces of Dakhan. Yet all, whether Savage, Brahmanical or Mohamedan, are essentially of one generic style, which has been impressed upon them by the pervading intellectual superiority of the Vedic Aryans and which distinguishes them in every species and variety as characteristically Indian Arts." —George Birdwood (The Industrial Arts of India).

গরীব ভারতবাসী উভয়েই পরস্পরের আত্মীয়। কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের তারতম্য থাকলেও উভয়ের বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতির মূল সমস্যা একই।

সুতরাং স্বাধীন ভারতে এই নতুন আশার ভবিষ্যৎ আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, আড়াই কোটি একলব্যের প্রতিভাকে সর্বভারতের বৃহৎ কর্মভূমিতে আহ্বান করার নতুন আয়োজন হবে। সাধারণ ভারতবাসী এবং আদিবাসী উভয়েই তাঁদের ঐতিহাসিক আত্মীয়তার সত্যটি বিস্মৃত হয়ে আছেন। উভয়কেই এই সত্যটি স্মরণ করতে হবে। ভারতীয় মহাজাতি গঠনের উদ্যোগে ভূমিকা রূপেই আমাদের ঐতিহাসিক চেতনার এই পুনর্গঠন প্রয়োজন।

সমাপ্ত